

জ্ঞান তাপস যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

মূল পুস্তকের লেখক

মনের জয়ই জয়

তুলসী অধ্যাত্ম নীড়ম প্রকাশন

তুলসী অধ্যাত্ম নীড়ম প্রকাশন

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

মনের জয়ই জয়

মূল হিন্দি থেকে অনুবাদঃ চম্পালাল অঞ্চালিয়া

প্রাপ্তিস্থান ঃ

প্রভা প্রকাশন

৪ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চম্পালাল অঞ্চালিয়া ॥ ২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭০০০০১ ॥

এবং কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে

MANER JOY-YI JOI by Yuvacharya Mahaprajna
Translated in Bengali from Hindi original
by Champalal Anchalia

Price Rs 25 00 only

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

স্বর্গীয় জেঠমলজী অঞ্চালিয়ার পরিবারের সদস্যবৃন্দের
আর্থিক আনুকূল্যে এই সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে।

মূল্য : ২৫ টাকা

প্রচ্ছদ : চিত্ত দাস

তুলসী অধ্যাত্ম নীড়ম্, জৈন বিশ্ব ভারতী, লাডনু (রাজস্থান)-এর পক্ষে শ্রীচম্পালাল অঞ্চালিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্টিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড সার্ভিস, ৮৬।৩৮ বি, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-৭০০০১৩ থেকে রণেন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ধর্ম-দর্শনে যিনি ছিলেন সমধিক অনুপ্রাণিত
আমাব সেই পবমাবাধ্য প্রযাত পিতৃদেবকে—
জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যিনি
আমার প্রথম পথপ্রদর্শক।

ভূমিকা

মনের প্রশ্ন রীতিমত জট পাকিয়ে আছে। এই সমস্যা বহু হাজার বছর ধরে রয়েছে, ভবিষ্যতে আরও কত বছর পর্যন্ত তা থাকবে বলা মুসকিল। মনকে যাঁরা বুঝেছেন এবং মনকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের ভ্রম শেষ হয়েছে। মনকে যাঁরা বুঝতে পারেন নি, মনকে দেখতে পান নি, তাঁরা মনকে জয় করার প্রশ্নেই সমস্যাগ্রস্ত রয়েছেন। জয়ের ভাষা হল লড়াইয়ের ভাষা। লড়াইয়ে হার বা জিৎ—দুয়েরই সম্ভাবনা থাকে। মনের সঙ্গে যিনি লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি যেমন জিততে পারেন, ঠিক তেমনি হারতেও পারেন। একেবারে নিশ্চিত-ভাবে কেউ কখনই বলতে পারেন না, যিনি মনের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন, তিনি জয়লাভ করবেনই। মনকে যিনি উপেক্ষা করেন, যিনি তাকে দেখেন, তিনি তটস্থ হন, মধ্যস্থ হন। উপেক্ষার কথা কত বড় হয়, কেউ তাকে সইতে পারে না। মনকেও তিনি সইতে পারেন না এবং কোন লড়াই ছাড়াই তিনি নিজে নিজেই পরাজিত হন।

অধ্যাত্মক্ষেত্রে যুদ্ধের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, যোদ্ধারও তেমনি নিজস্ব একটি ভাষা আছে। যুদ্ধ কেবল সমর-প্রাঙ্গণেই হয় না, কেবল অস্ত্র দ্বারাই সে লড়াই হয় না, লড়াই নিজের ভেতরে হতে পারে, এবং অস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ করা যায়। মহাবীর এজন্যই বলেছেন—'নিজে নিজের সাথে লড়াই কর। অন্যের সঙ্গে লড়ে কি হবে? 'জুদ্ধারিহং খলু দুল্লহং'—যুদ্ধের অবসর দুর্লভ, তাকে খুঁজো না।'

অধ্যাত্মের ঘোষণা হল—

ওহে বীর।
এই বিজাতীয় তত্ত্বগুলির সঙ্গে লড়,
নকল লড়াই করে কি হবে ?
যুদ্ধের যে সামগ্রী পাওয়া গেছে,
তা করে বার বার পাওয়া যাবে ?
এটাই হল সর্বাত্মক যুদ্ধের মওকা।
সামনেই ঘর রয়েছে,
যিনি সর্বস্ব-ত্যাগী, তিনি এই ঘরেই থাকেন
ওটাই হল সাম্য।
আমি এই অট্টালিকার শিখর থেকে
বিজাতীয় তত্ত্বগুলিকে অন্য দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি
দ্বিতীয় শিখর তো এমন নেই,
যেখান থেকে ওগুলোকে এপারে ছুঁড়ে দিতে পারি।
শ্রান্ত হয়ো না।
থেমো না।
থামিয়ে দিও না।
নত হয়ো না।
সামনের দিকে এগিয়ে যাও।
দ্বিগুণ শক্তির সঙ্গে
সামনের দিকে এগিয়ে যাও।

বিজয়ের এই মন্ত্রকে যিনি বুঝতে পারেন নি, তাঁর কাছে মন চিরকাল অজেয়ই থাকে, অজেয়ই থেকে যায়। মনের বিজয়-রহস্য যিনি বুঝতে পারেন না তিনি মানসিক সমস্যারও সমাধান করতে পারবেন না। একটি দড়িরই দু প্রান্তে ধরে দুটি মানুষ টানাটানি করে, ফলে যখন দড়ি ছিঁড়ে যায়, তখন দুজনেই পড়ে যায়। একজন টানে, আর দ্বিতীয়জন তা ছেড়ে দেয়। যে টানে সে

পড়ে যায়, কিন্তু অপরজন দাঁড়িয়েই থাকে। প্রেক্ষাকে যিনি জানেন, দড়িকে যিনি ছেড়ে দিতে বা ঢিলে করতে জানেন, তিনিই বিজয়ী হন। এই সোজা কথাটিকে বুঝাবার জন্যই বইটি পড়ুন, নিজে দেখুন এবং অনুভব করুন। যদি কথাগুলিকে বোঝা যায়, তাহলে জট-পাকানো প্রশ্নটির সহজেই সমাধান হবে।

আচার্যশ্রী তুলসী হলেন আমার প্রেরণা-স্রোত এবং জ্যোতিস্তম্ভ। তাঁর আশীর্বাদ এবং সান্নিধ্য, দুই-ই আমি পেয়েছি। তাঁরই উৎসাহ এবং প্রেরণায় সাধনা-শিবিরের ব্যবস্থাদি চলুক।

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

আশীর্বচন

দেশনোক গ্রামের স্বর্গীয় জেঠমলজী অঞ্চালিয়ার পরিবার বরাবরই জৈনধর্ম এবং তেরাপন্থ দর্শন-সংস্কারে অনুপ্রাণিত পরিবার ছিল। ব্যবসায়িক কারণে বাংলায় প্রবাসী হওয়ায় ধর্মসঙ্ঘের সঙ্গে ঐ পরিবারের সম্পর্ক অনেকটা চিড় ধরে আসছিল। লাডনু-নিবাসী প্রয়াত মোহন-লালজী খটেড় (আমার সংসার-পক্ষীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ঐ সময়ে সিরাজগঞ্জে (অধুনা বাংলাদেশ) থাকতেন। ওখানেই জেঠমলজীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঐ সম্পর্কই ওঁদের আবার আমার কাছে আসার প্রেরণা যোগায়। ওঁরা এলেন, আর এমন ভাবেই এলেন যে আগের চেয়ে বেশি অধ্যাত্মধর্মী হলেন। ওঁর গোটা পরিবারের মধ্যেই ঐ কারণে সংস্কার পল্লবিত হল এবং ধর্মবিষয়ে একটা শ্রদ্ধা ওঁদের মধ্যে পুষ্ট হতে লাগল।

জেঠমলজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চম্পালালজী একাধারে শিক্ষিত, কর্মঠ এবং মিতভাষী। বাংলাদেশেই ওঁর শিক্ষা-দীক্ষা হওয়ায় একদিকে যেমন উনি বাঙালীই হয়ে গেছেন, তেমনি বাংলা ভাষার ওপরেও ওঁর বেশ অধিকার জন্মেছে। ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ বিশেষ হয় নি, তাই উনি আমাদের কাছে অপরিচিতই রয়ে গিয়েছিলেন এতদিন।

আমাদের রাণাবাস চাতুর্মাসের সময় কলকাতায় এক বিশেষ সংবাদ পেয়ে চম্পালালজী রাণাবাসে এসে পৌঁছলেন। এখানে আসার পরেই ওঁর শ্রদ্ধা, রুচি এবং নিষ্ঠা বদলে গেল। আমি ওঁকে দেখলাম, ওঁর যোগ্যতা লক্ষ্য করলাম এবং আমাদের কাজে ওঁকে নের বলে ঠিক করলাম।

ওঁর সাহিত্যধর্মী রুচি এবং বাংলাভাষায় দক্ষতা দেখে আমিই ওঁকে আমাদের সাহিত্যগুলি বাংলায় অনুবাদ করার নির্দেশ দিলাম। এই

নির্দেশ উনি প্রসন্নভাবে মেনে নিয়ে বললেন, 'আমি নিজে তো অনুবাদ করবই, অন্যকেও এ কাজে লাগাব।'

সর্বপ্রথম দুটি বই উনি নিলেন—'মন কে জিতে জিত' এবং 'আভামণ্ডল'। উভয় পুস্তকই যুবাচার্যজীর রচনা। এগুলি যোগ-সম্পর্কিত, প্রেক্ষাধ্যান-বিষয়ক এবং বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী। পুরো মনোযোগ এবং নিষ্ঠা নিয়ে উনি কাজ শুরু করলেন এবং কাজটিকে একেবারে শেষ করে তবেই বিশ্রাম নিলেন। অনুবাদটি কেমন হয়েছে, তার বিচার পণ্ডিতরা করবেন। তবে, আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে অনুবাদ খুবই ভালো লেগেছে।

বাংলার মানুষরা যোগ-রসিক, সুরুচিপূর্ণ সাহিত্যের সমঝদার এবং অধ্যয়নপ্রিয়। ওঁদের কাছে এই লেখা পৌঁছক, জীবনের প্রতি সঠিক এবং নতুন দৃষ্টি দিতে সক্ষম হোন ওঁরা।

শ্রীঅগ্রওয়ালিয়া নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ পথে উত্তরোত্তর ওঁর কুশলতার বিকাশ হোক, এই কামনাই করি।

৬ জুন, ১৯৮৪
জৈন বিশ্ব ভারতী
লাডনূ

আচার্য তুলসী

আশীর্বাণী

মনেব সমস্যাব সমাধানের জন্য এক গভীব প্রচেষ্টা প্রযোজন। সমাধানেব উপায় বাঙালী জনসাধাবণেব কাছে পৌঁছে দেবাব প্রচেষ্টাও খুব জরুবী। শ্রীচম্পালাল অঞ্চালিয়া এবং তাঁব-সহযোগীবা নিষ্ঠাব সঙ্গে কাজ কবেছেন। বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকেব সামনে ওঁবা মানসিক সমস্যাব সমাধানেব সূত্র তুলে ধবেছেন। এটা খুবই মহত্বেব কাজ। এই বই থেকে আধ্যাত্মিক চেতনাব জাগবণ, সর্বোপবি মনেব সমস্যাব সমাধানেব সূত্র মিলবে। কল্যাণকারী এই প্রচেষ্টাব জন্য মঙ্গলভাবনা বইল।

২ জুন, ১৯৮৪ — যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

জৈন বিশ্ব ভাবতী

লাড়নূ

অনুবাদকের ভূমিকা

আজ থেকে প্রায বছব পঁচিশ আগে আচার্যশ্রী তুলসী এবং যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ কলকাতায এসেছিলেন। বাংলাব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদেব সঙ্গে তাঁদেব সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এবং এই ভাব-বিনিময়-পর্বেই তাঁবা স্থিব কবে ফেলেছিলেন, তাঁদেব স্বলিখিত জৈন দর্শন ও ধ্যানবিষয়ক কিছু বই বাংলায় ভাষান্তবিত কবাবেন, যাতে তাঁদের ভাবধারা বাংলাদেশেও প্রচাবেব সুযোগ পায় এবং বাংলাব জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বজ্জন উভযেই উপকৃত হওযাব সঙ্গে সঙ্গে পাবস্পবিক ভাব-বিনিমযেব কাজটিও সম্পূর্ণ হয। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁদেব সেই বাসনা অপূর্ণ ছিল। গত বছর নিতান্তই আকস্মিকভাবে তাঁদেব সঙ্গে আমাব যোগাযোগ ঘটে এবং আচার্যশ্রী তুলসী আমাকে গ্রন্থগুলিব বঙ্গানুবাদেব কাজে অগ্রণী হতে বলেন।

আচার্যশ্রী তুলসীর নির্দেশ মাথা পেতে নিযে যেদিন তাঁব কাছে 'মন কে জিতে জিত' বইটি বাংলায ভাষান্তবিত কবাব প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং আমাব জন্মদাত্রী জননীও যখন প্রসন্নচিত্তে সেই প্রতিশ্রুতিকে অবিলম্বে কার্যকব কবার আদেশ দিলেন, তখন ভাবতেই পাবি নি, কি বিবাট বিস্ময আমাব জন্য অপেক্ষা কবে আছে। নিতান্তই সহজ এবং সাধাবণ মনে কবে যা শুরু করেছিলাম, কাজে নেমে দেখি, তা রূপান্তবিত কবাব পথে এত বাধা যে হিমালয়েব উচ্চতা অতিক্রমেব বাধাও যেন তাব কাছে তুচ্ছ। প্রসঙ্গত বলি, হিন্দি ভাবাব সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পবিচিতি থাকলেও আমি বাংলাব ছেলে—আচাবে-আচরণে, কথাবার্তায় ষোল আনা বাঙালী এবং তাব চেযেও বড় কথা, আমার সম্পূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষাও পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলাব। তাই ঠিক বাঙালীব মতই হিন্দি

ভাষা আমাব কাছে গ্রীক ভাবাব সমতুল হযে দাঁডাল। এই অবস্থায পডে স্পষ্টই অনুভব করলাম, মা এবং আচার্যজীকে কথা দিযে কি সাংঘাতিক বিপদেই না পডেছি। আমি প্রকৃত অর্থেই আদাব ব্যাপাবী, আমাব সব কাজকাববাব লোহা এবং ইনজিনিযাবিং নিযে, অনুবাদ-রূপ জাহাজেব খবব নিতে যাওযাব কোন প্রযোজনই যে ছিল না, তখন তা মর্মে মর্মে অনুভব কবতে পাবলাম। কিন্তু, জিদ চাপল, নেপোলিযনেব আপ্ত বাক্যকে মনে পডল—'অসম্ভব কথাটি কেবল মূর্খদেব অভিধানেই পাওযা যায'—এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিযে পডলাম অনুবাদ শেষ কবাব কাজে।

'মনেব জযই জয' অনুবাদ কবতে আমাব সময লেগেছে প্রায পনেবো মাস। অসঙ্কোচে বলি, বাব বাব ছ'বাব আমি আদ্যন্ত এটি লিখেছি, কেননা প্রতিবাবই অনুবাদ কবাব পব অনুবাদেব ত্রুটি আমাব কানকে পীডা দিযেছে। অবশেষে মুদ্রিত হবফে অনুবাদেব চেহাবা কেমন হল, তা বিচাবেব ভাব বইল বিদ্বজ্জনেব ওপবে—আমাব শুধু এটুকুই সান্ত্বনা যে, অপবিসীম নিষ্ঠাভবে কাজটি সম্পন্ন কবাব চেষ্টা আমি কবেছি। আমাব মা এবং আচার্যজী উভযেই সেই নিষ্ঠা আনযনে প্রেবণা যুগিযেছেন, নেপথ্যেব এই দুটি মানুষকে আমি প্রণতি জানাই।

যুবাচার্যজীব অসংখ্য বইযেব মধ্যে এই বইটিকেই অনুবাদকার্যেব জন্য বেছে নিযেছিলাম কেন, সেটিও এক প্রশ্ন। আজকেব বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে মনেব সমস্যাই সবচেযে বড সমস্যা, আমবা প্রত্যেকেই নানা মানসিক সমস্যাভাবে জর্জবিত। 'মনেব জযই জয' আগাগোডা মনেব সমস্যা নিযেই চর্চা কবেছে এবং কিভাবে তা অতিক্রম কবা যায সে ব্যাপাবে বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান দিযেছে। এহেন কঠিন বিষযকে যুবাচার্যজী এমন সহজ, সবল ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত কবেছেন যে তা আমাব মনকে আকর্ষণ কবেছে। আমাব বিশ্বাস, বাংলা ভাষায এই ধবনেব বই খুব বেশি নেই। তাই এ বই পডে বাঙালী পাঠক যে বীতিমত উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। মানসিক সমস্যা-পীডিত এই পৃথিবীতে মনের সমস্যাকে অতিক্রম কবাব যেসব পদ্ধতিব কথা যুবাচার্যজী বলেছেন, আজকের দিনেও তার প্রযোগ অসম্ভব নয।

এই প্রযোগকার্য সম্পন্ন কবে দেশেব মানুষ লাভবান হতে পাববেন বলেই আমার বিশ্বাস। তুলসী অধ্যাত্ম নীডম-কে ধন্যবাদ, দেশেব ও দশের কল্যাণার্থে তাঁবা এই বইগুলি বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তবণেব কাজে ব্রতী হয়েছেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যে চারটি বইযের বাংলা সংস্করণ এঁরা প্রকাশ কবলেন, সেগুলিব সাফল্য এলে পববর্তী গ্রন্থগুলিকে ভাবান্তবিতকবণেব কাজ এঁদেব পক্ষে সহজ হবে। তাই তাঁদেব হয়ে বইগুলিব বহুল প্রচাবেব জন্য বাংলাব জ্ঞানী-গুণী, সাধাবণ-অসাধাবণ প্রতিটি মানুষেব কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা কবছি।

এ বইযেব অনুবাদ সম্বন্ধে একটা কথা সুধী পাঠক-পাঠিকাকে বলে নেওয়া ভাল। যুবাচার্যজী বইটি পাণ্ডুলিপির আকাবে লেখেন নি, এটি তাঁর বিভিন্ন শিবিবে দেওযা বক্তৃতার সঙ্কলন। টেপ-বেকর্ড করা বক্তৃতাকে পববর্তীকালে বইযেব আকাবে লিপিবদ্ধ কবা হযেছে। বলা এবং লেখাব ভাষা সর্বদা এক হয না। তাই মাঝে মাঝে লেখাব মধ্যে পুনবাবৃত্তি এসে গিযেছে। আমবা অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে পুনবাবৃত্তিকে যথাসম্ভব বাদ দেবাব চেষ্টা কবেছি। তবু, তাকে যে সর্বদা পবিহাব করতে পেবেছি তা নয। তবে এতে এই মূল্যবান বইযেব রসাস্বাদনে কোন বিঘ্ন ঘটবে বলে মনে হয না।

আব একটি কথা। যে প্রেক্ষা-ধ্যান নিয়ে এই বইযে আলোচনা কবা হযেছে, সে সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু জানতে চান বা প্রেক্ষা-ধ্যান অভ্যাস কবতে চান, তাহলে এই গ্রন্থেব লেখক বা প্রকাশকেব সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাবেন।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনেব পালা। সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সত্যবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যাযকে, শত ব্যস্ততাব মাঝেও যিনি বইটিব মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিযেছেন। অধ্যাপক সুকুমাব চক্রবর্তী এ বইযেব পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া সংশোধন করে দিযে অপরিসীম ঋণপাশে আমাকে আবদ্ধ করেছেন। পাণ্ডুলিপি বচনার ব্যাপাবে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ কুমার রায়, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী এবং শ্রীগৌরগোপাল সাহা নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রীরণেন গুপ্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যে বইটির মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করেছেন, বেশির ভাগ প্রুফ দেখে দিয়েছেন এবং অনুবাদেও নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে ঋণী রইলাম।

স্বাধীনতা দিবস, ১৯৮৪
২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০১

বিনীত
চম্পালাল অগ্রালিয়া

সূচীপত্র

মনের জয়ই জয়

সরদারশহর শিবির

(১০ অক্টোবর, ১৯৭৬ থেকে ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৬)

১

দেখা ও ভাবা

এই সংসারে আমরা দুই রকম তত্ত্ব দেখতে পাই। তাদের একটি অভেদ, অপরটি ভেদ। যখন আমরা অভেদকে দেখি তখন মনে কোন বিকল্প বা সন্দেহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যখন ভেদকে দেখি তখন মনে বিকল্প বা সন্দেহ উৎপন্ন হয়। এরকম হয় কেন? এই পার্থক্য কেন, এই ভিন্নতাই বা কেন? এই রকম এক ঘটনা সুদূর অতীতে ঘটেছিল।

একবার পার্শ্বনাথ পরম্পরার পট্টধর কুমার শ্রমণ কেশী তাঁর শ্রমণ পরিবারসহ শ্রাবস্তী নগরে আসেন এবং তিন্দুক উদ্যানে অবস্থান করেন। সেই সময়ে ভগবান মহাবীরের শিষ্য গণধর গৌতমও তাঁর শ্রমণ সহ ঐ নগরীতে আসেন এবং কোষ্ঠক উদ্যানে অবস্থান করেন। উভয়ের শ্রমণদল পরস্পরকে দেখার সুযোগ পান। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বেশভূষা ও আচরণের পার্থক্য লক্ষ্য করে তাঁদের মনে সংশয় জাগে। তাঁরা জানতেন যে তীর্থংকর পার্শ্ব চতুর্যাম ধর্মের প্ররূপনা করেছিলেন এবং মুনিদের জন্য চার মহাব্রত বিধান করেছিলেন। আর মহাবীর শ্রমণদের জন্য পাঁচ মহাব্রতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। চার মহাব্রত আর পাঁচমহাব্রত দুই বিধানের মধ্যে এই প্রভেদ কেন? পার্শ্বনাথের শ্রমণদের পরিধেয় বস্ত্র সব রকম রঙের ছিল। মহাবীরের শ্রমণদের বস্ত্র কেবল সাদা রঙের

ছিল। আচরণের পার্থক্যও ছিল। কিন্তু কেন? দুই সম্প্রদায়ের শ্রমণদের মনে সন্দেহ জাগল। আচার্য কেশী ও গণধর গৌতম সে কথা জানতে পারলেন। তাঁরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা দুজনে এক স্থানে মিলিত হলেন। তাঁদের শ্রমণরাও সঙ্গে ছিলেন। কুমার শ্রমণ কেশী গণধর গৌতমকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমাদের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, আমরা একই উপলব্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট। তবুও তীর্থংকর পার্শ্বনাথ চার মহাব্রতের এবং তীর্থংকর মহাবীর পাঁচ মহাব্রতের বিধান কি করে দিলেন? এই প্রভেদ কেন? বেশভূষাতে পার্থক্য কেন? চর্যাতেই বা পার্থক্য কেন? একই লক্ষ্য অভিমুখে চলা সত্ত্বেও এই পার্থক্য থাকায় শ্রমণদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। এর সমাধান কি? আপনি আশুপ্রজ্ঞ, এর সমাধান করুন।

গৌতম সমস্যার সমাধান করলেন। তাঁর বক্তব্যের প্রথম চরণেই তিনি যা বললেন তা খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। তিনি বললেন—"পন্না সমকিখয়ে ধম্মং তত্তং তত্তবিনিচ্ছিয়ং"—ধর্মের পরম অর্থকে জানতে হলে, তাকে নিশ্চয় করে জানতে হলে, প্রজ্ঞার দ্বারা তার সমীক্ষা কর। প্রজ্ঞার দ্বারা দেখ তার ভেতরে কি আছে। তার বাইরের রূপকে দেখো না। 'পন্না সমকিখয়ে'—প্রজ্ঞার দ্বারা গভীরে অবতরণ করে দেখ. তার অতল গভীরে পৌঁছে তবেই তুমি জানতে পারবে পরম ধর্ম আসলে কি। এই বেশভূষার পার্থক্য, চার-পাঁচ মহাব্রতের ভিন্নতা—সংখ্যার এই পরিবর্তন প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম পদবাচ্য নয়। এগুলি থেকে ধর্ম মিলবে না। প্রজ্ঞার দ্বারা গভীরে অবতরণ করে দেখ। সেখানেই ধর্মকে দেখতে পাবে। তাতে কোন ভিন্নতা বোধ করবে না। সবই একই বস্তু বলে প্রতীত হবে। আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি সেই প্রেক্ষা ধ্যান কি? প্রেক্ষা ধ্যান হল গভীরে অবতরণ করে দেখা। যতক্ষণ গভীরে অবতরণ করা না যায় ততক্ষণ সত্যকে দেখা সম্ভব হয় না। আমরা সত্যকে জানতে চাই। সত্যকে দেখা-জানার দুটি মাধ্যম আছে—একটি বিচার, অপরটি দর্শন অর্থাৎ দেখা। আমরা বিচারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত,

কিন্তু দর্শনের পরিচয় এখনও আমরা পাইনি। বিচারের ভূমি নিচেই থেকে যায়, কিন্তু দর্শনের ভূমি তার অনেক ওপরে ওঠে। দর্শনের যে শক্তি আছে বিচারে তা নেই। দর্শন যেখানে যেতে পারে বিচার সেখানে পৌঁছতে পারে না। বিচারের বিস্তার খুবই সীমিত, দর্শন সুদূরপ্রসারী। যেখানে দর্শন হয় সেখানে বিচার সমাপ্ত হয়।

বিচারের সমাপ্তি ঘটানোর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় দর্শন। যখন আপনি দর্শনের ভূমিকাতে প্রবেশ করবেন, দেখতে আরম্ভ করবেন, তখন বিচার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আপনি হয়ত বহুবার ভেবেছেন বিচারের পাশ কিভাবে ছিন্ন করা যাবে, বিচারের প্রবাহ কিভাবে রুদ্ধ করা যাবে। এই যে একের পর এক বিচার মনের মধ্যে উঠেই চলেছে তা কিভাবে বন্ধ করা যাবে। কিন্তু কেবল এই ধরনের ভাবনার দ্বারা বিচার রোধ করা যাবে না। বিচার বন্ধ করা সম্ভব দর্শনের দ্বারা, যথাযথভাবে দেখার দ্বারা। আপনি দেখার অভ্যাস করুন। আপনি যেমনি দর্শন করতে আরম্ভ করবেন, দেখতে শুরু করবেন, তখনই বিচার বন্ধ হয়ে যাবে। দুই কাজ এক সঙ্গে চলবে না। হয় দর্শন চলবে, নয়তো বিচার চলবে। দর্শন যদি হয় বিচার বন্ধ হবে, বিচার যদি চলতে থাকে দর্শন হবে না। তারা পরস্পর বিপরীত পথের পথিক। একসঙ্গে তাদের দুটিকে নিয়ে চলতে পারবেন না। আপনার অভিরুচিমত দুটিকে ধরুন, থাকবে সেই একটিই, হয় দর্শন না হয় বিচার। সাধনার দৃষ্টিতে 'দেখা' খুবই মূল্যবান। সত্যকে জানার, সত্যকে দেখার সবচেয়ে বড় উপায় দর্শন।

প্রশ্ন হতে পারে—কি দেখব? কেমন করে দেখব? কেন দেখব? এই তিনটি প্রশ্নই স্বাভাবিক।

কি দেখব, এই প্রথম প্রশ্ন। উত্তর হচ্ছে, যা কিছু সামনে আসে তাই দেখুন। কি দেখতে হবে সে বিষয়ে কেউ নিয়ম বেঁধে দিতে পারে না। কেউ বলতে পারে না, এগুলি দেখ, ওগুলি দেখ না। যেখানে দেখাই উদ্দেশ্য সেখানে কি দেখতে হবে আর কি দেখা চলবে না, এ নিয়ে কোন

প্রশ্নই হতে পাবে না। যে কোন বস্তুকেই দেখা যেতে পাবে। আকাবকে দেখুন। সেটাই সবচেয়ে সহজ দর্শন। যে কোন আকাব সামনে এলেই আমবা তা দেখতে শুরু কবি। যে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচব হলেই আমবা তাব বাহ্য বূপ দেখতে আবম্ভ কবি। প্রত্যেক আকৃতিব দুটি বূপ আছে—একটি বাইবেব বূপ, অপবটি ভেতবেব বূপ। একটি বাহ্য, অপবটি আন্তবিক। এমন কোন বস্তু নেই যাব বাইবেব বূপ আছে, কিন্তু ভেতবেব কোন বূপ নেই। আবাব অন্তবেব বূপ আছে, কিন্তু বাহ্য কোনও বূপ নেই এমন কোন বস্তুও নেই। দুই বূপই থাকে। যেখানে বস থাকে সেখানে ছোবভাও দেখি, বসও দেখি। আমবা উভযকেই দেখে থাকি। বাইবেব এবং ভেতবেব দুই বূপকেই আমবা দেখি। প্রথমে বাইবেবটি দেখি, পবে ভেতবেবটি দেখি। প্রথমে স্থূল বূপকে দেখি, পবে সূক্ষ্ম বূপকে দেখি।

প্রথম দর্শনে যা আমাদেব চোখেব সামনে আসে তা হল স্থূল বূপ। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যতটা দেখা যায তাই সব নয, ভেতবেও অনেক কিছু থাকে , তাই আপনি সূক্ষ্মকেও দেখুন। আমাব হাতে একটা পেন্সিল আছে, আপনি এব স্থূল বূপকেই কেবল দেখছেন। আপনি পেন্সিলটিকে গভীবভাবে দেখতে থাকুন, এক মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট ধবে দেখুন। দেখতে দেখতে আপনাব সামনে এব স্থূল বূপ নাশ পেতে থাকবে এবং এব ভেতবেব বূপ, এব সূক্ষ্ম বূপ, প্রকাশ হতে থাকবে। আপনি দেখছেন আব দেখছেন আব দেখছেন, আব এই ভাবে গভীবে অবতবণ কবছেন। এক বস্তুব কত যে নতুন নতুন বূপ ভেসে উঠবে তা দেখে আপনি বিস্মযবিমূঢ হযে যাবেন।

আজকে আমবা পেন্সিলেব আকাব দেখলাম, তাব আকৃতিকে লক্ষ্য কবে একাগ্র হযে গেলাম। প্রথমে ওব একটি বূপই দেখলাম, কেবল তাব স্থূল আকাবটিই দেখলাম। দ্বিতীযবাব দৃষ্টিপাত কবে ওব বঙ যে কি তা দেখলাম এবং তৃতীযবাবে ওব গাযে যে ক্ষুদ্র অক্ষবগুলি লেখা আছে তাও দেখলাম। এসব প্রথম বাবেই দেখা সম্ভব হয নি। পেন্সিল একটি

সামান্য বস্তু, কিন্তু তাও নিজের মধ্যে অনন্ত পর্যায় সংগ্রহ করে রেখেছে। একবার দেখলেই ঐ অনন্ত পর্যায় আমাদের সামনে প্রকট হবে না। কিন্তু আমরা যতই গভীরে অবতরণ করে যতই সূক্ষ্মতার সঙ্গে দেখতে থাকব ততই ঐ সমস্ত পর্যায় আমাদের দৃষ্টিপথে ক্রমশঃ একের পর এক উদঘাটিত হতে থাকবে। এমনও সম্ভব যে, যদি আমরা ঐ পেন্সিল পাঁচ-দশ দিন ধরে দেখতে থাকি তবে সেটি আর পেন্সিলই থাকবে না, আমাদের কাছে সেটি অন্য কিছু হয়ে যাবে। তখন পেন্সিলই হয়ে দাঁড়াবে সত্য উদঘাটনের একটি মাধ্যম।

আমরা আকার দেখব—তার বাইরেরটাও দেখব, ভেতরটাও দেখব। স্থূল-সূক্ষ্ম দুটি রূপই দেখব। দেখতেই থাকব আর দেখতেই থাকব, আর ক্রমশঃ গভীরে অবতরণ করে দেখতে থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আর গভীরে নেমে দেখা। আমরা যত বেশি সম্ভব গভীরে অবতরণ করে দেখতে থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আর গভীরে নেমে দেখা। আমরা যত বেশি গভীরভাবে দেখতে থাকব তত এমন সব নতুন নতুন পর্যায় উদঘাটিত হতে থাকবে যা প্রথম দর্শনকালে কল্পনাই করা যায়নি।

যেমন ভাবে পেন্সিলকে দেখা হল তেমন ভাবেই শ্বাসকে দেখা দরকার। কেবল বাইরের বস্তু যে আমাদের কাছে দেখার যোগ্য তা নয়, আমাদের আশেপাশেই দেখার যোগ্য অনেক কিছু আছে। শ্বাসকে দেখ, শ্বাসের কল্পনাকে দেখ। শ্বাস যে বিন্দুকে ছুঁয়ে আছে তাকেও দেখ। শ্বাস কত দূর পর্যন্ত যায়, কোথায় মোড় ফেরে, কোথা থেকে ফিরে আসে এবং কোথায় ঐ শ্বাস প্রশ্বাসে পরিণত হয়—এ সব দেখ। শ্বাসের তীব্রতাকে দেখ, শ্বাস কতটা স্থূল তা দেখ, শ্বাস কতটা ছোট তাও দেখ। শ্বাস কি অধিক পরমাণু-সম্বলিত, না অল্প পরমাণু-সম্বলিত অবস্থায় আছে? শ্বাস কতটা দীর্ঘ? ওর দৈর্ঘ্যকে লক্ষ্য কর। শ্বাসের গতিকে লক্ষ্য কর। একই শ্বাসের বিভিন্ন রূপকে দেখতে থাক।

শরীরকে দেখ। শরীরের আয়তন খুবই ছোট, কিন্তু তা এক অতি বৃহৎ ভাণ্ডার। শরীরের যন্ত্রপাতি এত বিপুল যে তাঁর সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীর

অতি বড কাবখানাগুলিও ছোট বলে মনে হবে। এই ক্ষুদ্র শবীবে এত বেশি সংখ্যক যন্ত্র আছে, আব তাদেব নির্মাণকৌশল এতই আশ্চর্যজনক যে, কোন মানুব যদি ঐ সব যন্ত্র নির্মাণ কবতে চেষ্টা কবে, তবে আজ সর্ব বিষয়ে বিকশিত বিজ্ঞানেব যুগেও সে সফল হতে পাববে না। মানুষেব এই ক্ষুদ্রাকৃতি মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে, যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। কোন মানুষই তা নির্মাণ কবতে সমর্থ হবে না। কোন মানুষেবই এমন ক্ষমতা আব যোগ্যতা নেই যে সে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ কবতে পাববে।

নিজেব কাছেই যখন দেখাব এত বস্তু পডে আছে তখন বাইবে দৃষ্টি দেওযাব আবশ্যকতা কি? আপনি মস্তিষ্কেব এক একটি প্রকোষ্ঠকে দেখতে শুরু করুন। মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে। কোনটি স্মৃতিব প্রকোষ্ঠ, কোনটি অনুভূতিব প্রকোষ্ঠ। কোনটি ক্রোধেব প্রকোষ্ঠ, কোনটি ক্ষমাব প্রকোষ্ঠ। কোনটি অভিমানেব প্রকোষ্ঠ, কোনটি মাযাব প্রকোষ্ঠ। যত বকম আবেগ, যত বকম বৃত্তি, যত বকম বাসনা আছে—তাদেব প্রত্যেকেব পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। সেগুলি দেখুন। আজ্ঞাচক্রকে দেখুন, নাসাগ্রকে দেখুন, নাভিমণ্ডলকে দেখুন। এই বকম আবও অনেক স্থান আছে। আপনি সবই দেখতে থাকুন। অনেক বহস্য উদঘাটিত হতে থাকবে।

দেখা কেবল দেখা নয, তাব একটা পবিণামও আছে। শবীবেব কোন এক স্থানকে দেখাব অর্থ হল, মনকে সেখানে কেন্দ্রিত কবা। যখনই আপনি আজ্ঞাচক্রকে দেখবেন তখনই মন সহজেই একাগ্র হযে যাবে। কাবণ ঐ স্থানেব এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যে মন যখনই সেখানে পৌঁছবে তখনই সেখানে আটকে থাকবে। ঐ স্থানই মনকে ধবে বাখবে। আমাদেব শবীবেব অভ্যন্তবে এত অসংখ্য নাডী আছে, এত বৃহৎ নাডী-সংস্থান আছে যে, আমবা সেগুলি দেখে শেষ কবতে পাবব না।

আমাদেব শবীবেব মধ্যে অনেক গ্রন্থি আছে। যোগেব প্রাচীন আচার্যবা ঐগুলিকে 'চক্র' বলে অভিহিত কবেছেন। আধুনিক শবীব বিজ্ঞানীবা

ঐগুলিকে 'গ্লাণ্ডস' বলেছেন। জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধ পদ্ধতির 'জুডো'-তে ঐগুলিকে 'ক্যাসোস' বলে। এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, যোগের আচার্যরা চক্রগুলির যে যে স্থান ও আকার বর্ণনা করেছেন, আধুনিক শরীর বিজ্ঞানীরা গ্ল্যাণ্ডগুলির যে যে স্থান ও আকার স্বীকার করেছেন, এবং জুডো পদ্ধতিতে ক্যাসোসের যে যে স্থান ও আকার বলা হয়েছে—তা তিন ক্ষেত্রেই সমান। বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

ক্রমিক সংখ্যা	জুডো ক্যাসোস	গ্ল্যাণ্ডস	যোগচক্র
১	টেণ্ডো	পিনিয়ল গ্ল্যাণ্ড	সহস্রার চক্র
২	উতো	পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড	আজ্ঞা চক্র
৩	হিচু	থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড	বিশুদ্ধি চক্র
৪	ক্যোটোট্স্যু	থাইমাস গ্ল্যাণ্ড	অনাহত চক্র
৫	স্যুইগেট্স্যু	সোলার প্লেক্সাস	মণিপুর চক্র
৬	মাইওজো	অ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড	স্বাধিষ্ঠান চক্র
৭	স্যুরগিনে	পেলভিক প্লেক্সাস	মূলাধার চক্র

একের পর এক গ্ল্যাণ্ড বা ক্যাসোস বা চক্রকে দেখতে থাকুন। ঐ সবের স্থান স্পষ্টরূপে প্রতিভাষিত হতে আরম্ভ করবে। এদের দেখার পরিণাম সুমহৎ হয়ে থাকে।

আমাদের সামনে দেখার মত বহু বস্তু আছে। সুতরাং আমরা কি দেখব এই প্রশ্ন নিরর্থক। দেখার জন্য আমাদের এই শরীরই পর্যাপ্ত। তা ছাড়া জগৎ অতি প্রকাণ্ড। এত প্রকাণ্ড যে দেখার যোগ্য বস্তুর অভাব কোন দিনই হবে না। দেখার পক্ষে কোন বস্তুই অযোগ্য নয়। যে বস্তুকে আমরা সবচেয়ে তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বলে মনে করি তার দর্শনেও আমাদের সত্যের দর্শন হতে পারে। কোন বস্তু ততক্ষণই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বা মন্দ থাকে যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিকোণ অন্য রকম থাকে। যখন আমাদের দৃষ্টিকোণ সত্যকে দেখার উপযুক্ত হয় তখন কোন বস্তুই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বা মন্দ থাকে না। তখন ভাল-মন্দের ভেদ সমাপ্ত হয়ে যায়।

কেবল যথার্থকে দেখবার, সত্যকে দেখবার কথাই শেষে থেকে যায়।
আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল—কি দেখব? এ সম্বন্ধে আমি কিছুটা আলোচনা করলাম মাত্র।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন—কেমন করে দেখব? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—কেমন করে দেখব। এর সোজা উত্তর হবে, চোখ দিয়ে দেখ। এ উত্তর ঠিকই যে আমরা চোখ দিয়ে দেখি। কিন্তু কেবল চোখ দিয়ে দেখাই যথেষ্ট নয়। চোখ দিয়ে দেখার আগে যে সব অপরিহার্য শর্ত আছে সেগুলি বুঝতে হবে। প্রথম শর্ত হল, অনাসক্তভাবে দেখতে হবে। নির্লিপ্ত হয়ে দেখতে হবে। রাগ-দ্বেষ শূন্য চিত্ত নিয়ে দেখতে হবে। যদি আসক্তি এসে যায়, ঠিক দেখাই হবে না। চোখ দেখবে বটে, কিন্তু যথার্থ দেখবে না—নজরে অন্য কিছু এসে যাবে।

রসিক লোকের কাছে তার স্ত্রীর গোল মুখাবয়ব চাঁদের মত সুন্দর মনে হয়। আবার কিন্তু ক্ষুধার্ত লোকের কাছে তার স্ত্রীর গোল মুখ রুটির মত মনে হতে পারে। কারণ দেখার সঙ্গে একজন কামাসক্তি জুড়ে দিয়েছে, অন্য জন জুড়ে দিয়েছে পদার্থাসক্তি। নতুবা স্ত্রীর মুখ কি করে চাঁদের মত হবে, কি করেই বা রুটির মত হবে?

নাটকের এক দৃশ্য কল্পনা করা যায়—এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি চাঁদ দেখছে, পূর্ণিমার চাঁদ দেখছে, তার চোখের সামনে গোল গোল রুটি ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমরা চোখ দিয়ে দেখছি, কিন্তু যথার্থ বস্তু দেখাই দিচ্ছে না। বস্তুর সঙ্গে আমার যে আসক্তি জুড়ে দিচ্ছি তাই আমি দেখতে পাচ্ছি। বহু সময়ে সুন্দর অসুন্দর হয়ে দেখা দেয়। আবার অসুন্দরও সুন্দর দেখা দেয়। যার সঙ্গে আসক্তি জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা অসুন্দর হলেও সুন্দর প্রতীত হবে। যার সঙ্গে ঘৃণা বা তিরস্কারের ভাব জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা সুন্দর হলেও অসুন্দর বলে প্রতীত হবে। বেচারা চোখ কোথায় যথার্থ বস্তু দেখতে পাবে? চোখের ওপরে যে আসক্তির, রাগ-দ্বেষের,

প্রিয়তা-অপ্রিয়তার আবরণ পড়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আবরণ দূর না হয়—আসক্তি ও রাগ-দ্বেষ মিটে না যায়, প্রিয়তা ও অপ্রিয়তার বোধ নষ্ট না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ যথার্থভাবে দেখতে পারে না। যার যা প্রকৃত রূপ তাকে সেই রূপে দেখতে সমর্থ হবে না। কোন লোক যথার্থই ভাল, কিন্তু আমি তাকে মন্দ দেখছি, মন্দ বলে মনে করছি। আবার কোন লোক যথার্থই মন্দ। কিন্তু আমি তাকে ভাল দেখছি, ভাল বলে মনে করছি। কারণ ভাল বা মন্দ মনে করার সঙ্গে অন্য এক ভাবনা কাজ করছে। এ কারণেই অনাসক্ত হয়ে দেখুন। নিরপেক্ষ ভাবে দেখুন, তবেই কেবল যথার্থভাবে দেখতে পাবেন। যা ঘটিত হচ্ছে ঠিক তাই দেখুন। তার সঙ্গে কোন রকমের চিন্তা বা ভাবনা জুড়ে দেবেন না। বস্তুকে অনাসক্ত ভাবে দেখা, রাগ-দ্বেষ-রহিত চিত্তে দেখা, নিরপেক্ষ ভাবে যা যে রকম তাকে ঠিক সেই ভাবে দেখা—এই হল আমাদের দেখার প্রকার।

যখন অনাসক্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে যায় তখন যে কোন মাধ্যমকেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। চোখ এক মাধ্যম। স্থূল বিষয়, যা চোখের মাধ্যমে দৃশ্য হয়, তা আমরা চোখ দিয়ে দেখব। যা মনের দ্বারা দেখার যোগ্য তা আমরা চোখ বন্ধ করে মনের দ্বারাই দেখব। যদি চোখ খুলে রেখেই দেখতে চান তো সেই ভাবেই দেখুন। ভেতরকে দেখুন। এই দেখাকে বলে 'অনিমেষ দর্শন'। কোনও বস্তুকে অপলক দৃষ্টিতে দেখুন। চোখ খোলা আছে, খোলাই থাকুক। পলক যেন না পড়ে। এই হল 'অনিমেষ দর্শন'। অর্থাৎ অপলক দৃষ্টিতে দেখা। তন্ত্র ও হঠযোগে একে 'ত্রাটক' বলা হয়েছে। ত্রাটকের অর্থ হল, অপলক দৃষ্টিতে এক বিন্দুকে দেখা। নিরন্তর দেখা।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—কেন দেখব? চেতনার মূল স্বভাবই হল দেখা। চিন্তা করা বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি চেতনার একটি রশ্মি মাত্র। আর বিচার তার আলোক। দেখা অখণ্ড চেতনার কাজ। চেতনা যখন অনাবৃত হয় তখন কেবল দর্শন হয় চিন্তন, আর হয় না। দেখাই আমাদের স্বভাব।

সেজন্য কেন দেখব এ প্রশ্নই হয না। নিজেব স্বভাবেব সঙ্গে আমাদেব পবিচয কম, তাই এই প্রশ্ন অস্বাভাবিকও নয। যতই গভীব ও স্থিব ভাবে আমবা দেখতে শিখব ততই আমাদেব একাগ্রতা বাড়বে ও সমাধিব পুষ্টি সাধন হবে। সমাধি লাভ কবাব সবচেযে সবল উপায হল দেখা। কোন এক বিন্দু বা লক্ষ্যেব ওপব মনকে স্থিব করুন আব নিবন্তব দেখতে থাকুন। কিছুক্ষণ পবেই নির্বিচাবতা এসে যাবে এবং সমাধিব অনুভব হতে থাকবে। নিবন্তব দেখাব কাল যতই বাড়বে ততই সমাধিব পুষ্টি সাধন হবে।

একাগ্রতা ও নির্বিচাবতা লাভেব যত প্রকাব সাধন আছে, যথা—মন্ত্র,জপ, শ্বাস-নিবোধ, ঐকান্তিক বিচাব, অবলম্বন প্রভৃতি—তাদেব কোনটাই স্বাভাবিক নয। কাবণ প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন বিশেষ বিকল্প বা প্রযত্নেব প্রযোজন হয। দেখা কিন্তু স্বাভাবিক। তাব জন্য কোন কল্পনা, বিচাব বা বিকল্পেব সহাযতা নেওযাব আবশ্যক হয না। মনকে নিযোজিত কবলেই চলে, তাতেই সহজে স্বভাব উদ্বুদ্ধ হয আব লুক্কাযিত শক্তি প্রকট হতে থাকে। স্বভাবেব অনুভূত চৈতন্যেব সাক্ষাৎকাব, স্থূলেব মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত সূক্ষ্মেব প্রতীকিকবণ, আনন্দ ও শক্তিব অনুভব—এ সব নিবন্তব দর্শনেব দ্বাবাই পাওযা যেতে পাবে। সুতবাং দেখাব অর্থ নিবতিশয গভীব ও জটিলতাপূর্ণ নয, এবং দুরূহ মীমাংসা-সাপেক্ষও নয।

দর্শন (দেখা) সম্বন্ধে যে তিনটি প্রশ্ন উঠেছিল ঃ কি দেখব ? কেন দেখব ? কেমন কবে দেখব ? সেগুলিব সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবা হল।

এখন দ্বিতীয প্রসঙ্গ হল, চিন্তন। চিন্তা কবা, বিচাব কবা, ভাবা। চিন্তনও সত্যকে উপলব্ধি কবাব এক প্রকৃষ্ট সাধন। চিন্তন বা বিচাবেব সার্থকতা আছে। বিচাব তখনই ব্যর্থ হয যখন তা একটি বিষযেব ওপব কেন্দ্রিত হয না। কেউ যদি কেবল বিচাবই কবতে থাকে তবে বিচাব অসার্থক হবে। একজন সমঝদাব মানুষ ও পাগলেব মধ্যে প্রভেদটা কোথায ? তাদেব মধ্যে সত্যিই খুব বেশি পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি

নিজের ইচ্ছামত নিজের বিচারশক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সে সমঝদার, আর যে তা পারে না সে পাগল। সমঝদার ব্যক্তি বিচার করে, পাগলও বিচার করে। এমন মনে করবেন না যে, পাগল চিন্তা বা বিচার করতে পারে না। পাগলও চিন্তা করে, বিচার করে। কিন্তু যে বিচার তার মনে এসে যায়, তাকে আর সে ছাড়তে পারে না। ঐ বিচার যেন তাকে আঁকড়ে ধরে। ফলে তার মনে সতত ঐ একই বিচার চলে। যাকে বিচার আঁকড়ে ধরে, যে বিচার ছাড়তে পারে না, তাকে পাগল বলে। আর যে বিচারকে ছাড়তে পারে, তাকে ইচ্ছামত বদলাতে পারে, সে সমঝদার। দুজনের মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য, যেন একটি সূক্ষ্ম রেখা দিয়ে দুজনের মধ্যে ব্যবধান করা হয়েছে।

কোন এক বিষয়ে চিন্তা করতে করতে যখন ইচ্ছা তখন সেই বিষয় ত্যাগ করে অন্য এক বিষয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতার খুবই উপযোগিতা আছে। আমরা বিচারের দ্বারা সত্যকে বুঝতে পারি, জানতে পারি। এই বিচার ধ্যানের দ্বারা অনেক মহত্ত্বপূর্ণ তথ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক প্রাচীন পদ্ধতি আছে, যা যোগের প্রায় সব শাখাতেই পাওয়া যায়। আচার্য শিষ্যকে এক সমস্যা দিয়ে বললেন, এর সমাধান খোঁজ কর। কোন বইতে সমাধানের খোঁজ পাওয়া যাবে না, বস্তুতঃ বই থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না। আচার্য উপদেশ দিলেন, সমস্যাটি নিয়ে বিচার কর, চিন্তা কর। একদিন, দুদিন, দশদিন—যতদিন না সমাধান পাওয়া যায় ততদিন বিচার করতে থাক, চিন্তা করতে থাক। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অনেক দূরের ব্যাপারের খোঁজখবর পাওয়া গেছে, অতীতের ঘটনাবলীর সন্ধান মিলেছে, আর ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে এমন ঘটনা জানা গেছে।

এক পাথরের টুকরো হাতে এল। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে এটা কোন উপাদানে গঠিত। তখন হয়ত জানতে হবে, কোন কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে এই পাথর এতদিন টিঁকে আছে। পাথর নিয়ে বিচার চলল। পরিশেষে এমন এক অবস্থা এল যখন পাথর অব্যক্তরূপে তার সমস্ত

ঐতিহাস জানিয়ে দিল।

কোন এক শব্দের অর্থ আমাকে জানতে হবে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময় আসবে যখন শব্দ নিজেই তার অর্থ প্রকাশ করবে।

মহর্ষি চরক আয়ুর্বেদের প্রাচীন আচার্য। তিনি জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে বিভিন্ন গাছপালার সামনে বসে বললেন—'তুমি আমাকে বল তোমার উপযোগিতা কি? কোন রোগের চিকিৎসায় তুমি কাজে লাগ? তোমার পরিণামই বা কি হতে পারে। বল, নিজের কথায় নিজের কাহিনী আমাকে শোনাও।' এই বলে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন, একাগ্রচিত্তে সমস্যার চিন্তা করতে লাগলেন। একাগ্রতা যখন চরম বিন্দুতে পৌঁছল, তখন গাছপালা তাদের শ্রেষ্ঠ গুণ ধর্ম বর্ণনা করতে লাগল এবং চরক তা জানতে পারলেন। এ ঘটনা সত্য। গাছ অবশ্য কথা বলে না। কিন্তু ঐ সমস্যা নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করার ফলে মন এত গভীরে প্রবেশ করে যে সূক্ষ্ম পর্যায়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হয়। তখন আপনা থেকেই শ্রেষ্ঠ পর্যায়গুলি উদঘাটিত হয়। এই হল বিচারের প্রক্রিয়া, সত্যকে জানার বিশেষ উপযোগী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া দ্বারা আজও অনেক রহস্যের উদঘাটন করা যায়। জৈন পরিভাষায় একে 'ধর্ম্য ধ্যান' বলা হয়।

দুই প্রকার ধ্যানকে শুভ মনে করা হয়—এক ধর্ম্য ধ্যান, অপর শুক্ল ধ্যান। শুক্ল ধ্যানের অর্থ—আত্মাকে দেখা। এই ধ্যানে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। ধর্ম্য ধ্যানের অর্থ হল বস্তুর স্বভাব। এখানে ধর্ম নেই, ধর্ম্য আছে। ধর্ম-অধর্ম শব্দ দুটি এখানে ব্যবহারযোগ্য নয়। এই শব্দ দুটি আচারের সঙ্গে, আচরণের সঙ্গে, সম্বন্ধযুক্ত, ধর্ম্য শব্দের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ নেই। ধর্ম্য শব্দের অর্থ বস্তু স্বভাব। বস্তুর স্বভাব বিচার দ্বারা, অনুসন্ধানের দ্বারা, চিন্তন দ্বারা জানা—এই হল ধর্ম্য ধ্যানের প্রক্রিয়া। এর দ্বারা বস্তুর গুণ-ধর্ম জানা যায়। কোন বস্তুর কি গুণ, কি দোষ তা জানা যায়। বস্তুর অভ্যন্তরীণ স্বরূপ, সূক্ষ্ম স্বরূপ জানা যায়। এই হল

বিচার ধ্যান বা চিন্তন ধ্যান। এর তাৎপর্য হল বিচার প্রধান ধ্যান, চিন্তন প্রধান ধ্যান। আমি স্বীকার করি না যে চিন্তনের দ্বারা বা বিচারের দ্বারা ধ্যান হয় না ; বিচার করাও ধ্যান, চিন্তা করাও-ধ্যান। তবে বিচার তখনই ধ্যানে পরিণত হয় যখন তা এক দিকেই গড়িয়ে প্রবাহিত হয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না বা বিক্ষিপ্ত হয় না। একদিকে যাওয়া জলধারায় পরিণত হয়। এই ধারাই চাই। ধ্যানের ধারা চলবে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জলের বিন্দুতে জলধারা হয় না। সেই রকম ছড়িয়ে পড়া বিচার দ্বারা ধ্যান হয় না। বিচার যখন কেন্দ্রিত হয়, এক দিকে প্রবাহিত হয়, তখন তা ধ্যান পদবাচ্য হয়।

বিচারও ধ্যান, নির্বিচারও ধ্যান। উভয় প্রকার ধ্যানের নিজ নিজ মহত্ত্ব আছে। একদিকে প্রবাহিত বিচারই ধ্যান, তাকে বলে বিচার ধ্যান। দর্শনের ভূমিতে হয় নির্বিচার ধ্যান। এখানে বিচার হয় না, কেবল দর্শনই হয়। একথা মানা যায় না যে নির্বিচার ধ্যানে কিছুই ঘটে না। কিছুই না ঘটা তো মূর্চ্ছার অবস্থা, ধ্যানের অবস্থা নয়। ধ্যানের কোন না কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বা বিষয় থাকে। এক প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন আমরা একদিকে চিন্তাকে প্রযুক্ত করি তখন ধ্যান হয় না। যখন আমরা একভাবে দেখি তখন ধ্যান হয়। উত্তর হল, একদিকে চিন্তা করা বিচার-ধ্যান, আর দেখা নির্বিচার-ধ্যান ; উভয়ই ধ্যান।

প্রেক্ষা ধ্যানে দুয়ের উপযোগিতা আছে। প্রেক্ষার অর্থ নির্বিচার ধ্যান, দেখার ধ্যান। প্রেক্ষা ধ্যানের প্রথম অঙ্গ হল দেখা। এই অবস্থায় আমরা কেবল দেখি, কোন বিচার করি না। শরীরকে দেখি, কিন্তু বিচার করি না। শরীরের ভেতরে যা কিছু ঘটে চলেছে তা লক্ষ্য করি। কোথায় চঞ্চলতা হচ্ছে ? কোথা থেকে শব্দ আসছে ? কোথায় কোন অবয়ব সক্রিয় আছে ? এই সবই আমরা দেখি, কেবল দেখি, কোন চিন্তা বা বিচার করি না। আমাদের শরীরের ভেতরে সর্বদা নানা প্রকার ক্রিয়া হয়ে চলেছে, অনেক প্রকার শব্দ উত্থিত হচ্ছে। আমরা এই সব ক্রিয়ার কথা জানি না, এই সব শব্দ শুনি না। কারণ বাইরে এত শব্দ নিয়ত

উঠছে যে ভেতবেব সূক্ষ্ম শব্দ শোনাব অবসবই আমাদেব হয না। এই সব শব্দ আপনি ধ্যানেব দ্বাবা শুনুন, সত্যিই শোনা যাবে। আমাদেব হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক কবছে, সে শব্দ আপনি শুনতে পাবেন। বক্তেব প্রবাহ নিবন্তব বযে যাচ্ছে, তাব শব্দও আপনি শুনতে পাবেন। এজন্য অবশ্য আপনাকে সূক্ষ্মতাব মধ্যে যেতে হবে। পূর্ণ একাগ্রতা আনতে হবে। তবেই আপনি ঐ সব সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পাবেন। প্রেক্ষা ধ্যানেব অর্থ কেবল দেখা, চিন্তা কবা বা বিচাব কবা নয।

প্রেক্ষা ধ্যানেব দ্বিতীয অঙ্গ—অনুপ্রেক্ষা। অনুপ্রেক্ষাব-অর্থ, ধ্যানে আমবা যা কিছু দেখি তাব পবিণাম সম্বন্ধে বিচাব কবা। 'অনু' শব্দটিব অর্থ—যা পবে ঘটে। ধ্যানে যা দেখি, প্রেক্ষায় যা দেখি, তাকে পবে প্রেক্ষা কবা, তাব পবিণাম সম্বন্ধে বিচাব কবা— এই হল অনুপ্রেক্ষা। 'অনু'—অর্থাৎ পবে, 'প্রেক্ষা'—অর্থাৎ বিচাব কবা। আমবা দেখি শবীবেব কোন অংশে স্পন্দন হচ্ছে। পবমাণু আসছে যাচ্ছে, পবমাণুব উপচয হচ্ছে, আবাব অপচযও হচ্ছে। পবমাণুব জন্ম হচ্ছে, বাড়ছে। আমবা এ সমস্ত দেখি। তাব পবে চিন্তা কবি, এ সবেব পবিণাম কি হবে? আমবা অনিত্যকে অনুপ্রেক্ষা কবি, কাবণ পবমাণুব এই যে স্পন্দন আব যাতাযাত তা নিত্য হতে পাবে না। ঐ সমস্ত যখন অনিত্য উপলব্ধ হয তখন আমবা উপলব্ধি কবি শবীব অনিত্য। শবীব অনিত্য, এ তথ্য জানাব আধাব কি? জানাব আধাব—প্রেক্ষা। যখন আমবা প্রেক্ষাব দ্বাবা দেখি শবীবে স্পন্দন, কম্পন, গতি, পবমাণুব যাতাযাত, পবমাণুব অপচয আছে, তখন বুঝি এ সবেব অর্থ, শবীব অনিত্যধর্মা। এই অনিত্যতা অনুভব কবা, বিচাব কবা, চিন্তা কবা—এবই নাম অনুপ্রেক্ষা।

প্রেক্ষা আব অনুপ্রেক্ষা এক সঙ্গে চলবে। আমবা প্রেক্ষা কবব, অনুপ্রেক্ষাও কবব। প্রেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা কোনটাই নিবন্তব চলতে পাবে না। আমবা কখনও প্রেক্ষা কবব, আবাব কখনও অনুপ্রেক্ষা কবব। প্রথমে প্রেক্ষা, তাবপবে অনুপ্রেক্ষা। প্রথমে দেখা, তাবপবে যা দেখলাম

তাব সম্বন্ধে বিচাব কবা। বিচাবেব ফলে যা সাব নিষ্কর্ষ পাওযা যাবে তা জীবনে কাজে লাগাতে হবে।

ধ্যানেব দুটি দিক—প্রেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা। আমবা দেখব আব চিন্তা কবব। উভয প্রকাবে ধ্যানকে অবলম্বন কবে আমবা সত্যকে অনুভব কবব, যথার্থকে জানব আব নিবপেক্ষভাবে বস্তুকে দেখাব অভ্যাস কবব। তবেই আমবা প্রেক্ষাধ্যানে সফলতা লাভ কবতে পাবব। প্রেক্ষাধ্যানেব প্রযোজন এই যে, এব দ্বাবা আমবা গভীবে অবতবণ কবে দেখাব ও সম্যক প্রকাবে চিন্তা কবাব অভ্যাস কবতে পাবি এবং পবিশেষে সত্যেব সাক্ষাৎ লাভ কবে কৃতার্থ হতে পাবি।

২

শরীর সাধনা

প্রথমে 'পাওয়ার হাউস' তৈরি করা হয়, পরে তা থেকে তার টানা হয়। তখন সেই তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর বালবের মাধ্যমে প্রকট হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বালবের সঙ্গে সংযোগ না ঘটে তত-ক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রকট হতে পারে না। আমরা কেবল বিদ্যুৎ প্রবাহের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রিত করি না, বরং যার মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হয় তার ওপরও পূর্ণ মনোযোগ আরোপ করি।

আমাদের শরীর হচ্ছে সবরকম শক্তির অভিব্যক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা যদি শক্তির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রিত করি আর সেই শক্তির অভিব্যক্তির মাধ্যমের ওপর মনোযোগ না দিই, তবে তা হবে সবচেয়ে সাংঘাতিক ভুল। শরীরই মাধ্যম, সুতরাং তাকে উপেক্ষা করা মারাত্মক ভুল।

প্রথমেই আমাদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, যেসব শক্তি প্রকট হবে সেগুলি ধারণ করার সামর্থ্য আমাদের শরীরের আছে কিনা। তার সে ক্ষমতা আছে কিনা। শরীর যদি সশক্ত না হয়, সক্ষম না হয়, তবে কোন শক্তিই তাতে অবতরণ করবে না বা অভিব্যক্ত হতে পারবে না। কারণ দুর্বল শরীরে কোন শক্তির অভিব্যক্তি সম্ভবপর নয়। আমাদের

শবীবে যতগুলি শক্তিকেন্দ্র আছে সেগুলিকে আগে সুদৃঢ় কবতে পাবলে তবেই শবীবে বিশেষ কোন শক্তিব অবতবণ সম্ভব হতে পাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি পবামর্শ দিই যে, আমবা যেন আমাদেব শবীবেব প্রতি উদাসীন না হই বা ঘৃণাব ভাব পোষণ না কবি। ববং আমবা যেন শবীবকে ভালবাসতে শিখি। কাবণ শবীবই আমাদেব সব বকম সফলতাব মাধ্যম এবং সবচেযে শক্তিশালী মাধ্যমও বটে। সবাব আগে আমাদেব শবীবকে বুঝতে হবে আব শবীবে যেসব শক্তি কেন্দ্র, যেসব চৈতন্য-কেন্দ্র অবস্থিত আছে সেগুলিকে বুঝতে হবে।

শবীব কি? সাধাবণভাবে বলতে গেলে, বক্ত, মাংস ও নোংবা জিনিষেব পিণ্ডমাত্র। এতে আছে হাড়, মজ্জা, মেদ প্রভৃতি। এগুলি বড়ই বীভৎস, দেখলেই মন ঘৃণায ভবে ওঠে। আমাদেব সামনে শবীব বীভৎস রূপ নিযে দাঁড়িযে আছে। বৈবাগ্যেব দৃষ্টিকোণ থেকে আমবা তাব বীভৎসতা দেখতে যত্ন কবে থাকি। এই দৃষ্টিকোণ ভুল নয। এ কথা সত্য যে শবীব যথার্থই বীভৎস, এতে সাব পদার্থ কিছু নেই। যে সাতটি ধাতুতে শবীব গঠিত তাব সব কটিই নশ্বব। শবীব যে বীভৎস, বিকৃত ও খাবাপ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ তো দেখাব এক কোণ মাত্র, অন্য অন্য কোণ থেকেও দেখতে হবে। কোন বস্তুকে কেবল এক কোণ থেকে দেখলে যথেষ্ট হবে না। যদি আমবা কেবল এক কোণ থেকেই দেখি তবে আমবা একাঙ্গী হযে যাব এবং আমাদেব দৃষ্টিকোণ অসম্যক হবে। আমাদেব দৃষ্টিকোণ তখনই সম্যক হয যখন আমবা একই বস্তুকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হই। যখন আমবা অনেক কোণ থেকে দেখি তখনই হয প্রকৃত দর্শন। অন্যথায কেবল দেখাই হয। সে দেখা খণ্ডিত দৃষ্টি মাত্র, ফলে প্রমাদদুষ্ট।

শবীবকে দেখাব অন্য দৃষ্টিকোণও আছে। তা এই যে, আমাদেব পক্ষে শবীব যতটা সাবভূত ততটা অন্য কোন মূর্ত বস্তুই নয। একমাত্র এই শবীবই পবমাত্মাব বা চৈতন্যেব বা শক্তিব অভিব্যক্তিকে প্রকট কবতে সক্ষম। সমর্থ শবীব না থাকলে কেউ কেবলজ্ঞানী হতে পাবে না।

কেবলজ্ঞান আত্মার শক্তি, আত্মার নিরাবরণ অবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞানের সমস্ত আবরণ দূর হয়, আর পূর্ণ চেতনার উদয় হয়। কিন্তু এই জ্ঞান প্রকট হওয়ার একটা শর্ত আছে। যে কোন শরীর কেবলজ্ঞানের অবতরণ সহ্য করতে পারবে না। এজন্য শর্ত এই যে, যে শরীর বজ্র-ঋষভ-নারাচের মত সুদৃঢ় সংগঠনযুক্ত একমাত্র সেই শরীরই কেবলজ্ঞানের অবতরণের ধাক্কা সহ্য করতে পারবে। এই রকম শরীর-ধারী ব্যক্তিই কেবলী হতে পারে, অন্য কেউ নয়। বজ্র-ঋষভ-নারাচ হল সবচেয়ে শক্তিশালী শরীর সংরচনা। এরকম শরীরে অস্থির বাঁধন খুব মজবুত হয়। এরকম শরীরসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবলজ্ঞানী হতে পারে। সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আপনি ভাবতে পারেন, এ কেমন শর্ত? শরীরের সঙ্গে কেন এমন শর্ত? কেবলজ্ঞান প্রাপ্তির অর্থ তো চেতনার অভ্যুদয়, বিশুদ্ধ চেতনার অবতরণ, চেতনার পূর্ণ বিকাশ। তা আত্ম-নির্মলতা থেকে পাওয়া যায়, সম্পূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষের বিলয় হলে তা মেলে। তবে এর সঙ্গে শরীর-সম্বন্ধীয় শর্ত কেন? এই প্রতিবন্ধ কেন, যে ব্যক্তির শরীর-সংরচনা বজ্র-ঋষ-নারাচের মত সুদৃঢ়, সে ব্যক্তিই শুধু কেবলী হতে পারে, অন্যে নয়।

এরকম তর্ক হতে পারে বটে, কিন্তু আমি বলি এমন শর্ত খুবই মহত্ত্বপূর্ণ।

মনে করুন, একটা ছোট মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। তার ওপর দশ জন বসতে পারে। এটুকু মাত্র তার ক্ষমতা। এখন যদি পঞ্চাশজন তার ওপর বসার চেষ্টা করে, তবে মঞ্চটি ভেঙ্গে যাবে। কারণ পঞ্চাশ জনের ভার বহন করার শক্তি তার নেই। পাতলা কাপড়ের ওপর বেশি ভারি জিনিষ ফেলে দিলে কাপড় ফেটে যাবে। যতটা ভার বহন করার ক্ষমতা যার আছে সে কেবল ততটা ভারই বহন করতে পারে।

শরীরের সংহনন, শরীরের সংরচনা যদি দুর্বল হয়, যদি স্নায়ু-সংস্থান, কমজোর হয় এবং তা সত্ত্বেও যদি কৈবল্যের মত বিরাট শক্তি সেই

শরীরে অবতরণ করে তবে সেই শরীর ফেটে যাবে। কৈবল্যের কথা দূরে থাকুক, ছোট কোন শক্তির অবতরণও সেই শরীর সহ্য করতে পারবে না। তা একেবারেই বিকল হয়ে যাবে।

মস্তিষ্কে সহস্রার নামে এক চক্র আছে, তা এক প্রসিদ্ধ শক্তি-কেন্দ্র। কোন দুর্বল ব্যক্তি ঐ শক্তি-কেন্দ্রের উপর ধ্যান করল। তার ফল কি হল? ধ্যানের দ্বারা ঐ চক্র সক্রিয় হয়ে উঠল এবং সক্রিয়তার ফলে উষ্ণতা উৎপন্ন হল, তাপ আর শক্তি উৎপন্ন হল। সেই তাপ এত তীব্র হয় যে দুর্বল শরীর তা সহ্য করতে পারে না, ধারণ করতে পারে না। ফলে সেই দুর্বল ব্যক্তি পাগল হয়ে যেতে পারে।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে, সহস্রার চক্রের ওপর ধ্যান কর, মনকে সেখানে একাগ্র কর। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে ঠিক কোন অবস্থায় ঐ কেন্দ্রের ওপর ধ্যান করা উচিত হবে। যদি আমরা আগে আজ্ঞাচক্রের সাধনা সম্পূর্ণ না করি, আজ্ঞাচক্রের ওপর ধ্যানকে কেন্দ্রিত করার ক্ষমতা বিকশিত না করি, অথচ সোজা সহস্রার চক্রের ওপর ধ্যান করার চেষ্টা করতে থাকি, তবে অনর্থ ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে লাভের বদলে লোকসানই হতে পারে। সহস্রার চক্রে ধ্যান করার এই যে প্রযত্ন, তা সার্থক হবে না, কারণ সেখানকার তীব্র তাপ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের শরীরে গড়ে ওঠেনি। অনেক ধ্যান-সাধক পাগল হয়ে যান। সেটা কিন্তু ধ্যানের দোষ নয়, সাধকেরই দোষ। কারণ সাধক জানে না, কখন কোন অবস্থায় কোন স্থানে ধ্যান করা উচিত, আগে কোন শক্তির বিকাশ করা দরকার এবং পরেই বা কোন শক্তির করা উচিত। যেখানে এই জ্ঞান থাকে না সেখানে উত্তেজনা বাড়ে, উত্তাপ বাড়ে এবং ফলে লাভের বদলে লোকসানই হয়।

আমাদের একথা বুঝতে হবে যে, শরীরের বিভিন্ন শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট ক্রম আছে। শরীর সাধনা করতে হলে ঐ শক্তিগুলির ক্রমিক বিকাশ করতে হবে। শরীর সাধনার প্রথম ধাপই হল, ঠিকমত বসতে শেখা। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আধারের ওপরেই

আসনেব বিকাশ ঘটেছে। বসাব হাজাব হাজাব প্রকাব বর্ণনা কবা হযেছে, কেবল দুই-এক প্রকাব নয। বসা একটা সামান্য কাজ বলে মনে হয। এ সম্বন্ধে এত মনোযোগ দেওযাব বাবণ কি? বসাব এত প্রকাবভেদেব সার্থকতা কি? আসনেব বিশেষ বিকাশেব প্রতি এত গুরুত্ব আবোপ কবাব আবশ্যকতা কি?

বসা সামান্য কাজ, মানুষ যেমনভাবে চায তেমনভাবে বসতে পাবে। কিন্তু যখন শবীবেব সাধনা কবা হয এবং শবীবেব মধ্যে বিশিষ্ট শক্তিব অবতবণ সম্ভব কবাব জন্য প্রযত্ন কবা হয, তখন বসাব প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আবোপ কবতেই হবে। কিভাবে বসতে হবে তা বুঝতে হবে।

এমনভাবে সোজা হযে বস, যাতে মেরুদণ্ডেব হাড যেন সোজা অবস্থাতেই থাকে এবং গ্রীবাদেশও যেন সোজা থাকে। পিছনেব সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ সুষুম্নাব অগ্রভাগ থেকে মূলাধাব পর্যন্ত সমস্ত অংশই, যেন সোজা থাকে। এভাবে বসাব সাধনা কবতে হয। সাধাবণত মানুষ সোজা হযে বসে না, হয সামনেব দিকে ঝুঁকে বসে, নয পেছনেব দিকে ঝুঁকে বসে, আবাব কখন পাশে হেলে বসে। কোন ক্ষেত্রেই সে ঠিক সোজা হযে বসে না। সাধনাব দিক থেকে সোজা হযে বসাব খুবই প্রযোজন আছে। সোজা হযে বসাব উদ্দেশ্য হল, আমাব প্রাণধাবাব পথে যেন কোন বাধা বা অববোধ সৃষ্ট না হয। প্রাণধাবাব সর্বাধিক প্রবাহ চলে পৃষ্ঠবজ্জুস্থ সুষুম্না নাডিব ভেতব দিযে। মেরুদণ্ডেব হাড অনেকটা ফাঁপা। ওব ভেতবে সুষুম্না নালী আছে। ওটা মধ্য নালী, ওব ভেতব দিযে প্রাণেব প্রবাহ চলে। যদি বাঁকা হযে বসি, প্রাণেব প্রবাহে বাধা উৎপন্ন হয। আমি শক্ত হযে বসলে বা এপাশে-ওপাশে হেলে বসলেও প্রাণপ্রবাহেব বাধা হয। ঠিক সোজা হযে বসলে এই বাধা উৎপন্ন হয না। সেজন্য বলা হয যে, সোজা হযে বস। মেরুদণ্ডেব হাডেব বা সুষুম্না নালীব গুরুত্ব কেবল সাধনাব দৃষ্টিতেই নয, স্বাস্থ্যেব দৃষ্টিতেও এদেব বিশেষ মূল্য আছে। আযুর্বেদেব আচার্যবা লিখে গিযেছেন, ভোজন কবতে সোজা হযে বস, বেঁকে বস না। কথা বলাব সমযে বাঁকা

হয়ে বস না, হাঁটবার সময় বাঁকা হবে না। শরীরের যে কাজই কর, লক্ষ্য রেখ, মেরুদণ্ড যেন সোজা থাকে, যেন না বাঁকে।

সুষুম্নার সুস্থতাই আমাদের স্বাস্থ্যের মূল আধার। মেরুদণ্ডের হাড় যদি সুস্থ থাকে ও সঠিক অবস্থায় থাকে, তবে আমাদের সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার বিষয়ে কোন গোলযোগ হবে না। আর তা যদি সুস্থ না থাকে, তবে তার প্রভাব সমস্ত শরীরের ওপরই বর্তাবে। এখন চিকিৎসাজগতে এই তথ্য স্বীকৃত হয়েছে যে, মেরুদণ্ডের হাড়ের বিকৃতির কারণেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এজন্য কোন ব্যাধিরই আলাদাভাবে চিকিৎসা করার দরকার হয় না, কেবল মেরুদণ্ডের হাড়ের চিকিৎসা করলেই সেই ব্যাধির উপশম হয়। এটা চিকিৎসার এক পদ্ধতি।

আমার হাঁটুতে ব্যথা হওয়ায় একজন চিকিৎসক দেখাই। তিনি 'আকুপাংচার' পদ্ধতিতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি বললেন— 'মেরুদণ্ডের হাড়ে কিছু গোলযোগ ঘটেছে, তাই হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে।' এ কেমন সম্বন্ধ। ব্যথা হয়েছে হাঁটুতে, আর সম্বন্ধ মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে। পেটের ব্যথা, মাথার ব্যথা, কোমরের ব্যথা, শরীরের যে কোন স্থানের ব্যথা, সব কিছুরই কারণ মেরুদণ্ডের হাড়ের কোন না কোন গোলযোগ। তার চিকিৎসা করলেই ব্যথা সেরে যাবে, শরীর নিরাময় হবে। মেরুদণ্ডের হাড় আমাদের শরীরের ও স্বাস্থ্যের মূল কেন্দ্র। সাধনার দৃষ্টিতেও তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সাধক সুষুম্নাকে ঠিকমত বুঝতে সমর্থ হয়েছেন তিনি সাধনার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করার যোগ্যতা লাভ করেছেন। আর যিনি সুষুম্নাকে ঠিকমত বুঝতে পারেননি তিনি সাধনা করতে চেষ্টা করলেও তাঁর সে চেষ্টা সফল হবে না।

আমাদের শরীরে অনেক চৈতন্য-কেন্দ্র আছে, যেখানে চৈতন্য বিকশিত হয়, প্রকট হয়। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই বিশেষ বিশেষ শক্তির অবতরণ হয়। এই সব কেন্দ্রের সাধনা করতে হবে। বিকশিত করতে হবে। যতদিন আমরা সেগুলিকে বিকশিত করতে না পারি ততদিন প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন উপযোগিতা হবে না। এই

প্রসঙ্গে এক গল্প বলছি, যাতে আলোচ্য তথ্য স্পষ্ট হযে ফুটে উঠবে।

এক ভাই তাব বোনেব বাডি গিযেছে। আহাবেব সময হযেছে। না জানি বোনেব মনে কোন্ ভাবেব উদয হল—সে এক থালা গম এনে ভাইযেব সামনে বেখে দিল। ভাই তো আব প্রাকৃতিক চিকিৎসা কবাচ্ছিল না যে কাঁচা গমই খাবে। বোনেব দেওযা গমেব থালা দেখে ভাই বলল—'বোন। এ কি? এ কি কবে খাওযা যাব?' বোন বলল—'কেন,আমি তো মূল বস্তুই খেতে দিযেছি। সব খাদ্যই তো গম থকে তৈবি হয, তাই ওটাই মূল খাদ্য। আমি ভাবলাম, ভাই আমাব ঘবে এসেছে, তাকে মূল বস্তুই খাওযাব।' ভাই সে কথা শুনল, তাবপব না খেযে উঠে পডল। বেচাবা খাবেই বা কি?

এবপব কযেক মাস গেল। ভাইযেব কাছে বোনেব মেযেব বিযেব সংবাদ এল। বোনেব বাডিতে ভাই এক পুটলি পাঠাল। ভাইযেব বাডি থেকে কিছু এসেছে দেখে বোন খুশি হল। কিন্তু সে পুটলি খুলে দেখল তাব ভিতবে তূলা—কেবল তূলা—আছে। বোন এব অর্থ কিছুই বুঝতে পাবল না। সে আশা কবেছিল খুব ভাল কাপড এসেছে। অথচ এসেছে কেবল তূলা। কিছুদিন পবে ভাই বোনেব বাডি এল। বোন জিজ্ঞাসা কবল—'এ কেমন তামাসা? বিযেতে তূলাব কি দবকাব? পাঠাবে কাপড-চোপড, আব পাঠালে শুধু তূলা। এ কেমন কাজ?' ভাই বলল—'বোন। আমি তো মূল জিনিসই পাঠিযেছি। সব বকম কাপড তো এই তূলা থেকেই তৈবি হয। আমি ভাবলাম, কাপডচোপড কি পাঠাব। বোনেব বাডিতে বিযে হচ্ছে, সেখানে কাপডেব মূল বস্তুই পাঠাই। তাই তূলা পাঠালাম। সব বকম কাপডেব মূলই হল তূলা।'

সব আহার্য বস্তুই গম থেকে প্রস্তুত হয আব সব কাপডই তূলা থেকে তৈবি হয। একথা ঠিকই বটে, কিন্তু এব দ্বাবা পুবো বিষয বলা হয না, তাব একদিক মাত্র বলা হয। আমিও স্বীকাব কবি যে, গম থেকেই সব ভোগ্য দ্রব্য তৈবি হয আব তূলা থেকেই সব কাপড তৈবি হয। কিন্তু কেবল গম দিযে পেট ভবে না আর কেবল তূলা দিযে লজ্জা

নিবারণ হয় না বা শৈত্য ও আতপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। গম দিয়ে খাদ্য বানাতে হয়, তবেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। তুলা দিয়ে কাপড় বুনতে হয়, তবেই লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব হয়, আর শৈত্য ও আতপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। পেট কেবল তখনই ভরবে যখন গম থেকে রুটি বানিয়ে খাওয়া হবে। শৈত্য ও আতপ থেকে কেবল তখনই ত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে যখন তুলা থেকে কাপড় বুনে নেওয়া হবে।

শরীর মূল বস্তু, শরীর কাঁচা মাল। এর থেকে আমরা যা চাই তাই বানাতে পারি, প্রাপ্ত হতে পারি। এই শরীরের মধ্যে আমাদের সকল প্রকার শক্তির কেন্দ্র, চৈতন্যের কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। সেখান থেকে আমরা বর্তমানকে দেখতে পারি, অতীতকে দেখতে পারি এবং ভবিষ্যৎকেও দেখতে পারি। শক্তিবিশেষের অবতরণ হলে আমরা নিজের হাড়কে বজ্রের মত কঠিন করে গড়তে পারি, নিজের বুকের ওপর মোটরগাড়ি বা হাতিকে তুলে নিতে পারি।

এমন অনেক লোক আছে যারা এই প্রকার শক্তি প্রদর্শন করে। তারা বুকের ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যেতে দেয়। অথচ তাদের হাড় ভাঙ্গে না, শরীরের সামান্য ক্ষতিও হয় না। এ কি করে সম্ভব হয়? সম্ভব হয় এই কারণে যে, তারা প্রাণকে সাধনার দ্বারা শক্তিশালী করেছে। তাই তাদের শরীরের কিছুই বিকল হয় না। এটাই নিয়ম। কিন্তু কাঁচা মাল দিয়ে, কেবল শরীর দিয়ে, এমন কিছু করা সম্ভব নয়। কাঁচা গম দিয়ে পেট ভরে না, কেবল তুলা দিয়ে শৈত্য ও আতপের প্রতিরোধ হয় না। পেট ভরানোর জন্য, দেহ আচ্ছাদনের জন্য, অন্য অনেক প্রস্তুতির আবশ্যকতা থাকে। এ কথা শরীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। শরীরের সাধনা করার আবশ্যকতা আছে। তার শক্তি ও চৈতন্যকেন্দ্র-গুলিকে বিকশিত করে নেওয়ার আবশ্যকতা আছে। পূর্ণ প্রস্তুতির আবশ্যকতা আছে। তাই সাধনার দৃষ্টিতে শরীরের সাধনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শরীরের সাধনা করতে হবে। শরীরের প্রত্যেক অবয়বের শক্তি

আব চৈতন্যেব অবতবণ ঘটানোব, অভিব্যক্ত কবানোব যে যে ক্ষমতা আছে, সেই সব ক্ষমতা কেন্দ্রকে আমবা এমন সমর্থ কবে গড়ে তুলব যে প্রবল শক্তিব অবতবণ, বিশাল চৈতন্যেব অভিব্যক্তি সম্ভব হবে, আব আমবা তাব উপযোগ কবতে সক্ষম হব।

শবীব সাধনাব এক উপায হল—আসন। আপনাবা শুনে থাকবেন ভগবান মহাবীব ষোল দিন ষোল বাত একভাবে সোজা দাঁড়িযে থাকতেন। সোজা দাঁড়িযে থাকাও এক প্রকাব আসন। মহাবীব যদি কখন 'উকড়ু' আসনে বসতেন তো সাবাবাত সেই আসনে বসে থাকতেন। এই আসনে পাযেব পাতা মাটিব ওপব থাকে, কিন্তু গোড়ালি থাকে কিছুটা উঁচু। তিনি পাযেব পাতাব ওপব ভব বেখে সাবা বাত সাবা দিন বসে থাকতেন। জৈন, বৌদ্ধ আব বৈদিক পবম্পবায হাজাব হাজাব সাধু ও সন্ন্যাসী হযেছেন। তাঁবা শবীবেব সাধনাব জন্য বিভিন্ন প্রকাব আসনেব সাহায্য নিযেছেন। কোন সাধক এত দীর্ঘ সময একই আসনে বসে থাকেন—একথা অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে মনে হতে পাবে। এটা অস্বাভাবিক মনে হতে পাবে বটে, কিন্তু আসলে এটা তা নয। আপনাকে কেউ যদি বলে, সাবা বাত না শুযে 'উকড়ু' আসনে বসে বাত কাটান, তাহলে আপনি নিশ্চয ভাববেন—এ কি ? এ তো অস্বাভাবিক কথা। কিন্তু যাঁবা শবীবেব সাধনা কবেছেন তাঁদেব কাছে এ সব প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয, অস্বাভাবিকও নয।

কাযোৎসর্গ কবা অস্বাভাবিক ব্যাপাব বলে মনে হতে পাবে। তর্ক উঠতে পাবে যে, শবীবকে নড়াচড়া কবতে না দিযে কি কবে একভাবে বসে থাকা যেতে পাবে ? এ অসম্ভব। আপনাবা জানতে পাবেন যে, ভগবান ঋষভেব পুত্র বাহুবলী বাব মাস ধবে কাযোৎসর্গেব মুদ্রায দাঁড়িযে ছিলেন। এইভাবে পুবো এক বছব গত হযেছিল। তাঁব চাবপাশে ঘাস গজিযে গিযেছিল। লতাপাতা তাঁব শবীবকে ঘিবে ফেলেছিল। পাখিবা তাঁব শবীবেব ওপব বাসা বেঁধেছিল। তিনি স্থিব ও অচঞ্চল ভাবে সোজা দাঁড়িযে ছিলেন। এ কি সম্ভব যে কোন ব্যক্তি এক বছব

ধরে, পুরো বার মাস ধরে, সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন? কোন রকম নড়াচড়া করেন নি? অসম্ভবই মনে হয়। সবাই এ রকম করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য, আপন শক্তিকেন্দ্রগুলিকে বিকশিত ও প্রকট করার জন্য, শরীরের সাধনা করেছেন সে ব্যক্তি ঐরূপ করতে পারেন। এমন অবস্থা যে হতে পারে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমি স্বীকার করি যে, এই অবস্থাকে সম্ভব করে তুলতে যে প্রযত্নের দরকার তা আমরা করতে সমর্থ হই নি।

প্রথম কথাই হল, আসনের অভ্যাস করা। আসন বলতে দাঁড়িয়ে থাকা, শোয়া, বসা—সবই বোঝায়। শরীরের সাধনার জন্য আসনের সাধন খুবই আবশ্যক। আসনের সাধনার অর্থ হল, সুপ্ত শক্তি কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত করা, সক্রিয় করা ও গতিশীল করা। আসন শরীরসাধনার একমাত্র অঙ্গ নয়, আর এক অঙ্গ হল—শ্বাস।

শ্বাস শরীর থেকে আলাদা কিছু নয়, শরীরেরই এক ভাগ। শ্বাসের সাধনার অর্থ, শরীরের সাধনা আর শরীরের সাধনার অর্থই শ্বাসের সাধনা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শ্বাস কি ভাবে গ্রহণ করব? হাজার রকমের আসন যেমন উদ্ভাবিত হয়েছে, তেমনই শক্তি জাগরণের দিকে লক্ষ্য রেখে শ্বাস নেওয়ার হাজার প্রকারের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। আজ আমি সব রকম পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলব না, তাদের সামান্য কয়টির প্রয়োগের কথা বলব।

প্রেক্ষা ধ্যানে আমরা দীর্ঘশ্বাস, সমবৃত্তি শ্বাস ও সহজ শ্বাস—এই তিন রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকি। অবশ্য এই তিন প্রকারই সব নয়। শ্বাসের প্রয়োগ অনেক আসনের সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা শ্বাসকে রুদ্ধ করে বসে থাকতে পারে। কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা ধরে ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করতে পারে। দ্রুত শ্বাস নিয়ে শরীরকে প্রকম্পিত করতে পারে। আবার কোন ব্যক্তি সূক্ষ্ম শ্বাস দ্বারা শরীরকে নিস্পন্দ করে রাখতে পারে। এ সবই উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া। তবে

এগুলির দ্বারা যে বিকাশ হয় তা আত্মিক বিকাশ নয়। এই বিকাশের জন্য প্রযত্ন করার পেছনে এই দৃষ্টি থাকে যে, এর দ্বারা শক্তিকেন্দ্রগুলিকে মজবুত ও দৃঢ় করে গড়া যাবে। কোন লৌহকার বা স্বর্ণকার হাপরের সামনে লোহা বা সোনা রেখে তাকে আগুনে তাপ দেয়। তারা এ কাজ বৃথা করে না। তাদের উদ্দেশ্য, তারা তাপদিয়ে লোহা বা সোনাকে এমন নরম অবস্থায় আনবে যে তারা তাদের ইচ্ছামত আকার ঐ লোহা বা সোনাকে দিতে পারবে। সোনাকে এই উদ্দেশ্যে গালিয়ে ফেলা হয় যে, যে আকারে ইচ্ছা সেই আকারে তা গড়ে নেওয়া যাবে। তেমনই প্রাণায়াম হল, শ্বাসের উত্তাপে শক্তিকেন্দ্রগুলিকে ঢেলে দেওয়ার এক প্রক্রিয়া। এমন বহু প্রক্রিয়া আছে যাতে আমরা শক্তিকেন্দ্রগুলিকে এত উত্তমরূপে বিকশিত করতে পারি যে তাদের মধ্যে অতি উচ্চস্তরের শক্তির অবতরণ ঘটা সম্ভব হতে পারে। আমাদের সমস্ত স্নায়ু-সংস্থান. নাড়ী-সংস্থান প্রভৃতি, যা শক্তিকে ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করে, তা সবই এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত ও শক্তিশালী হয়।

তৃতীয় প্রশ্ন হল, শরীরস্থ চক্রগুলির বিকাশ। এই চক্রগুলি হল জ্ঞানকেন্দ্র, শক্তিকেন্দ্র। শরীর বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় গ্রন্থি, যোগের ভাষায় তাকে বলা হয় চক্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশে দুটি গ্রন্থি আছে। এরা খুবই ছোট এবং পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই দুটি গ্রন্থির মধ্যে বিশেষ একটিকে বিকশিত করার ফল হবে এই যে. সেটি বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মন আনন্দে ভরে যাবে। আপনার সংবেদন নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু ঘটুক না কেন, আপনার মনে কোন সংবেদন হবে না, কোন পীড়া বা ব্যথা হবে না। এক অখণ্ড আনন্দ নিরন্তর বর্তমান থাকবে।

কিন্তু এই গ্রন্থির সঙ্গে জড়িত অপর গ্রন্থিটি যদি জাগ্রত হয়ে যায়, বিকশিত হয়ে যায়, তবে আপনার মন সর্বদা দুঃখে ভরা থাকবে, আর সে দুঃখের শেষ কখনও হবে না। ভাল-মন্দ যাই ঘটুক, দুঃখ নিরন্তর

বর্তমান থাকবে। দুঃখের পার আপনি পাবেন না।

দুটি গ্রন্থি জড়িত হয়েই আছে, অথচ তাদের একটি আনন্দের, অন্যটি দুঃখের। একটি বিকশিত হলে আনন্দের সাগরে হিল্লোল ওঠে, অন্যটি বিকশিত হলে দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। গ্রন্থিদুটি এমনভাবে জড়িত যে তাদের বিশেষ একটিকে জাগ্রত করার প্রক্রিয়ায় বিপদ এই যে, আনন্দের গ্রন্থিকে জাগ্রত করতে গিয়ে সামান্য ভুলের ফলে দুঃখের গ্রন্থির জাগরণ ঘটলে সাধক দুঃখের কূপে নিপতিত হবেন। আনন্দের গ্রন্থিকে জাগাতে গিয়ে দুঃখের গ্রন্থিকে জাগিয়ে তোলা যে কত বড় বিপদ, তা কল্পনা করাও কঠিন।

সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, শক্তি—এ সবই কেবল আমাদের গ্রন্থি, জ্ঞানতন্তু আর শরীর তন্তুসমূহের আধারেই প্রকট হতে পারে। এগুলি সারা শরীরে বিস্তৃত। এমন অবস্থায় আমরা কি করে শরীরকে উপেক্ষা করতে পারি? শরীরকে তৈরি না করে আমরা কেবল ভাবনার বলে আগে এগোতে পারব না। এটা খুবই আবশ্যক যে, আমরা যেমন ভাবনাকে শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করি, তেমনই যেন শরীরের শক্তিকে বিকশিত করার জন্য প্রযত্ন করি। শরীরে যে সব সুপ্ত জ্ঞানতন্তু আছে, জ্ঞানতন্তুর গুচ্ছ আছে—সেগুলিকে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। যতদিন সেগুলি প্রস্ফুটিত না হবে ও তাদের বিশিষ্ট শক্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা বিকশিত না হবে, ততদিন বিশিষ্ট শক্তির ও আনন্দের অবতরণের জন্য চেষ্টা করলেও তা সফল হবে না। শরীর বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের গ্রন্থিগুলির স্রাব ও হর্মোন উপযুক্ত মাত্রায় নির্গত না হলে কোন বিশেষ প্রক্রিয়াই কার্যকর হয় না। স্বাস্থ্যের দিকে থেকেও ওই এক কথা, যতক্ষণ কোন বিশেষ হর্মোনের অভাব থাকবে ততক্ষণ শরীর ঠিক চলবে না।

'থাইরয়েড' একটি গ্রন্থি। যদি ঐ গ্রন্থির স্রাব ঠিক না হয়, উপযুক্ত মাত্রায় না হয়, তবে আপনার মন হতাশায় ভরে যাবে, আর হীন ভাবনা আপনার মনে উদয় হবে। এমন ক্ষেত্রে শরীর যদি শিশুর হয়

তবে তাব বিকাশ বন্ধ হয়ে যাবে, শবীবেব বাড ও হ্রাস প্রভৃতিব মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব এই গ্রন্থিব স্রাবেব ওপব নির্ভব কবে। কেউ খিটখিটে স্বভাবেব হয়, কাবও স্বভাব হয় প্রসন্ন। এটা আপনি কেবল ব্যক্তিগত কর্মফল বলে মনে কববেন না। কর্মেব ফল হতে পাবে বটে, কিন্তু কর্মেব ফল কোন মাধ্যমে প্রকট হবে, সে সম্বন্ধেও আপনাকে চিন্তা কবতে হবে। আমাদেব সবচেয়ে বড ভুল এই যে, আমবা মেনে নিয়েছি প্রত্যেক কার্য ক্রিয়া বা কর্মেব আধাবেব ওপবই ঘটে বা ভাবনাব আধাবেব ওপবই ঘটে। অথবা অন্য কোন নিমিত্ত আমবা মেনে নিয়েছি। কিন্তু একথা আমবা ভুলে গিয়েছি যে, এব পেছনে শবীবেবও হাত আছে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যোগ আছে। আমবা তো শবীবকে উপেক্ষা কবে বসে আছি। আব শবীবকে উপেক্ষা কবাই আমবা বৈবাগ্য বলে মনে কবেছি। একেই আমবা শবীবেব প্রতি বিবক্তি বলে বুঝেছি। আমবা মনে কবেছি, শবীবে এমন কি পদার্থ আছে যে তাব প্রতি আমবা মনোযোগ দেব। শবীবেব প্রতি মনোযোগ দেওযাব কোন আবকশ্যতাই নেই।

এই দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভুল। আমাদেব চিন্তা-ভাবনাব সাথে, আমাদেব প্রসন্নতাব সাথে, আমাদেব শক্তিব বিকাশেব সাথে শবীবেব নিবিড সম্বন্ধ আছে, এ কথা কখনও ভুললে চলবে না। আমবা এখন যদি সাধনাব চর্চা কবতে ও বিশেষ প্রকাব শক্তিকে নিজেব মধ্যে অভিব্যক্ত কবতে চাই, তবে সবাব আগে মনোযোগ দিয়ে এই কথা ভাবতে হবে আমবা কতটা শবীবেব সাধনা কবেছি, শবীবকে আমবা কতদূব উপযুক্ত কবে নিয়েছি। কোন চিত্রকবই উপযুক্ত ভিত্তি ছাডা চিত্র নির্মাণ কবতে পাবে না। সুন্দব চিত্র অঙ্কিত হবে অথচ ভিত্তিতে আছে গোমযেব লেপ, সেক্ষেত্রে সুন্দব চিত্র অঙ্কিত হবে কি কবে? সুন্দব চিত্রেব জন্য উপযুক্ত উপকবণ ও উপযুক্ত অবস্থা চাই। এগুলি যদি মেলে তবেই সুন্দব চিত্র নির্মাণ কবা সম্ভব হয়।

অনুরূপ ভাবে বলতে হয়, আমবা যেন মূল বস্তুকে না ভুলি। শবীবেব সাধনা কবতে হবে, তাব বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলিকে জানতে হবে,

বিকশিত কবতে হবে এবং সেগুলিকে শক্তিশালী কবতে হবে। এ সবই অত্যন্ত জকবী কাজ।

মনোবিজ্ঞানে একটি শব্দ প্রচলিত আছে—মনোদৈহিক। এব অর্থ, শবীবও মনেব সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আমবা শবীব ও মনকে সব বকমে পৃথক কবতে পাবি না। কাবণ বাস্তবিকপক্ষে মন শবীবেব এক অংশ। শবীবেব সমস্ত ক্রিযা মস্তিষ্কেব দ্বাবা নিযন্ত্রিত হয, আবাব মস্তিষ্ক শবীবেবই এক অংশ।

শবীবেব তিনটি প্রধান ভাগ—মস্তিষ্ক, ধড ও পা। মস্তিষ্ক শবীবেব মুখ্য ভাগ। মন শবীবেব এক ভাগ, বচন শবীবেব এক ভাগ আব শ্বাসও শবীবেব এক ভাগ। এ সমস্তই শবীবেব মাধ্যমে প্রকট হয। সিদ্ধান্তেব ভাষায এমন বলা যায যে, মনেব জন্য অণু গ্রহণ শবীবই কবে, বচনেব জন্য অণু গ্রহণ শবীবই কবে এবং শ্বাসেব জন্য অণু গ্রহণও শবীবই কবে। ওদেব জন্য যে কাঁচামাল দবকাব হয তা সবই শবীব যোগান দেয। বাকি সব কিছু পবে তৈবি হয।

মন কাকে বলা হয? মনেব গঠনযোগ্য যে সব অণু শবীব গ্রহণ কবে, সে সব অণু ত্যাগেব ক্রিযাব নামই মন।

বচন কাকে বলা হয? বচনেব গঠনযোগ্য যে সব অণু শবীব গ্রহণ কবে, সে সব অণু ত্যাগেব ক্রিযাব নামই বচন।

শ্বাস কাকে বলা হয? শ্বাসেব গঠনযোগ্য যে সব অণু শবীব গ্রহণ কবে, সে সব অণু ত্যাগেব ক্রিযাব নামই শ্বাস।

এই ভাবে দেখা যায, শবীবই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্র। শবীব সম্বন্ধে দুটি বিষযেব প্রতি আমাদেব মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমটি হল, শক্তিব বৃথা ব্যয আমাদেব বন্ধ কবতে হবে। দ্বিতীযটি হল, আমাদেব প্রাণশক্তি সঞ্চয কবতে হবে।

আমবা জেনে অথবা না জেনে বহু শক্তি ব্যয কবে বসি। শক্তিব ব্যয শবীব কবে, মস্তিষ্ক কবে, স্বচালিত নাডী-সংস্থানও কবে। এই তিনটিব দ্বাবাই শক্তি ব্যযিত হয।

সাধনার ক্ষেত্রে কায়োৎসর্গের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কায়োৎসর্গ করার বিধান বার বার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, শক্তির যে অযথা ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ করা। বলা হয়েছে, মৌন অবলম্বন কর। কেন? এই জন্য যে, কথা বলার দ্বারা যে শক্তি খরচ হয় তা বাঁচান যায়। বলা হয়েছে, মনকে কেন্দ্রিত কর, চঞ্চলতা স্তব্ধ কর। কেন? এই জন্য যে, মস্তিষ্কের যে শক্তি অনর্থক খরচ হয় তা বাঁচান যায়।

এ সবই উৎকৃষ্ট ক্রিয়া। কারণ এদের দ্বারা শরীরের শক্তিকে রক্ষা করা যায় এবং শক্তির বৃথা অপচয় বন্ধ করে তা প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যায়। যে শক্তির বৃথা ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ করে শক্তির ভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখা যায়, আর বিশিষ্ট চেতনার অবতরণের জন্য শক্তির উপযোগ করা যায়।

দ্বিতীয় কথা হল, শক্তির সঞ্চয়—প্রাণশক্তির সঞ্চয়। প্রাণধারা আমাদের শক্তির সবচেয়ে বড় স্রোত। প্রাণধারার দ্বারাই শক্তির প্রাপ্তি হয়। আমাদের শক্তির কেন্দ্র হল মূলাধার চক্র, আর সেখানে অবস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থি। সেখানে প্রাণ উৎপন্ন হয়। মূলাধারের তাপেই প্রাণের উৎপত্তি। নাভিচক্র থেকে স্বাধিষ্ঠান চক্রের নিচ পর্যন্ত দেহের যে ভাগ, সেখানকার তাপে প্রাণতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই প্রাণই আমাদের জীবনী-শক্তি আর প্রাণশক্তি। তা আমাদের জীবনকে সঞ্চালিত করে। এই শক্তিকে উৎপন্ন করা যায়।

এক প্রয়োগের কথা আমি আপনাদের বলছি। আমি নিজে অনেকবার এই প্রয়োগ করে দেখেছি। চলতে চলতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং বোধ করেছি সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে গিয়েছে, পা যেন আর চলছে না, তখন এই প্রয়োগ করেছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ফল পেয়েছি। মনে হয়েছে শরীরে নতুন বল এসেছে, আর সব শ্রান্তি মিটে গিয়েছে। বসে থাকতে থাকতে যখন শিথিলতা অনুভব করেছি তখন দশ-বিশ বার এই প্রয়োগের পুনরাবৃত্তি করেছি, আর

তৎক্ষণাৎ শিথিলতা মিটে গিয়েছে, সজীবতার অনুভূতি এসেছে। এটা প্রাণশক্তিকে উৎপন্ন করার প্রয়োগ। এই প্রয়োগ হল—মূলবন্ধ মুদ্রা। আপনি আপনার গুহ্যদেশকে সঙ্কুচিত করুন। দশ-বিশ মিনিট ঐ মুদ্রায় অবস্থান করুন। আপনার তখন মনে হবে, নতুন শক্তির সঞ্চার হতে আরম্ভ হয়েছে, নতুন সামর্থ্য আসছে। কারণ, প্রাণ উৎপন্ন হওয়ার যে কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রের ওপর আপনি সংযম করেছেন, তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাকে 'জেনারেটর' বানিয়েছেন। এই হল শক্তির সঞ্চয়।

শক্তি উৎপন্ন করতে বাইরের কিছুর সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। সূর্য প্রাণশক্তির, জীবনীশক্তির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র, সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার এবং অক্ষয় ভাণ্ডার। আমরা সূর্যের সাহায্যে প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করতে পারি। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সঙ্কল্প করব—প্রাণশক্তির সংগ্রহ হচ্ছে, সঞ্চয় হচ্ছে, মস্তিষ্কমার্গে প্রাণশক্তির অবতরণ হচ্ছে। দশ-বিশ মিনিট মনে মনে এই সঙ্কল্পকে আলোড়ন করে আমরা ধ্যানস্থ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকব। তখন আমাদের মনে হবে যে, নতুন শক্তির ও স্ফূর্তির সঞ্চার শুরু হয়েছে।

আমি শরীর-সাধনার বিষয় ও উপায় সম্বন্ধে কিছু রেখাপাত করলাম। এটি দিগদর্শন মাত্র। তবে যদি আমরা এ সব কথা ঠিকমত বুঝতে পারি তো শরীরকে আমরা এমনভাবে তৈরি করতে পারব যে, আমরাই অতি বৃহৎ শক্তিকে শরীরে অবতরণ করার জন্য, প্রকট ও অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করতে সমর্থ হব।

৩

শরীর সাধনা

ধ্যানেব সঙ্গে ধ্যেযেব অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ধ্যেয অনেক প্রকাবেব, ধ্যানও অনেক। সকলেব পক্ষে একই ধ্যেয অনুকূল হয না। বিভিন্ন ব্যক্তিব পক্ষে বিভিন্ন ধ্যেয অনুকূল হতে পাবে। একেব পক্ষে যা অনুকূল তা অপবেব পক্ষে অনুকূল নাও হতে পাবে। সহজ শ্বাসেব ওপব ধ্যান কবা কাবও পক্ষে সবল ও অনুকূল হয। কেউ আবাব সহজ শ্বাসকে ধবতে পাবে না, অথচ অনুলোম ও বিলোমকে সহজেই ধবতে পাবে এবং তাব ওপবেই তাব মন জমে যায। কেউ আবাব দীর্ঘ শ্বাসকে অনাযাসে ধবতে পাবে। অতি সম্প্রতি এক সাধক বলেছেন যে, সমবৃত্তি শ্বাসেব ওপব ধ্যান কেন্দ্রিত হয। কিন্তু সহজ শ্বাসকে আযত্ত কবা যায না। সুতবাং দেখা যাচ্ছে, এটা আবশ্যক নয যে, সব সাধকেব পক্ষে ধ্যেয একই প্রকাব হবে। কাবণ, মানুষ যন্ত্র নয বা যান্ত্রিকও নয। প্রত্যেকেব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা আছে, ভিন্ন ভিন্ন কচি আছে। তাই সকলেব ধ্যেয যে একই হবে এমন মনে কবা উচিত নয। যেমন প্রেক্ষা ধ্যেয, তেমনি অনুপ্রেক্ষাও ধ্যেয। আজ আমি কেবল শব্দাত্মক ধ্যানেব আলোচনা কবব। এই ধ্যানকে পদস্থ ধ্যানও বলা হয।

চার প্রকার ধ্যানের কথা বলা হয়েছে—পিণ্ডস্থ, পদস্থ, রূপস্থ আর রূপাতীত। এদের মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান হল—পদস্থ। এটি শব্দ-ধ্যান, শব্দের সাধনা। কথা না বলা, মৌন থাকা এক ব্যাপার, আর কথা বলা আর এক ব্যাপার। আমরা কেবল মৌন থাকব, কথা বলব না, এ সম্ভব নয়, আবার কেবল কথা বলেই যাব, এও সম্ভব নয়। জীবনে বলা ও না বলার সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। না বলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি বলতে চাই যে, আমাদের শব্দ-সাধনা করতে হবে। আমাদের শব্দের মহত্ত্ব বুঝতে হবে, তৎসংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়াও জানতে হবে। এর অর্থ হল, পদস্থ ধ্যান করা বা পদকে ধ্যেয় করা এবং তার আধারেই চিত্তের একাগ্রতাকে স্থাপিত করা।

পদের বিশেষ মহত্ত্ব আছে। আমরা যখন কোন পদ উচ্চারণ করি তখন কেবল পদই নির্গত হয় না বা কেবল শব্দ নির্গত হয় না, সেই সঙ্গে আমাদের ভাবনা, আমাদের সঙ্কল্প, আমাদের মনের শক্তিও বাইরে আসে, আর সব কিছুর সঙ্গে শ্বাসেরও যোগ হয়। শরীর, শ্বাস, বায়ু, ধ্বনি, সঙ্কল্প-শক্তি, মানসিক শক্তি—এই সব কিছুর যখন যোগ হয় তখন কোন শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। কোন ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন সেই বলার পেছনে কেবল শব্দই থাকে না, বিশিষ্ট প্রকারের শক্তিও থাকে, আর বক্তার নিশ্চয় অনুসারে সেই শক্তি প্রকট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা অমরকংকায় গেলেন। সেখানকার রাজা পদ্মনাভ দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন। পদ্মনাভ সংবাদ পেয়ে নিজের সেনাকে সজ্জিত করে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বললেন—'যাও, যুদ্ধ কর।' পাণ্ডবরা যুদ্ধ করতে গেলেন। তাঁরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। পদ্মনাভ সামনে এলেন। পাণ্ডবরা বললেন—'আজ এমন ভীষণ যুদ্ধ হবে যে সে যুদ্ধে হয় আমরা থাকব আর না হয় পদ্মনাভ থাকবে। দু পক্ষের এক পক্ষ মাত্র থাকবে।' এই কথায় মনের যে সঙ্কল্প ছিল, ভাবনা ছিল, তা প্রকট হয়ে গেল। যুদ্ধ হল। পরিস্থিতি এমন হল যে, পদ্মনাভ স্থির থাকলেন

আব পাণ্ডবদেব পলাযন কবতে হল। এব কাবণ, পাণ্ডবদেব সঙ্কল্প শিথিল ছিল। তাঁদেব সঙ্কল্প সূত্র ছিল—'অমৃহে বা পউমনাভে বা' হয আমবা থাকব, নয পদ্মনাভ থাকবে। পদ্মনাভ থাকলেন, আব তাঁবা পালিযে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সব দেখলেন। তিনি এগিযে এসে বললেন, 'সঙ্কল্পেব ভাষা আমি বলছি। 'অমৃহে, ন পউমনাভে'—আমবা থাকব, পদ্মনাভ থাকবে না। আবাব যুদ্ধ হল। পদ্মনাভ যুদ্ধ হেবে পালিযে গেলেন।

আমাদেব মুখ থেকে কেবল শব্দ নির্গত হয না, তাব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব অন্তঃকবণেব শক্তি, সঙ্কল্পেব শক্তিও নির্গত হয। আমাদেব যেমন নিশ্চয, যেমন ভাবনা, আব ঐ নিশ্চয ও ভাবনাব যেমন বল—তা সবই শব্দেব সঙ্গে প্রকট হয। আমবা শব্দেব শক্তিকে বুঝতে পাবছি, আব এও জানতে পাবছি যে শব্দেব সঙ্গে আবও কিছু জডিত থাকে।

আমবা অর্হমেব ধ্বনি কবি, অর্হম্ উচ্চাবণ কবি। প্রেক্ষাধ্যান আবম্ভ হয অর্হম্ ধ্বনিব দ্বাবা। প্রত্যেক কাজ আবম্ভ হয অর্হম ধ্বনি দিযে। কিন্তু কেন? আমবা যখন ধ্যান করতে বসেছি, তবে ধ্বনি কেন? ধ্যানে তো মৌন থাকাই উচিত, কিন্তু অর্হম্ ধ্বনি কেন? অনুপ্রেক্ষা কেন? শব্দেব প্রযোগ কেন?

আমবা শব্দ প্রযোগ ছাডতে পাবি না। শব্দেব শক্তি অতি বিপুল। মন্ত্রেব শক্তিব সঙ্গে লোকে পবিচিত। সেটি কোন্ শক্তি? ও তো শব্দেবই শক্তি। ঐ শক্তি আজ বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে, বিশ্লেষিত হচ্ছে। আমাদেব শবীবেব দুটি মুখ্য ভাগ আছে—একটি মস্তিষ্ক, আব অপবটি শবীবেব বাকি সমস্ত অংশ। এই দুই ভাগেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। শবীবেব মধ্যে বক্তেব গতি আছে, সংক্রমণ আছে। প্রত্যেক ধমনীব ভেতবে, প্রত্যেক স্নাযুব ভেতবে বক্তেব প্রবাহ চলছে। হৃৎপিণ্ড নিজের কাজ কবছে, যকৃৎ নিজেব কাজ কবছে, পাচন-তন্ত্রও নিজেব কাজ করে চলেছে। প্রত্যেক অবযবই আপন আপন কাজে ব্যাপৃত আছে। ফলে সংঘর্ষণ সৃষ্ট হচ্ছে, আব সংঘর্ষণ থেকে বিদ্যুৎ

উৎপন্ন হচ্ছে। একে 'ঘার্ষণিক' বিদ্যুৎ বলা যায, কাবণ সংঘর্ষণ থেকে তা সঞ্জাত হয। আব এক প্রকাব বিদ্যুৎ আমাদেব মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়, একে 'ধাবাবাহিক' বিদ্যুৎ বলা যায। এ বিদ্যুৎ নিবন্তব উৎপন্ন হযেই চলেছে। আমাদেব শবীবে এই দুই প্রকাব বিদ্যুৎ আছে—ঘার্ষণিক বিদ্যুৎ আব ধাবাবাহিক বিদ্যুৎ। দুটিতেই বিপুল শক্তি আছে। বাযু দেহেব মধ্যে প্রবেশ কবছে, তাব ধাক্কায শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। শব্দেব সঙ্গে দুই প্রকাব বিদ্যুৎ যুক্ত হয। শবীবেব, ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ ও মস্তিষ্কেব চুম্বকীয বা ধাবাবাহিক বিদ্যুৎ—উভযই শব্দেব সঙ্গে যুক্ত হয। ফলে শব্দ শক্তিশালী হয, শব্দকে কেন্দ্র কবে শক্তি উৎপন্ন হয।

আমবা যখন কথা বলি, তখন শব্দেব সঙ্গে বিদ্যুৎ নির্গত হয। এক ব্যক্তিব কথা অপব ব্যক্তিব ওপব প্রভাব বিস্তাব কবে। তাব কাবণ, শব্দেব সঙ্গে যে বিদ্যুৎ নির্গত হয সেই বিদ্যুৎ প্রভাবশালী। আমাদেব শবীবে বিদ্যুৎ নির্গমনেব কযেকটি প্রধান স্থান আছে, যথা— হাতেব আঙ্গুল, পাযেব আঙ্গুল, চোখ আব ধ্বনি। এই সব স্থান দিযে শবীবেব বিদ্যুৎ বহির্গমন কবে। শব্দেব সঙ্গে বিদ্যুতেব সংযোগ হয়, আব ঐ সংযোগ শব্দকে শক্তিশালী কবে তোলে। ফলে শব্দ প্রভাব উৎপাদন কবে। শব্দেব তবঙ্গ, প্রকম্পন বাইবে নির্গত হযে শক্তি উৎপন্ন কবে।

সাধাবণ ভাষায এই যা বলছি তাব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওযা যায। আমি যেভাবে কথা বলছি সেভাবে যদি বাব বছব নিবন্তব বলতে থাকি তবে যে পবিমাণ বিদ্যুৎ নির্গত হবে তা দিযে একবাব দাডি কামানোব উপযুক্ত জল গবম কবে নেওযা যাবে। এই পবিমাণ অবশ্য খুবই সামান্য, কিন্তু যখন মুখ-নিঃসৃত শব্দেব সঙ্গে সঙ্কল্পেব শক্তি যুক্ত হয তখন তাতে তীব্রতা আসে, আব তাব গতিও হয তীব্র। সঙ্কল্প শব্দকে এতই তীব্র গতিসম্পন্ন কবে যে, শব্দ এক সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল পথ অতিক্রম কবতে পাবে। আলোব গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লাখ ছিযাশি হাজাব মাইল। কিন্তু সঙ্কল্প-শক্তিব সঙ্গে নির্গত শব্দ এমন বিশিষ্ট প্রকাব গতি-সম্পন্ন হয যে, তা এক সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল যেতে পাবে।

বর্তমানে এ ব্যাপারে বহু প্রকার অনুসন্ধান চলছে। বিজ্ঞানের অনেক বিকাশ হয়েছে। আজ 'সুপারসোনিক' বিমান আকাশের বুক ভেদ করে উড়ে চলেছে। তার গতি শব্দের গতির চেয়েও অধিক। হীরা কাটার জন্য এমন যন্ত্র নির্মিত হয়েছে, যা এক সেকেণ্ডে বিশ হাজার 'স্ট্রোক' বা আঘাত করতে পারে। ঐ যন্ত্র সূক্ষ্ম ধ্বনির দ্বারা চালিত হয়।

আমাদের পদস্থ ধ্যানের শক্তি বুঝতে হবে। পদ এক মাধ্যম। শব্দ এক মাধ্যম। আমরা অর্হনের জপ করি, অর্হনের ধ্বনি করি। অর্হনের ধ্বনি কেবল শব্দ নয়। ধ্যেয় সর্বদা গুপ্ত থাকে, আমাদের সামনে আসে না। ধ্যেয় যদি প্রকট হয়, ধ্যেয়কে যদি প্রকটিত করা যায়, তবে আর ধ্যানের কোন আবশ্যকতা থাকে না। কারণ ধ্যেয় স্থূল রূপেই আমাদের সামনে বিরাজ করে। সর্বদাই অসিদ্ধকে সিদ্ধ করার প্রয়াস করা হয়। তর্কশাস্ত্রে সাধ্যের লক্ষণ করা হয়েছে—'অসিদ্ধং সাধ্যম্'—যা অসিদ্ধ, তাই সাধ্য। যদি সিদ্ধ বস্তু হয়, তবে তাকে সাধ্য করা চলে না, কারণ সিদ্ধকে সাধন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। সাধ্য সেই বস্তুকেই করা যায় যা সিদ্ধ নয়, যাকে সাধা হয়নি, যার সাধনা করতে হবে। যদি অর্হম্ আমাদের সামনে প্রকট হয়, সিদ্ধ হয়, তবে তাকে ধ্যেয় বলে নেওয়ার কোনই আবশ্যকতা থাকে না। আমরা অর্হমকে ধ্যেয় করেছি এই জন্য যে, তা আমাদের কাছে প্রকট নয়, সিদ্ধ নয়। আমরা তাকে প্রকট করতে, সিদ্ধ করতে, চেষ্টা করি।

আমরা অর্হম্‌কে ধ্যেয় করে নিয়েছি। অর্হম্‌কে ধ্যেয় করার দুটি উপায় আছে— আকার ও শব্দ। আমরা ধ্যেয়র কোন প্রতিকৃতি করি বা মূর্তি বানাই, অর্থাৎ কোন আকারে তাকে গড়ে নিই এবং কল্পনা করি যে, এটিই অর্হম্।

দ্বিতীয় উপায় হল শব্দ। আমরা অর্হম্‌কে ধ্যেয় করি, আর শব্দকে করি ধ্যানের মাধ্যম। আমরা অর্হমকে জপ করি, ধ্বনি করি। আমরা অর্হমের ধ্বনিকে কেবল উচ্চারণ করি না, কিন্তু ঐ উচ্চারণের পেছনে আমাদের যে ধ্যেয় অর্হং গুপ্ত আছেন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি।

শব্দকে মাধ্যম করে, অর্হম্ শব্দ যার প্রতিনিধিত্ব করে, অর্হতের সেই স্থিতি পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে চাই। আমরা সেই স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, যা অর্হম শব্দের বাচ্য। তাই হল অর্হতের স্থিতি।

একটি বাচ্য, অপরটি বাচক। শব্দ বাচক, তার অর্থ বাচ্য। অর্হম্ বাচক, আর তার যা অর্থ তা বাচ্য। অর্হম শব্দের অর্থ হল, অর্হতের স্থিতি। আমরা বাচকের দ্বারা বাচ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। সাধন দ্বারা সাধ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। আমরা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে নিজের ভাবনা জুড়ে দিয়ে নিজের ভেতরে অর্হতের যে স্বরূপ লুক্কায়িত আছে তাকে প্রকট করতে চাই।

অর্হমের এই প্রকৃষ্ট ভাবনা যদি আমাদের বোধগম্য হয় তবে অর্হমের ধ্বনির প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে পারব, আর এই ভাবনা যদি বোধগম্য না হয় তবে অর্হমের ধ্বনি আমাদের কাছে এক প্রথাগত শব্দ রূপেই থেকে যাবে।

মন্ত্রের পদের নির্বাচন এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হয়। সর্ব প্রথম দৃষ্টিকোণ হল, শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র পদের সম্বন্ধ। আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে, আমাদের সাধনার সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্বাস সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ সাধন। আমরা শ্বাসকে যেন বিস্মৃত না হই, তার গুরুত্ব যেন ভুলে না যাই। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে শ্বাসের যোগ করা প্রয়োজন।

মন্ত্রের নির্বাচন এমন হবে, যাতে এক নিঃশ্বাসেই সম্পূর্ণ মন্ত্র রটন করা যায়। মন্ত্রের সঙ্গে শ্বাসের লয় যুক্ত করা চাই। শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই। অর্হম একটি মন্ত্র শব্দ। এর উচ্চারণ সহজেই আনন্দের সঙ্গে এক শ্বাসেই করা যায়। তাতে কোন অসুবিধেই নেই। দীর্ঘ উচ্চারণ করলেও এই শব্দ একই শ্বাসে সমাপ্ত হবে।

তবে নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হতে পারে। মন্ত্র বড়ও হতে পারে। যেমন—ণমো অরহংতাণং, ণমো সিদ্ধাণং, ণমো আয়রিয়াণং,

ণমো উবজঝায়ণং, ণমো লোএ সব্ব সাহূণং। এই মন্ত্রে পাঁচ পদ আছে। পাঁচ পদের এই পুরো মন্ত্রটি একই শ্বাসের উচ্চারণ করা খুবই কঠিন কাজ। সে ক্ষেত্রে এক উপায় আছে। মন্ত্র যদি বড় হয় তবে তাকে ভাগ করে নেওয়া যায়। এক এক ভাগ এক এক শ্বাসে উচ্চারণ করা যায়। 'ণমো অরহংতাণং'—এই ভাগের উচ্চারণ এক শ্বাসে সহজেই করা যায়। 'ণমো সিদ্ধাণং'—এই ভাগের উচ্চারণ দ্বিতীয় শ্বাসে করা যায়। এই ভাবে পাঁচটি পদ পাঁচটি শ্বাসে উচ্চারণ করা সম্ভব হয়। পাঁচ শ্বাসে পুরো মন্ত্রের জপ করা যায়। শ্বাসের কথা এখানেই পর্যাপ্ত নয়। শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র-পদের লয়বদ্ধতা হওয়া আবশ্যক।

সঙ্গীতজ্ঞ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গান গায়। বাদ্যের সঙ্গে তার গানের লয়ের একতা হয়। সেই রকম, শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র পদের একতা হওয়া দরকার। শ্বাসের সঙ্গে যখন মন্ত্র পদের লয় যুক্ত হয় তখন সহজেই একাগ্রতা আসে। তখন শ্বাস ও মন্ত্র পদের উচ্চারণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকে না। উভয়ের সম্পূর্ণ মিল হয়, ফলে তন্ময়তা এসে যায়। শ্বাসের প্রকম্পন আর ধ্বনির প্রকম্পন—দুটি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

আমরা সবাই এক প্রকম্পনের জীবন যাপন করি। যদি এমন কোন ক্যামেরা বা আয়না থাকত যার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পারতাম, তবে দেখার ক্ষমতা থাকলে আমরা দেখতাম যে বাইরের সব কিছু কেবল স্থূল ও বস্তুত তুচ্ছ। সূক্ষ্মরূপে দেখতে গেলে সমস্ত শরীর অণুর প্রকম্পন মাত্র। প্রবল বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। জোরে জল নিচে গড়িয়ে পড়ছে। জলে একটি বুদ্‌বুদ উঠল, আর ফেটে পড়ল। দ্বিতীয় বুদ্‌বুদ উঠল, আর ফেটে পড়ল। আবার তৃতীয় বুদ্‌বুদ উঠল ও ফেটে পড়ল। এই ক্রমই চলতে লাগল। প্রবল বর্ষায় বুদ্‌বুদের নাচন লেগে যায়। আমাদের শরীরেও এই রকম নাচ চলছে। পরমাণু আসছে, আবার যাচ্ছে, সংঘটিত হচ্ছে, আবার বিঘটিত হচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে। সারা শরীর যেন তরঙ্গ প্রবাহের প্রকম্পনের

এক পুলিন্দা। তবে ভাগ্য ভাল এই অবস্থা দেখতে পাওয়ার উপায় আমাদের নেই। তাই আমরা মনে করি যে, শরীর একটি সুদৃঢ়, নিরেট বস্তু। কিন্তু নিরেট হবে কি করে? বিজ্ঞান স্বীকার করে যে আমাদের সমস্ত দৃশ্য জগৎ, যাকে আমরা জানি ও চিনি, তাকে যদি কেটেকুটে একত্র সংহত করি, তবে তা আয়তনে একটা খেলার বলের মত হবে। সারা জগৎ একটা বল যতটা বড়, মাত্র ততটা বড় হবে। কেবল আপনারা বা আমরা নই, সব পাহাড়, নদীনালা, সব ঘরবাড়ি, সমস্ত বালুকণা সব কিছু কেটেকুটে এক করে নিলে, সেই পুঞ্জিত বস্তুর পরিমাণ হবে একটা বলের যে পরিমাণ, কেবল তাই। নিরেট বস্তু খুবই কম আছে। কেবল প্রকম্পন, প্রকম্পন আর প্রকম্পন। শরীরকে নিরেট বস্তু বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে যান, ভেতরে গেলেই দেখবেন সবই ফাঁপা, কেবল ফাঁপা। ওপরে চামড়া দিয়ে ঢাকা, তাই ভেতর দেখাই যায় না। একটি মানুষকে কেটেকুটে একত্রিত করে নিলে বোধহয় তা একটি পরমাণুর সমানও হবে না। শরীরের তরঙ্গ, শ্বাসের তরঙ্গ, বিচারের তরঙ্গ, ধ্বনির তরঙ্গ—আমরা কেবল তরঙ্গের দ্বারা বেষ্টিত আছি। দর্শনের ভাষায় বলতে হয়, আমরা পর্যায়ের দ্বারা বেষ্টিত আছি। পর্যায়ের পর পর্যায়। দ্রব্য কোথায়? আত্মা দ্রব্য, তাকে তো দেখা যায় না। অণুও দ্রব্য, কিন্তু তা অতি সূক্ষ্ম। সবই পর্যায়ের আবর্ত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ। পর্যায়ের পর পর্যায়। প্রকম্পনের পর প্রকম্পন। প্রকম্পনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনধারা চলেছে।

আমরা ঠিকভাবে প্রকম্পনের উপযোগ করব, তার শক্তির উপযোগ করব। ধ্বনির তরঙ্গের উপযোগ করতে আমরা শিখব। ধ্বনির তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন শক্তিকে ঠিকভাবে নিয়োজিত করব। যখন ধ্বনি তরঙ্গ মনের তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, সঙ্কল্পের তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, আর শ্বাসের তরঙ্গের সঙ্গেও যুক্ত হয়, তখন অতি বড় শক্তি উৎপন্ন হয়।

শব্দের কম্পন তার চরম সীমান্তে পৌঁছে 'ক্ষ' কিরণ-এক্স-রে-রূপে পরিণত হয়। তখন তার গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল হয়ে

যার। সংকল্পের কম্পন তাতে আরও শক্তি নিয়োজন করে। একজন যোগের মর্মজ্ঞ আচার্য বলেছেন, যার দৃঢ় নিশ্চয়ে কোন ছেদ নেই, সে কি না করতে সমর্থ? তার পক্ষে কিছুই দুষ্কর নয়। শব্দের সিদ্ধি আস্থার থেকে হয়। আস্থাহীন শব্দ শক্তিশূন্য হয়ে যায়। শব্দের সাধনার অর্থই হল আস্থা ও শব্দের মধ্যে ব্যবধান লোপ করা। আর অর্থ হল, ধ্বনিকে আস্থার কবচ পরিয়ে দেওয়া।

৪

মনের পটুতা বিধান

আমাদের চেতনার অনেক স্তর আছে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক স্থূল স্তর হল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম, আর বুদ্ধি অপেক্ষা অধ্যবসায় সূক্ষ্ম। এই রকম অসংখ্য স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের নামকরণ করা সম্ভব নয়। চেতনার অনেক স্তরের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, অনেক স্তরের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে।

ইন্দ্রিয়গুলি খুবই স্থূল, তাই তারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। মনের চেতনা সূক্ষ্ম, তাই মনকে বোঝা অপেক্ষাকৃত কঠিন। আমরা ধ্যান করি, আমাদের ধ্যানের সম্বন্ধ মনের সঙ্গে। ধ্যানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সোজাসুজি সম্বন্ধ নেই। ধ্যানের প্রথম সম্বন্ধই মনের সঙ্গে। ধ্যান এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া। বাস্তবিক পক্ষে ধ্যান খুব বিপজ্জনক। ধ্যান খুব সহজ কাজ নয়, এর থেকে অনেক বিপদ হতে পারে। যা লাভজনক হয়, তা বিপজ্জনকও হয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার থেকে কেবল লাভই হয় কখনও কোন বিপদ হয় না। বরং লাভের সম্ভাবনা যত অধিক হয় বিপদের সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ধ্যান থেকে আমরা যেমন অনেক

কিছু লাভ কবতে পাবি, তেমনই ধ্যান থেকে আমাদেব অনেক বকম বিপদও হতে পাবে। যদি আমবা ঠিক প্রক্রিযা না বুঝে ধ্যান কবতে যাই তবে অনেক ক্লেশেব মধ্যে পডতে পাবি। ধ্যানেব দ্বাবা এক বিশেষ প্রকাব তাপেব সৃষ্টি হয। কেউ যদি সে তাপ সহ্য কবতে না পাবে তবে সে পাগল হযে যেতে পাবে। সেজন্য ভালভাবে বুঝে সুঝে, বিচাব বিবেচনা কবে ধ্যান কবা উচিত। ধ্যানেব ক্ষেত্রে খুব ধীব গতিতে অগ্রসব হওযাই উচিত। এটা সম্ভব নয যে, প্রথম দিন ধ্যান কবতে বসেই এক ঘণ্টা ধবে ধ্যান কবতে পাবব। এক ঘণ্টা ধ্যান কবাব অভ্যাস কবতে দীর্ঘ সময লাগে। প্রথম দিন যদি দু মিনিট ধ্যান হয তবে বিবাট সফলতা লাভ হযেছে মনে কবতে হবে। দু মিনিট ধ্যান সামান্য কথা নয। যদি কোন ব্যক্তি দু মিনিট কেন্দ্রিত থাকতে পাবে, একাগ্র থাকতে পাবে, স্থিব থাকতে পাবে, তবে বুঝতে হবে তাব সাফল্য এসেছে, তাব উপলব্ধি হযেছে। এমন লোক খুবই কম মেলে যে এক বৎসবেব চেষ্টায দু মিনিট ধবে এক বিষযে একনাগাডে একাগ্র থাকতে পাবে। কাবণ ঐ সমযেব মধ্যেই তাব মন বিচলিত হযে যেতে পাবে। দু মিনিট কাল মনে কোন ব্যবধান আসবে না, কোন বিকল্প উদয হবে না—এ বড কম কথা নয।

আমাদেব মনে নিবন্তব বিকল্প উদয হচ্ছে, ব্যবধান এসে যাচ্ছে। আমবা কোন এক বিচাব নিযে বসলাম। সেই বিষযেব ওপব একাগ্র হওযাব চেষ্টা কবা মাত্রই মনে বিভিন্ন বিকল্প আব ব্যবধান উৎপন্ন হতে থাকে। মন যখন চঞ্চল অবস্থায থাকে তখন কত যে ব্যবধান হতে পাবে তা কল্পনা কবাই যায না। একাগ্র হলে পবে বোঝা যায যে বিকল্পেব প্রবাহ কত দ্রুত চলছে আব একাগ্রতায কত ব্যবধান উৎপন্ন কবছে। ধ্যান খুবই বিপজ্জনক। প্রথম ক্ষণেই বা প্রথম দিনেই বা শিক্ষণ-শিবিবেব প্রথম আযোজনেই ধ্যান সিদ্ধ হযে যাবে—এটা কোন কথাই নয। এটা স্পষ্ট মনে বাখতে হবে এখন যে অভ্যাস চলছে তা কেবল অবধানেব অভ্যাস।

যোগের ভাষায় মনের তিন অবস্থা আছে—অবধান, একাগ্রতা বা ধারণা, আর ধ্যান। মনোবিজ্ঞানেও অনুরূপ বিচার আছে। তাতেও তিন অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যথা—অ্যাটেন্‌শন, কনসেনট্রেশন আর মেডিটেশন। অবধান, কেন্দ্রীকরণ আর ধ্যান। মনের এই তিন অবস্থা। সমস্ত মানসিক ক্রিয়া এই তিন অবস্থার মধ্যেই ঘটে।

মনের প্রথম অবস্থা—অবধান, অ্যাটেন্‌শন। এটা মনের ক্রিয়া, যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা মনকে কোন বস্তুর প্রতি ব্যাপৃত, লগ্ন করি। যে মন সর্বদা ঘুরে বেড়ায়, তাকে এক বস্তুর প্রতি ব্যাপৃত করা, মনকে সচেতন করা—চৈতন্যবান করা—এই হল অবধানের অবস্থা। এই অবস্থায় পদার্থের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একেই অবধান বলে। আমরা বলি—সাবধান হয়ে যাও। এর অর্থ হল—এক কার্যের প্রতি একচিত্ত হয়ে যাও। যা করতে হবে কেবল তার ওপর চিত্তকে লগ্ন কর।

অবধান যেমন বাহ্য বস্তুর ওপর হয়, তেমনই সময় সময় নিজের মূল স্বরূপের প্রতিও হয়। যখন মৌলিক স্বরূপের প্রতি অবধান হয়, তখন সেই স্থিতিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়। আর বাহ্য বস্তুর প্রতি অবধান হয় না। মনের অবধান তখন নিজের প্রতিই চালিত হয়। নিজের প্রতি মনের অবধান এক বিশেষ প্রকার স্থিতির লক্ষণ। এই স্থিতিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়, আন্তরিক চেতনা প্রকট হয়।

মনের দ্বিতীয় অবস্থা—কন্‌সেন্‌ট্রেশন, যা যোগের ভাষায় একাগ্রতা বা ধারণা। এটা অবধানের পরের অবস্থা। এই অবস্থায় আমরা যে বিষয়ে অবধানকে ব্যাপৃত করেছি, পদার্থের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ স্থাপিত করেছি, সেই বিষয়েই কেন্দ্রিত হয়ে যাই। যে মন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেক বস্তুর প্রতি ধাবিত হচ্ছে, তাকে অন্য সব বস্তু থেকে হটিয়ে এনে একই বস্তুতে কেন্দ্রিত করা—এই হল কন্‌সেন্‌ট্রেশন, একাগ্রতা বা ধারণা। এই মনের ধারণাবস্থা। ধ্যানের আগে ধারণা করতে হয়। শরীরের কোন অংশে বা কোন বস্তুতে মনকে স্থাপিত করে নেওয়া, মনকে আরোপিত করে নেওয়া—এই হল ধারণা।

পতঞ্জলি ধারণার এই পরিভাষা করেছেন—'দেশবন্ধঃ চিত্তস্য ধারণা' চিত্তকে কোন প্রদেশে বেঁধে দেওয়া, কোন বস্তুর সঙ্গে চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপিত করা যাতে চিত্ত তাতেই বাঁধা থাকবে, অন্যত্র কোথাও যাবে না, এই হল ধারণার অবস্থা।

মনের তৃতীয় অবস্থা—মেডিটেশন, ধ্যান। অবধানের পর ধারণা, আর ধারণার পর ধ্যান। কেন্দ্রীকৃত মনের যে সঘন অবস্থা, তাই হল ধ্যান, ধ্যানে মন স্থির হয়ে যায়, একেবারে জমে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে মন যখন জমে থাকে তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় ধ্যানাবস্থা। এই হল মেডিটেশন, ধ্যান।

আমরা তিন অবস্থা সম্বন্ধেই বিচার করলাম। ধ্যান হল তৃতীয় অবস্থা।

সর্বপ্রথমে অবধানের অভ্যাস করতে হবে। মনের এমন স্থিতি আনতে হবে যাতে অবধান করা সম্ভব হয়। মন অত্যন্ত গতিশীল তত্ত্ব। মনের কাজই হল গতির ওপর থাকা। বাস্তবে কিন্তু এটাই মনের স্বভাব নয়। আমরা একেবারে বিপরীত দিকে যেতে চাই। স্রোতের সঙ্গে চলা খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই স্রোতের সঙ্গে চলতে পারে। নৌকাও স্রোতের সঙ্গে চলে। স্রোতের প্রতিকূলে চলা কঠিন কাজ। যে স্রোতের প্রতিকূলে চলতে সক্ষম হয় সেই সাধক, সাধনা তাকেই সাজে। ভগবান মহাবীর বলেছেন—

'অনুসোযপটিঠএ বহুজণম্মি পডিসোযলদ্ধলকেখণং।
পডিসোযমেব অপ্‌পা দাযব্বো হোউকামেণং॥'

সমস্ত সংসার স্রোতের পিছেই চলছে। সারা সমাজ, সকল জনতা স্রোতের পিছে চলছে—প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এরূপ স্থিতিতে প্রতিস্রোতে চলা খুবই কঠিন কাজ। তিনি আগে খুবই মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—'অনুসোও সংসাও, পণ্ডিসোও উত্তারো'—অনুস্রোত অর্থাৎ স্রোতের পিছনে চলা—তারই নাম সংসার। স্রোতের পেছনে চলাই হল চঞ্চলতা। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলা—তাকেই বলে অশান্তি,

তাকেই বলে দুঃখ। স্রোতেব প্রতিকূলে চলা—তাকেই বলে শান্তি। তাকেই বলে স্থিবতা, তাকেই বলে উত্তবণ, পাব পেয়ে যাওয়া। যে স্রোতেব প্রতিকূলে চলাব ক্ষমতা বাখে সে বাস্তবিকই পাব পেয়ে যায। ধ্যানেব ক্রিযা প্রতিস্রোতেব ক্রিযা, স্রোতেব প্রতিকূলে চলাব ক্রিযা। যে মন চঞ্চল ও গতিশীল তাকে কেন্দ্রিত কবা, অবহিত কবা, স্থিব কবা—এ সবই বিপবীত ক্রিযা অর্থাৎ মনেব যে স্বভাব নয সেই স্বভাবেই মনকে টেনে স্থাপিত কবা। এব থেকেই বোঝা যায, ধ্যান কত কঠিন ক্রিযা। এ কথা মনে কববেন না যে, ধ্যান খুবই সহজ ও সবল ক্রিযা। আমি ধ্যানকে বিভীষিকা রূপে দেখাতে চেষ্টা কবেছি। হযত কিছু লোক এতে ভয পেয়ে যাবে। তাবা ভাববে ধ্যানেব সাধনা যদি এত কঠোব হয তবে তাবা ধ্যান কবতে বসবে কেন? আমি চাই না যে বস্তুস্থিতি কি—প্রকৃত অবস্থা কি, তা আপনাবা বুঝবেন না। আপনাদেব মনে ভয হতে পাবে বলে আমি সত্যকে গোপন কবব—একথা আমি মানি না। এবকম ভ্রান্তি আমি পছন্দ কবি না। আমি চাই না যে আপনাবা ভ্রান্তি নিয়ে থাকুন। যে জিনিষ যে বকম তাকে ঠিক সে বকমই বুঝতে হবে। ধ্যানেব সাধনা বাস্তবিকই কঠিন। আমবা যদি ধ্যানকে সহজ মনে কবে চলি তবে আমবা ভ্রমে পতিত হব, আব হযত আমবা ধ্যানেব স্থিতি পর্যন্ত পৌছতেই পাবব না। এ বকম আত্ম-আন ভ্রান্তি বাঞ্ছনীয নয। আমবা ধ্যান কবছি মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গাব জন্য, প্রমাদকে ধ্বংস কবাব জন্য। সে স্থলে যদি ধ্যানেব দ্বাবা নতুন মূর্চ্ছা বা নতুন ভ্রান্তি জন্ম নেয তবে খুবই অনিষ্ট হবে। আমবা অসত্যকে দূব কবাব জন্য ধ্যান কবছি, অথচ ধ্যানেব ফলে নতুন অসত্যেব সৃষ্টি হল এ কখনই বাঞ্ছনীয পবিস্থিতি হতে পাবে না। সেজন্য যথার্থবাদী ও বস্তু-বাদী হয়ে, বাস্তবিক অবস্থা বুঝে, আমাদেব ধ্যানেব মার্গে প্রবেশ কবতে হবে। আমাদেব মানতে হবে ধ্যান এক দীর্ঘস্থাযী সাধনা, এক সুদীর্ঘ প্রক্রিযা। অল্প সমযেব মধ্যেই ধ্যানকে সিদ্ধ কবাব জন্য আমবা যেন ত্ববা না কবি। ধ্যানকে সিদ্ধ কবাব জন্য যে প্রস্তুতিব প্রযোজন তাব

আলোচনা আমি 'কাকে সাধনা করব ?'—এই বিষয়ের অন্তর্গত করেছি। সম্পূর্ণ তৈরি না হয়ে, অন্য যে সাধন প্রয়োজন তা সমাপ্ত না করে, আমরা যদি ধ্যানকে সিদ্ধ করতে চাই, তবে লাভের বদলে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক হবে।

যে ব্যক্তি মন্ত্রের সাধনা করছে সে যদি কবচের ক্রিয়া না করে, তবে তার ভীষণ বিপদ হতে পারে। সর্বপ্রথমেই তাকে আত্মরক্ষার কবচ বানিয়ে নিতে হয়। এজন্যই বিভিন্ন মন্ত্রের দীক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন কবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কবচ তৈরি করার উদ্দেশ্য হল, নিজের জন্য বজ্রসম দৃঢ় পঞ্জর নির্মাণ করা। কবচ প্রস্তুত করে নেওয়ার পরে বাইরের কোন শক্তি কবচধারীকে আঘাত করতে পারে না। শরীরের প্রত্যেক অবয়বের জন্য পৃথক পৃথক কবচের ব্যবস্থা আছে। মাথা থেকে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যেক অবয়বকেই কবচ পরিয়ে দিয়ে সুরক্ষিত করা যায়।

প্রাচীনকালে সৈনিক কবচ ধারণ করে যুদ্ধস্থলে আসত। লোহা বা অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি কবচ এত মজবুত হত যে তরবারি বা বর্শার আঘাত তা ভেদ করতে পারত না। কবচ পরিধান করে যোদ্ধা সুরক্ষিত হত, বাইরের আঘাত থেকে মুক্ত থাকত।

অনুরূপ ভাবে, মন্ত্রের সাধক মন্ত্রের সাধনা আরম্ভ করার আগে কবচ তৈরি করে তা ধারণ করে, যাতে বাইরের কোন শক্তি তাকে আঘাত করতে না পারে বা তার কোন অনিষ্ট করতে না পারে।

প্রস্তুতি সকলকেই করতে হয়। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। ধ্যানের জন্যও পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে শরীরের সাধনা খুবই দরকারী। আর মানসিক প্রস্তুতির জন্য সর্বাগ্রে অবধানের অভ্যাস করা আবশ্যক।

সেজন্য আজ আমি ধ্যানের আলোচনা করার আগে মনকে পটু, কুশলী ও প্রশিক্ষিত করার বিষয়ে আলোচনা করছি। মনকে এই প্রকারে প্রশিক্ষিত করতে হবে যে, মনের ক্ষমতা বিকশিত হবে আর

ধ্যানেব স্থিতি পর্যন্ত পৌছে যাওযাব যোগ্যতা সম্পাদিত হবে। অবধান দ্বাবা যোগ্যতাব সম্পাদন হয। মনকে পটু না কবে—মনেব পটুতা বিধান না কবে—ধ্যানেব ভূমি পর্যন্ত পৌছান সম্ভব হয না। সেজন্য মনকে কুশলী ও দক্ষ কবা বিশেষ প্রযোজন। মনকে পটু কবাব জন্য অনেক বকম অভ্যাস বিধান কবা হয। আসনেব অভ্যাস এই জন্য কবান হয যে, এব দ্বাবা শবীবে পটুতা আসে। আসনেব দ্বাবা আমাদেব মেরুদণ্ডেব হাড এমন নমনীয হয যে, আমবা ইচ্ছামত শবীবকে বাঁকাতে বা ঘোবাতে পাবি। যাব মেরুদণ্ডেব হাড নমনীয নয সে শবীব বাঁকাতে পাবে না, তাব শবীব অনড হয। যেমন শাবীবিক সাধনাব উদ্দেশ্যে মেরুদণ্ডেব হাড নমনীয বাখাব জন্য আসনেব অভ্যাস কবা আবশ্যক, তেমনই মানসিক সাধনাব উদ্দেশ্যে অবধানেব বিবিধ প্রযোগ কবাও আবশ্যক।

মনেব সম্বন্ধ বাহ্য বিষযেব সঙ্গে। মনকে আমবা শিক্ষিত কবতে চাই। মনেব প্রশিক্ষণেব একটি ক্রম আছে। নন্দীসূত্রে এই ক্রম সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হযেছে।

প্রথম ক্রম-যুগল হল—অল্পগ্রাহী, বহুগ্রাহী। মনকে আমি এক কাজে লাগালাম, যাব একবিন্দু মাত্রই মন ধবতে পাবে, মন অল্পই ধবতে পাবে আব অল্পকালই কোন বস্তুকে ধবে বাখতে পাবে। এই হল অল্প-গ্রাহী। বহুগ্রাহীব অর্থ—বহুকে ধবা, বড বস্তুকে ধবা, আব দীর্ঘকাল ধবে বাখা।

আমবা প্রেক্ষা কবি। শবীবেব প্রেক্ষা কবি, শ্বাসেব প্রেক্ষা কবি। উপদেশ দেওযা হয, নাসাগ্রে যাতাযাতকাবী শ্বাসকে দেখ। শ্বাসেব আগম দেখ, নির্গমও দেখ। যে শ্বাস ভিতবে আসছে তাব প্রতি লক্ষ্য বাখ। যে শ্বাস বাইবে যাচ্ছে, তাকেও লক্ষ্য কব। নাসাগ্র বিন্দুতে কেবল শ্বাসকে দেখ। মনকে নাসাগ্রেব ওপব কেন্দ্রিত কব, অবহিত কব। মনেব অবধানকে নাসাগ্রেব ওপব স্থাপিত কবে যাতাযাতকাবী শ্বাসকে দেখ। দবজায দাঁডিযে প্রহবী সর্বদা দৃষ্টি বাখে, কে ভেতবে

আসছে আর কে বাইরে যাচ্ছে। যখন কেউ ভেতরে আসে বা বাইরে যায়, তখন প্রহরী সতর্ক হয়ে দেখে। সেই রকমভাবে নাসাগ্র থেকে যে শ্বাস আসছে-যাচ্ছে, তাকে দেখতে হয়। এই শ্বাস বাইরে গেল, এই শ্বাস ভেতরে এল--এই গতাগতি দেখ, ধ্যানকে কেন্দ্রিত কর। এই হল অল্পের প্রেক্ষা, অল্পের অবধান। এই হল অল্পগ্রাহী।

বহুগ্রাহী অর্থাৎ বহুর প্রেক্ষা। উপদেশ দেওয়া হয়, মনকে শ্বাসের সঙ্গে ভেতরে নিয়ে যাও, প্রশ্বাসের সঙ্গে মনকে বাইরে নিয়ে এস। এটা বহুর অবধান—বহুগ্রাহী। অল্পগ্রাহীর ক্ষেত্রে আমাদের পথ ছিল অল্প, এখন আমাদের পথ হল দীর্ঘ। অল্পগ্রাহীর ক্ষেত্রে মনকে কেবল নাসাগ্রে স্থির রাখা হয়েছিল, এখন মনকে শ্বাস-প্রশ্বাসের পুরো পথেরই অবধান করতে হয়। পথ দীর্ঘ হয়ে যায়, ফলে যাত্রাও দীর্ঘ হয়। যেখানে নাভির আশপাশ থেকে শ্বাস উঠছে সেখানেই শ্বাসের সাথে মনকে জুড়ে দিতে হয় আর তাকে শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে নিয়ে যেতে হয়। যেখানে গিয়ে শ্বাসযন্ত্র সমাপ্ত হয় আর শ্বাস ফুসফুসে প্রবেশ করে, সেখান পর্যন্ত মনকে নিয়ে যেতে হয়। একেবারে ডায়াফ্রাম পর্যন্ত মনকে নিয়ে যেতে হয়। যেখানে শ্বাসের সীমা সে পর্যন্ত শ্বাসকে টেনে নিতে হয়। এই হল বহুর অবধান, বহুর গ্রহণ, বহুর প্রেক্ষা। সুতরাং অভ্যাসের এই দুটি ক্রম আছে—

১। অল্পের গ্রহণ—অল্পকে দেখার অভ্যাস।

২। বহুর গ্রহণ—বহুকে দেখার অভ্যাস।

প্রথমটির ক্ষেত্রে আমরা একটি ক্ষুদ্র বিন্দুকে দেখি, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমাদের পথ দীর্ঘ হয়ে যায়, অবগাহনের মার্গও দীর্ঘ হয়ে যায়।

অভ্যাসের দ্বিতীয় ক্রম-যুগল হল—

একবিধগ্রাহী।

বহুবিধগ্রাহী।

এক প্রকার বস্তুকে দেখা আর বহু প্রকার বস্তুকে দেখা। উপদেশ দেওয়া হয়েছে, নাসাগ্রে যে প্রকম্পন হচ্ছে তা দেখ, অথবা নাসাগ্রের

ওপব শ্বাসেব স্পর্শ অনুভব কব। এও এক প্রকাবেব অবধান।

যেমন জলে প্রকম্পন হয়, উর্মিমালা ওঠে, তেমনই শবীবও প্রকম্পিত হয়। কেবল প্রকম্পন আব প্রকম্পন। উর্মি আব উর্মি। স্থিবতা বলে কোন পদার্থই নেই। এই পবিস্থিতিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, নাসাগ্রে যে প্রকম্পন হয় তা দেখ। এও এক প্রকাবেব গ্রহণ, এক প্রকাবেব অবধান। এতে মনকে এক স্থানেব ওপব অবহিত কবে দেওয়া হয়েছে। একে বলে, একবিধগ্রাহী।

বহুবিধগ্রাহীব অর্থ হল—এক সঙ্গে অনেক বস্তুকে দেখা। মনেব পটুতা আবও বেড়ে যায়। একসঙ্গে অনেক বস্তুকে কেবল দেখা নয়, মন তাদেব গ্রহণ কবতেও সমর্থ হয়।

যে অবধান করে, সে মনকে পটু কবাব প্রশিক্ষণও নেয়। তাব অভ্যাস এত তীব্র হয়, ফলে তাব পটুতা এত বিকশিত হয়, সে একই সঙ্গে অনেক বস্তুকে ধবতে পাবে। উপাধ্যায যশোবিজযজী শ্রেষ্ঠ অবধানকাবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী তার্কিক বিদ্বান ছিলেন। তিনি অবধান কবতে লাগলেন। একশ পিতলেব বাটি তাঁব সামনে বাখা হল। এক ব্যক্তি এক এক কবে সবগুলি বাটি বাজাতে লাগল। প্রত্যেক বাটিব ধ্বনিই অবধানকাবী অবধান কবলেন। তাঁব মন ধ্বনিব সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে অবহিত হল। একশ বাটিব ধ্বনিই এই ভাবে গৃহীত হল। তাবপব পবীক্ষাব সময এল। পবিষদ থেকে এক ব্যক্তি এল। সে একটি বাটি বাজাল, আব তাব সংখ্যা জিজ্ঞাসা কবল। অবধানকাবী বলে দিলেন ঐ ধ্বনি অমুক সংখ্যাব বাটিব ধ্বনি। এই ভাবে আবও অনেক প্রশ্নকর্তা এল, বাটিব সংখ্যা জিজ্ঞাসা কবল। অবধানকাবী প্রত্যেক পবীক্ষায উত্তীর্ণ হলেন।

এ ধ্বনি পটুতাব জ্ঞান। একই বকমেব বাটিগুলিব ধ্বনি প্রায এক বকমেবই হয। কিন্তু অবধানকাবী ধ্বনিগুলিব মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ধবতে পাবেন। তিনি আপন শ্রবণেন্দ্রিযেব পটুতা এতই বিকশিত কবেছেন যে ধ্বনিব অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যও তাঁব জ্ঞানগোচব হয।

আমাদের সঙ্ঘের কিছু অবধানকারী 'সপ্তসন্ধান' নামক অবধান করে থাকেন। এটা এক সঙ্গে অনেক বিষয় গ্রহণ করার ক্ষমতার পরিচায়ক। একজন এক কথা বলল, আর একজন সেইক্ষণেই আর এক কথা বলল। অবধানকারীর পেছনে তার দুই হাতে দুটি ভিন্ন বস্তু স্পর্শ করান হল। তিন জন সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখাল। এইভাবে সাত ব্যক্তি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করল। সমস্তটাই একই ক্ষণে করা হল। অবধানকারী ঐ সাতটি ক্রিয়াকেই একই ক্ষণে গ্রহণ করে নেয়। এমনি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন কাজ একই সঙ্গে ধরতে পারা, আর সেগুলি যথাযথ বলতে পারা বহুবিধগ্রাহীর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবধানের এরূপ কুশলতা থেকে, পটুতার এরূপ অভ্যাস থেকে, এক সঙ্গে অনেক বস্তুকে ধরতে পারার ক্ষমতা এসে যায়।

এই চারটি বিকল্প হল—অল্পের গ্রহণ, বহুর গ্রহণ, একবিধের গ্রহণ ও বহুবিধের গ্রহণ। এ মানসিক প্রশিক্ষণের ক্রম। এই ক্রম অনুসরণ করে মনকে প্রশিক্ষিত করা যায়। মনের কি প্রবল শক্তি আছে আপনি কল্পনা করুন। আপনারা একে যাদু বা আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে করবেন না। মনের এই প্রবল শক্তি সকলেই মধ্যেই আছে। আপনাদের মধ্যে আছে, আমার মধ্যে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মন সকল শক্তির আধার হয়ে আছে। এই মাত্র পার্থক্য যে, কিছু ব্যক্তি অভ্যাস দ্বারা মনের পটুতা বিধান করেছে, মনকে বিকশিত করেছে। আর কিছু ব্যক্তি সেরকম কোন প্রযত্ন করেনি, ফলে তাদের মন বিকশিত হয়নি। পার্থক্য কেবল প্রযত্নের, কেবল অভ্যাসের। আমরা যদি প্রযত্ন করি তবে আমরাও মনের পটুতা সাধন করতে পারি, আর তা হলে বহুবিধ গ্রহণ আমাদের পক্ষেও সহজ হয়ে যাবে।

আমাদের অনেক সাধু-সাধ্বী অবধানের প্রয়োগ করে থাকেন। সাধারণ লোকের কাছে এটা আশ্চর্যজনক ক্ষমতা বলে মনে হয়। তারা মনে করে এটা চমৎকারী দৈবী শক্তির নিদর্শন। কিন্তু এতে চমৎকারিতা

কিছু নেই। এটা কোন দৈবী শক্তি বা বিদ্যা নয়। বাইরের কোন শক্তিই নয়। এটা কেবল মনের প্রশিক্ষণ, মনের শক্তি। এই আধারেই সব প্রয়োগ ঘটে। একে চমৎকার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এটা মনেরই পটুতা, তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

তৃতীয় চরণ হল—ক্ষিপ্রগ্রাহী, চিরগ্রাহী। এরাও একটি যুগল। মনকে এমন অভ্যাস করান হয় যে তা বাহ্য পদার্থ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে সব কিছু গ্রহণ করে নিতে পারে। তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে পারে। কেউ একটি ঘর এক মুহূর্ত দেখল, তারপরে চোখ বুঁজে ঘরে যা কিছু আছে সব বলে দিল। ভিতের রঙ সাদা, সামনে কাল রঙের বোর্ড, এতগুলি লেখার তক্তা আছে, তাতে লাল, কাল, নীল অক্ষর আছে, এতগুলি দরজা-জানালা আছে। মোটের ওপর ঘরের পুরো বিবরণ দিয়ে দিল। একেই বলে, ক্ষিপ্র-গ্রহণ। এককালেই সব কিছু গ্রহণ করা, সব কিছু ধরে নেওয়া।

আমরা মনের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত নই। মনের প্রচুর ক্ষমতা আছে। আমরা খুবই কম জানি। অল্প কিছু জানতে পারলেই আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। যদি আমরা মনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা জানতে পারি, বিকশিত করে নিতে পারি, তবে কি না কি হতে পারে বোঝা কঠিন। আজ মনের কিছু ক্ষমতাকে বিকশিত করে মানুষ ভগবান বনে যায়, সারা দুনিয়া তাকে ভগবান বলে মেনেও নেয়। ঠিক আছে। ভগবান হয়ে যাওয়া কিছু খারাপ কথা নয়। নিজের অন্তরে নিজের যে ভগবান আছেন তাঁকে প্রকট করা খুবই ভাল কথা। তবে দুনিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ভগবান বলে স্বীকার করে। মনের সামান্য কিছু ক্ষমতার প্রকাশ সামনে ঘটল, অমনি ভগবান বলে মেনে নিল। মনের পূর্ণ ক্ষমতা যদি জানতে পারি, যদি সেই ক্ষমতাকে সাধনা করে অভিব্যক্ত করতে পারি, তবে না জানি কত বড় ভগবান হয়ে যাব।

অন্যপক্ষে বিকল্প হল—চিরগ্রাহী। চিরগ্রাহী কোন কিছু তৎক্ষণাৎ ধরতে পারে না, কিন্তু ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময়ে তা ধরে ও গ্রহণ করে।

চতুর্থ চরণ হল—অনিঃসৃতগ্রাহী, নিঃসৃতগ্রাহী। এও এক ক্রমযুগল।

এই অনিঃসৃতগ্রাহী এক বিচিত্র ক্ষমতা। এটা মনের এমন অভ্যাস, এমন অবধান, যে তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। এই বিষয় স্পষ্ট করবার জন্য আমি এক কাহিনী বলছি :

এক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাজসভায় গেলেন। সেখানে দৈবযোগে তিনি রাণীর পায়ের একটি আঙ্গুল দেখতে পেলেন। প্রাচীনকালে রাণীরা 'অসূর্যম্পশ্যা রাজদারা' হতেন, সূর্যও তাঁদের দেখতে পেত না। এখনকার দিনে অন্যরকম—এখন তো সব কিছুই অনাবৃত। যা হোক, চিত্রকর রাণীর পায়ের আঙ্গুল দেখে নিলেন। তারপর তিনি রাণীর এক পূর্ণ প্রতিকৃতি আঁকলেন। তিনি সেই চিত্র রাজার কাছে আনলেন। রাজা দেখলেন—মহারাণীর চিত্র। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপরে ভাল করে চিত্রটি দেখলেন। যেখানে রাণীর দেহে তিল আছে বা জট আছে, চিত্রেও ঠিক সেখানে তিল বা জট আছে। রাণীর দেহের প্রত্যেকটি চিহ্ন চিত্রিত রাণীর দেহেও আছে। চিত্রকর ভেবেছিলেন চিত্রটি দেখে রাজা প্রসন্ন হবেন এবং যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। রাজা মনে করলেন রাণীর সঙ্গে চিত্রকরের গুপ্ত সম্বন্ধ আছে, নতুবা এমন চিত্র সে কি করে আঁকল। রাজা সন্দিগ্ধ হলেন, তাঁর মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাল। তিনি চিত্রকর ও রাণী উভয়ের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

মন্ত্রীর হল দুর্ভাবনা। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর, যাঁকে পাওয়া দেশ বা রাষ্ট্রের সৌভাগ্য—তাঁর মৃত্যুদণ্ড। এ যে মহা অনর্থ। মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ। আপনি এ কি করছেন? এমন কুশলী চিত্রকরকে বধ করবেন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন?' রাজা উত্তর দিলেন—'তুমি ঠিক জান না। এ লোক দুষ্ট, দুশ্চরিত্র, অযোগ্য।' মন্ত্রী বললেন—'সত্যিই কিন্তু এমন নয়, মহারাজ।' রাজা বললেন—'কি নির্বোধের মত কথা বলছ? শরীরের কোথায় কোন চিহ্ন আছে তা

শবীব না দেখে কি কবে জানা যায ?' তখন মন্ত্রী বললেন—'মহাবাজ। এই চিত্রকবেব অদ্ভুত শক্তি আছে। সে দেহেব যে কোন অবযব দেখে সম্পূর্ণ চিত্র বানাতে পাবে, এই বকম চিত্রই বানাতে পাবে।'

বাজা পবীক্ষা কবে দেখলেন। চিত্রকব পবীক্ষায উত্তীর্ণ হলেন। বাজা তাব মৃত্যুদণ্ড বদ কবলেন।

এই হল অনিঃসৃতগ্রাহী। কোন বস্তুব অল্প কিছুকে আশ্রয কবে গোটা বস্তুটিই বিশ্লেষণ কবে দেওযা।

আব এক ঘটনাব কথা বলি।

বোমেব বাদশাহ ভাবতেব বাজাব কাছে কিছু সুবমা পাঠালেন এবং জানালেন যে ঐ সুবমা অতিশয মূল্যবান ও শক্তিশালী। ঐ সুবমা অন্ধত্ব দূব কবে—অন্ধেব চোখে লাগালে সে দৃষ্টিশক্তি ফিবে পায। আসলে বাদশাহ পবীক্ষা কবতে চেযেছিলেন ভাবতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে কিনা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি না থাকে তবে সে দেশ সহজেই জয কবে নেওযা যাবে।

দূত সুবমা নিযে ভাবতে এল। বাজাব কাছে এসে বাদশাহেব সব কথা বলল। বাজা ভাবলেন, সুবমাব পবিমাণ তো খুবই অল্প, এ কাকে দেওযা যাবে ? নগবে তো অনেক অন্ধ লোকই আছে। যেটুকু সুবমা আছে তাতে কেবল একজোডা চোখেব দৃষ্টি ফিবতে পাবে। বাজাব তখন নিজেব বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীব কথা মনে হল। এই মন্ত্রী অতিশয বুদ্ধিমান ও দূবদর্শী ছিলেন। তিনি অন্ধ হযে যাওযায বাজকার্য থেকে নিবৃত্ত হযে ঘবেই সময কাটাচ্ছিলেন। বাজা তাঁকেই ডেকে পাঠালেন। প্রধান মন্ত্রী এলেন। বাজা তাঁকে বললেন, 'এই সুবমা নিন, চোখে লাগান, আবাব দেখতে পাবেন। সুবমা কিন্তু এত অল্প যে তা একবাবই দু চোখে লাগানো যেতে পাবে। একথা মনে বাখবেন।'

প্রধান মন্ত্রী সুবমাব কৌটো নিলেন। তুলিতে সুবমা ভবে এক চোখে লাগালেন। অল্পক্ষণেব মধ্যেই সেই চোখেব জ্যোতি ফিবে এল। এক চোখে দেখতে পেলেন। তখন তিনি আব এক তুলি ভবে সুবমা নিলেন,

কিন্তু তা চোখে না লাগিযে জিহ্বাব ওপব বেখে দিলেন। বাজা বললেন, 'আবে, এ কি কবলেন? আপনি তো কানা হযে থাকবেন, কেবল এক চোখে দেখতে পাবেন। লোকে আপনাকে কানা বলবে। ছিলেন অন্ধ, এবাব হলেন কানা।'

প্রধান মন্ত্রী বললেন—'বাজন্। আমি কানা হব না। স্বযং চক্ষুষ্মান হযে হাজাব হাজাব লোকেব দৃষ্টি ফিবিযে দেব।'

প্রধান মন্ত্রী যে সুবমা জিহ্বাতে লাগিযেছিলেন তা বিশ্লেষণ কবে ফেললেন। বস্তুটি যে কি জানতে পাবলেন। আব দেখতে দেখতে সুবমাব পুবো 'ফর্মুলা' লিখে বাজাকে দিলেন। প্রধান মন্ত্রী বললেন, 'বাজন। এই সুবমাব সব উপাদানই আমি জানতে পেবেছি। এখন আমি এই সুবমা প্রস্তুত কবে হাজাব হাজাব চক্ষুহীনকে চক্ষুষ্মান কবব। যদি আমি সুবমাব দ্বিতীয তুলি আমাব আব এক চোখে লাগাতাম তবে আমাব দুই চোখই দেখতে পেত, কিন্তু তাতে কেবল আমাব একলাবই লাভ হত। এখন আমি আমাব এক চোখেব সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ চোখেব জ্যোতি ফিবিযে আনতে পাবব।'

মন্ত্রী ঘবে গিযে সুবমা প্রস্তুত কবলেন। বোম থেকে আগত দূতকে এক কৌটা সুবমা দিযে বললেন, 'ঘবে ফিবে যাও। তোমাব বাদশাহকে বল, এই বকম সুবমা তিনি যত চান আমাদেব দেশ থেকে চেযে নিতে পাবেন।'

দূত বোমে ফিবে বাদশাহকে সব কথা বলল। বাদশাহ বুঝলেন, যে দেশে এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস কবে সে দেশ আক্রমণ কবলে পবাজয অবশ্যম্ভাবী।

এই হল অনিঃসৃত গ্রহণ। এটি অদ্ভুত শক্তি। কোন বস্তুব অল্প কিছু অংশকে আশ্রয কবে সম্পূর্ণ বস্তুটি বিশ্লেষণ কবে দেওযা।

এসব কল্পিত কাহিনী নয, কেবল কল্পনা বিলাস নয। এ সব মনেব বিচিত্র ক্ষমতাগুলিব প্রকাশ।

আমি মনেব অবধানেব কিছু কিছু প্রযোগ, মনেব প্রশিক্ষণেব কোন

কোন প্রণালী, আলোচনা করলাম। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারব যে, মনের ক্ষমতা অভ্যাসের দ্বারা, সাধনা দ্বারা বিকশিত করা যায়, আর মনকে পটু করে গড়ে নেওয়া যায়। এ সবই অবধারণের বিবরণ, ধ্যানের বিবরণ নয়। অবধারণের দ্বারাই যখন মনকে এতটা পটু করা যায় তখন ধ্যানের দ্বারা মনের ক্ষমতা কতদূর বিকশিত হতে পারে তা নিজেরই বোধগম্য। আপনারা তা কল্পনা করে নিতে পারেন—আমার বুঝিয়ে দেওয়ার আবশ্যকতা নেই।

অতএব আমাদের সর্বাগ্রে অবধানের অভ্যাস করতে হবে। মনকে কোথায় নিয়োজিত করতে হবে, কেমন করে নিয়োজিত করতে হবে এই সব তথ্য আমাদের ঠিক বুঝে নিতে হবে, যাতে আমাদের চেতনায় ধ্যান করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আবির্ভূত হয়। অবধারণের পরে সংকেন্দ্রনে মনের ধারণার কথা বুঝতে হবে। যখন এই দুইটি ঠিক বুঝতে পারব, তখন তৃতীয় চরণ, আমাদের চেতনায় ধ্যান করার ক্ষমতা জাগ্রত হবে।

৫

না করার মূল্য

একটি লোক একটি বাগানে ঢুকে দেখল অনেক লম্বা লম্বা গাছ আছে। সে বাগানের মালিকে বলল, 'গাছগুলি বড়ই লম্বা হয়েছে।' মালি বলল, 'বাবুজী, 'গাছের লম্বা হওয়া ছাড়া আর কোন্ কাজ আছে।'

সবার আগে কাজের কথাই আমাদের চিন্তায় আসে। গাছ পর্যন্ত নিষ্কর্মা নয়। কোন পদার্থই কাজ ছাড়া থাকে না। বস্তুর লক্ষণই হল অর্থক্রিয়াকারিত্ব। সেই বস্তুই সত্য, যা নিজের কাজ করতে থাকে, কিছু না কিছু করতে থাকে। যা কিছু করে না তা সৎ নয়, অর্থাৎ তার কোনও অস্তিত্ব নেই, তা পদার্থ নয়। পদার্থের অর্থই হল ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীলতা পদার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা একথা জানি এবং মানি যে, প্রত্যেক লোকেরই কিছু না কিছু করা উচিত। পদার্থেরও কিছু না কিছু করতে হয়। চেতন বা অচেতন উভয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু কাজ হতে থাকে। যে লোক কিছু করে তাকে উদ্যোগী, কর্মঠ, কর্মী পুরুষ বলে মানতে হবে একথা আমরা গ্রাহ্য করেছি। যে লোক কিছু করে না তাকে অলস, বেকার, প্রমাদগ্রস্থ এবং অকর্মণ্য বলে আমরা মনে করি। মানুষের কোনও না কোনও কাজে নিরত থাকা উচিত, এই কথার ওপরে আমরা বিশেষ

জোব দিই। যে কিছু কবে সে 'আমি কিছু কবছি' ভেবে আনন্দ পায, আবাব কখনও কখনও গর্বও অনুভব কবে। যে কিছু কবে না সে 'আমি কিছু কবি না' এই ভেবে হীনমন্যতা অনুভব কবে। অন্য লোকেও তাকে উপহাস কবে বলে—ও নিষ্কর্মা, কিছুই করে না।

নিষ্কর্মা লোকেব এই দুনিযাব কোনও স্থান নেই। সর্বদাই কোনও না কোনও কাজে ব্যাপৃত থাকা উচিত। বর্তমান কালেব অর্থশাস্ত্রও বলছে, নিষ্কর্মা হযে থেকো না। ব্যবসা বা অন্য যে কাজ পাও তাই কব, আব যদি কোন কাজ না মেলে তবে গর্ত খোঁড, বোঁজাও, আবাব গর্ত খোঁড, আবাব গর্ত ভব, তবুও কর্মহীন হযে থেকো না। কোনও একটা কাজ কবতে থাক। এই ভাবে কাজ কবাব ওপবে আমবা এতটা জোব দিই যে নৈষ্কর্মেব মূল্য আমাদেব দৃষ্টি থেকে একেবাবে লোপ পেযে গিযেছে। নিষ্ক্রিযতাবও তাৎপর্য আছে, একথা আজকাল আমবা আব স্বীকাব কবি না। বর্তমান যুগ এত প্রবৃত্তিবহুল যে নিবৃত্তিব কথা আমাদেব বোধগম্য হয না। নিবৃত্তিব এত নিন্দা কবা হযেছে যে তাব যে কোনও মূল্য আছে একথা আমবা স্বীকাব কবতে চাই না। তাকে আমবা মূল্যহীন বানিযে দিযেছি।

প্রবৃত্তিব ঘর্ষণ থেকে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। প্রবৃত্তি সংঘাত সৃষ্টি কবে, সংঘাত উৎপাদন কবে। প্রবৃত্তিকে একাধিকাব দেওযাই বর্তমান কালেব সব সংঘর্ষেব সবচেযে বড কাবণ। বর্তমান কালেব অশান্তিব মূল কাবণ শুধু ক্রিযাকে মূল্য দেওযা, অক্রিযাব মূল্য অনুভব না কবা। নৈষ্কর্মেব যে একটা বাস্তব মূল্য আছে এ কথা অস্বীকাব কবা। এটাই আজকাল সবচেযে বড সমস্যা হযেছে।

আমি আজ কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলব। এই প্রবৃত্তিবহুল যুগে আমাবও হযত প্রবৃত্তিব সমর্থন কবা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা কবব না। প্রবৃত্তিব বিরুদ্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। শ্রোতাদেব হযত সে সব কথা ভাল লাগবে না। কিন্তু সত্য গোপন কবাও উচিত নয। সত্য চিরন্তন, অমোঘ। কাবণ সত্যকে অস্বীকাব কবলে তা থেকে নানা

প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তা মানুষকে আক্রমণ করে। যদি প্রবৃত্তির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে নিবৃত্তির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা যায় তা হলে হয়ত নানা সমস্যার আপনা থেকে সমাধান হয়ে যাবে।

নিবৃত্তির মূল্য প্রবৃত্তির চেয়ে কম নয়। অক্রিয়া ক্রিয়ার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। যদি এই কথার অর্থ বোধগম্য হয় তাহলে কর্মও খুব অর্থপূর্ণ হতে পারে। কর্মের সাথে সাথে ত্রুটি দোষ আসে। সেগুলি কমে যেতে পারে। গীতাতে সুন্দর একটি কথা বলা হয়েছে—'প্রত্যেক প্রবৃত্তির সাথে দোষ জড়িত আছে। এমন কোনও প্রবৃত্তি নেই যার সঙ্গে কোনও দোষ সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন ইন্ধন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সাথে ধূমের উপস্থিতি অনিবার্য তেমনি প্রবৃত্তির সাথে দোষের সহাবস্থান অনিবার্য। 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।' অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত সেই রকম সমস্ত আরম্ভ দোষের দ্বারা আবৃত। এই অনুভব বাস্তবিক, তা সত্য পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রবৃত্তির যখন নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতি হয় তখন প্রবৃত্তির সহগামী দোষসমূহের সমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রবৃত্তি যেন নিবৃত্তির সাথে সাথে চলে। অন্যথায় প্রবৃত্তির দোষ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মানুষের সর্বনাশের কারণ হয়। এই জন্য আমরা যেন নিবৃত্তির মূল্য বুঝি, অক্রিয়ার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করি এবং নৈষ্কর্মের মহত্ত্বপূর্ণ পরিণাম অনুভব করি।

প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় সাধন যন্ত্র হল এই শরীর। শুরুতে আমি শরীরের প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আজ আমি কিছু বিপরীত আলোচনা করব। আমি প্রবৃত্তির থেকে মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

আপনি কায়োৎসর্গ করুন। কায়াকে বিসর্জন করুন। শরীরকে ত্যাগ করুন। জীবিতাবস্থায় নিজেকে মৃতবৎ অনুভব করুন। শরীরকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট এবং প্রবৃত্তিশূন্য করুন। একেই বলে কায়গুপ্তি বা কায়োৎসর্গ। শরীরকে উৎসর্গ করা, কায়াকে ত্যাগ করা, এ বড়ই কঠিন কাজ। মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মানুষই শরীর ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু

জীবিত অবস্থায় শরীরকে ত্যাগ করা বড়ই কঠিন সাধনা। কায়াকে ত্যাগের কথায় মহামুনি গৌতমের মনেও একটি প্রশ্ন জাগল। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কায়াগুত্তয়াত্র ণং ভন্তে। জীবে কিং জণয়ই ? ভগবন্। কায়গুপ্তি কা পরিণাম ক্যা হৈ।'

কায়গুপ্তিতে জীবের কি লাভ হয় ? কায়গুপ্তির পরিণাম কি ? তার উত্তরে ভগবান বললেন 'কায়াগুত্তয়াত্র ণং সংবরং জণয়ই।' কায়গুপ্তি দ্বারা সংবরণ হয়। দুটি কথা আছে— আস্রব এবং সংবর। যার দ্বারা দোষ আমাদের ভেতর প্রবেশ করে তাকে আস্রব বলা হয়। আমাদের ভেতরে কোন দোষ নেই। আমাদের আত্মাতেও কোনও দোষ নেই। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার ভেতরে কোনও মলিনতা বা আবিলতা নেই। দরজা এবং জানালা দিয়ে ময়লা ও ধুলো ভেতরে আসতে থাকে। যেখানে এতটুকু ফাঁক আছে সেখান দিয়ে ধুলো ভেতরে ঢুকতে থাকে। ঝড় আসে। তাকে রোধ করা সম্ভব হয় না। কেউ কখনও ঝড়ের গতিরোধ করতে পারে না। এমন কোনও উপায় নেই যার দ্বারা ঝড়-তুফানের দুর্বার প্রবাহকে অচল করে দেওয়া যায়। কোনই উপায় নেই। কেউ কোনও দিন ঝড়-তুফানের গতিরোধ করতে পারে নি। কিন্তু এমন ব্যবস্থা বা উপায় আছে যার দ্বারা ধুলোর ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা বন্ধ করা যায়। যদি আমরা দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিই তবে ধুলো ঘরের ভেতরে আসতে পারবে না, বাইরেই থেকে যাবে। আমাদের চেতনায় কোনও আবিলতা নেই। চেতনা শুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ। কিন্তু যেমন প্রত্যেক ঘরেরই দরজা জানালা আছে সেই রকম চেতনারও প্রবেশপথ আছে, দরজা জানালা আছে। তাকে আমরা আস্রব বলব। আস্রব কথাটির অর্থ ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে বাইরে থেকে তত্ত্ব আসে, আর তাতে আমাদের চেতনা ভরপুর হয়ে যায়। এই সব তত্ত্ব বিজাতীয়, আগন্তুক। যা বিজাতীয় তা প্রায়শই সঙ্কট সৃষ্টি করে, নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করে। যা স্বাভাবিক, আপনা আপনি ঘটে, তা থেকে বিঘ্নের উদ্ভব হয় না। বিজাতীয় বস্তুতে সর্বদাই বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে।

তাকে অস্বীকাব কবা সম্ভব নয। আমাদেব এমন ব্যবস্থা কবতে হবে যাতে আস্রব না থাকে। চেতনাব দবজা জানালা যেন খোলা না থাকে, কোনও ছিদ্র যেন খোলা না থাকে। সব প্রবেশপথ যেন বন্ধ হযে যায, সুবক্ষিত হয। সংস্কৃত ভাষায 'গুপ্' ধাতুব অর্থ 'বক্ষণ'। 'গুপ্ত' কথাটিব অর্থ হবে 'সুবক্ষিত'। কাযগুপ্তিব অর্থ, শবীবকে সুবক্ষিত কবা। আমবা শবীবকে এমনভাবে সুবক্ষিত কবব যাতে ভেতবে কোনও আগন্তুক বস্তু কোনও অবকাশ বা শূন্যস্থান না পায। বাইবেব কোনও কিছু ভেতবে আসতে না পাবে। কেবল আমবা থাকব, আমাদেব চেতনা থাকবে, এ ছাড়া ভেতবে আব কিছু থাকবে না। এই প্রক্রিযাব নাম 'সংবব'। ভগবান মহাবীব বলেছেন, 'যে কাযগুপ্তি কবতে পাবে সে সংবব উৎপন্ন কবে, আস্রবেব পথ রুদ্ধ কবে। যে সংবব উৎপাদন কবে সে নিজেই সংবব হযে যায।'

তিনি এক বিবাট মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, বাইবে থেকে যা কিছু নেওযা হয তা নেওয়াব একমাত্র উপায আমাদেব শবীব। মানসিক, বাচনিক বা শ্বাসসংক্রান্ত যে কোন পবমাণু আমাদেব ভেতবে প্রবিষ্ট হোক না কেন তাদেব সবাব জন্য একটিমাত্র আস্রব বা প্রবেশ পথ আছে—সেটি আমাদেব শবীব। শবীবে যদি চঞ্চলতা না থাকে, প্রবৃত্তি না থাকে, সক্রিযতা না থাকে, তবে শবীবেব ভেতবে কোনও কিছুই প্রবেশ কবতে পাবে না। যে সমস্ত পবমাণু শবীবেব ভেতবে প্রবিষ্ট হয সেগুলি শুধু শবীবেব চঞ্চলতার ফলেই প্রবিষ্ট হতে পাবে। শবীবেব চঞ্চলতা নিঃশেষিত কবা, তাব সমাপ্তি ঘটানোব নামই কাযগুপ্তি। শবীবে এমন স্থৈর্য আনতে হবে যাতে দেহ নিজেই ধ্যানে পবিণত হয। আপনাবা ভাববেন না যে কেবল মনেই ধ্যান হয। অনেক যোগাচার্য, অনেক বিদ্বান লোক কেবল মানসিক ক্রিযাকে ধ্যান মনে কবেন। কিন্তু জৈন আচার্যদেব মত অন্য বকম। তাঁবা তিন প্রকাব ধ্যানেব কথা বলেছেন— কাযিক ধ্যান, বাচনিক ধ্যান ও মানসিক ধ্যান। যেমন স্থিব মন ধ্যানে পবিণত হয তেমন স্থিব দেহও ধ্যান

হতে পাবে। শবীবেব স্থিবীকবর্ণও ধ্যান।

ধ্যানেব আক্ষবিক অর্থ—চিন্তা কবা। 'ধ্যে' ধাতুব মৌলিক অর্থ চিন্তা কবা। এই ধাতু থেকে 'ধ্যান' শব্দটি নিষ্পন্ন হযেছে। এটি শাব্দিক সংজ্ঞা মাত্র। শব্দেব অর্থেব বিস্তাব হয। সঙ্কোচন হয। শব্দেব অর্থেব যখন বিস্তাব হয তখন শব্দ মূল অর্থেব সঙ্গে বাঁধা থাকে না। 'ধ্যান' এই শব্দও তাব মূল 'চিন্তা কবা' এই অর্থেব সঙ্গে আবদ্ধ থাকে না। তাব অর্থ প্রসাব লাভ কবেছে। এব অর্থ হযেছে স্থিবী-কবণ বা স্থিব কবা। ধ্যানেব অর্থ—শবীবকে স্থিব কবা, বচনকে স্থিব কবা, মনকে স্থিব কবা। মন স্থিব হলে মানসিক ধ্যান হয। বচন স্থিব হলে বাচনিক ধ্যান হয। শবীব স্থিব হলে কাযিক ধ্যান হয। কাযিক ধ্যান সব ধ্যানেব মূল। যতক্ষণ কাযিক ধ্যান না হয ততক্ষণ বাচনিক বা মানসিক ধ্যান সম্ভব হয না। শবীবেব স্থিবতা ছাডা শ্বাসেব স্থিবতা হয না, শ্বাসেব স্থিবতা না হলে মনেব স্থিবতা আনা সম্ভব নয। মনকে স্থিব কবতে হলে শ্বাসেব স্থিবতা আনতে হবে, আব শ্বাসকে স্থিব কবতে হলে কাযাব স্থিবতা আনতে হবে। সেই জন্য বলা যেতে পাবে ধ্যানেব আধাবভূত তত্ত্বসমূহেব মধ্যে সবচেযে বড তত্ত্ব কাযাব স্থিবতা, অর্থাৎ কাযোৎসর্গ বা কাযগুপ্তি।

মানসিক ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছনো অত্যন্ত কঠিন কাজ, কাযিক ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছনো অপেক্ষাকৃত সহজ। সাধকেব পক্ষে সাধনাব প্রাবম্ভিক পথ কাযিক স্থিবতা বা শিথিলীকবণ অভ্যাস কবা। যে লোক কাযিক স্থিবতা অভ্যাস কবেছে সে মানসিক স্থিবতা পর্যন্ত পৌঁছবাব ক্ষমতা প্রাপ্ত হযেছে। যে শবীবেব স্থিবতা সাধন কবতে পাবে না সে মানসিক ধ্যান পর্যন্ত যেতেই পাবে না। সবাব আগে শবীবেব স্থিতি আনা প্রযোজন। তা কবতে পাবলে মস্তিষ্ক অস্থিবতা থেকে মুক্ত থাকবে, তাব কোনও বকম উত্তেজনা থাকবে না। জ্ঞানবাহী স্নাযু সম্পূর্ণ স্থিব হযে যাবে, তাতে আব উত্তেজনা থাকবে না। মাংসপেশীসমূহ শিথিল হযে যাবে, ঢিলে হযে যাবে। দৃঢ মাংসপেশী অববোধ সৃষ্টি কবে, সেইজন্য তাদেব

শিথিল কবা অত্যন্ত আবশ্যক। মেরুদণ্ডেব হাড শিথিল হওযা প্রযোজন যাতে তাব ভেতবে কোনও উত্তেজনা না আসে। শবীবেব প্রত্যেক অবযব যেন উত্তেজনা থেকে মুক্ত থাকে, কোনও বকম বক্রতা বা ক্ষোভ না থাকে। এই হল প্রাবম্ভিক সাধনা। সবাব আগে আমাদেব এমন নিপুণতা লাভ কবতে হবে যে আমবা ইচ্ছা কবলেই আমাদেব শবীবকে শিথিল কবতে পাবি। সাধাবণ সাধকেব পক্ষে এই প্রক্রিযা অত্যন্ত উপযোগী। আমি স্বীকাব কবছি যে কিছু লোকেব মানসিক ধ্যানেব ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছবাব ক্ষমতা আসতে পাবে। সবাই ঐ ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছতে পাবে না। যদি কেউ এই ভূমিকা পর্যন্ত যেতে পাবে তবে সেটা তাব পক্ষে অত্যন্ত আনন্দেব বিষয। কিন্তু কাজটা বডই কঠিন। শাবীবিক স্থিবতা, কাযিক ধ্যান, কাযোৎসর্গ বা কাযগুপ্তি সকলেব *পক্ষেই* সম্ভব হতে পাবে। যদি এই ভূমি প্রাপ্ত হওযা যায তবে জীবন সফল হবে।

কেউ কেউ মনে কবেন, অবধানেব ভূমিকা যদি বা পাওযা যায, ধ্যানেব ভূমিকা অনেক দূবে। আমি বলতে চাই যে অভ্যাস কবতে কবতে আমবা যদি অবধানেব ভূমি পর্যন্ত পৌঁছতে পাবি তবে তা কি ধ্যানেব ভূমিব দিকেই এগোনো নয? এ কি কম কথা? মনেব যে অবধান চাবদিকে এলোমেলোভাবে ঘুবে বেডায তাকে যদি এক বিষযেব ওপবে কেন্দ্রিত কবতে আমবা সফলকাম হই তবে সেটা খুব সামান্য উপলব্ধি বলে মনে কববেন না। ভাবনা পর্যন্ত পৌঁছতে পাবা আবও বড কথা। আমি বলতে চাই আপনাবা হযতো অবধানেব ভূমিকাতেও পৌঁছবেন না, ভাবনা পর্যন্তও পৌঁছবেন না। কিন্তু আপনাবা যদি কাযোৎসর্গেব ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছতে পাবেন, যদি কাযিক স্থিবতা এবং শিথিলীকবণেব স্থিতি পর্যন্ত আসতে পাবেন তবে আপনি ধ্যান সাধনাব দিকে অগ্রসব হচ্ছেন, সেই দিকেই এগিযে যাচ্ছেন।

আজকালকাব সবচেযে বড সমস্যা—শাবীবিক উত্তেজনা। বর্তমান যুগ অতিবিক্ত সক্রিযতা এবং দৌডঝাঁপেব যুগ। শক্তিক্ষযেব তথা

জীবনীশক্তিব অপব্যয়েব সবচেয়ে বড কাবণ অতিবিক্ত সক্রিয়তা। অতিবিক্ত সক্রিয়তাব ফলে শ্বাসেব অত্যধিক তীব্রতা এসে যায় এবং তাব ফলে অনেক শক্তিব অপচয় হয়। শবীব স্থিব কবা এবং দীর্ঘ শ্বাস নেওয়া এই দুটি কৌশল যদি আজকালকাব লোকে শিখে নেয় তাহলে তাবা অনেক কঠিন সঙ্কট থেকে বাঁচতে পাবে। বর্তমান প্রবৃত্তিবহুল যুগেব পক্ষে কায়োৎসর্গ বা কায়গুপ্তি মহৌষধেব কাজ কবতে পাবে। এব দ্বাবা লোকে বহু কঠিন সঙ্কট থেকে আত্মবক্ষা কবতে পাবে। প্রবৃত্তিবহুলতা এবং অতিব্যস্ততাব ফলে মানুষ অনেক বকম মানসিক বিকৃতি ও শাবীবিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ঐ সব বোগ থেকে বাঁচাব একমাত্র উপায় শবীবকে স্থিব কবা, শিথিল কবা। এ মস্ত বড উপলব্ধি। শান্ত শ্বাস এবং শান্ত শবীব, সাধনাব দুটি মহত্বপূর্ণ উপায়। এই কথাকে খুবই মহৎ তত্ত্ব বলে স্বীকাব কবতেই হবে। শাবীবিক মূল্যেব দিক থেকে আমি এই তত্ত্বেব আলোচনা কবলাম। এব আধ্যাত্মিক মূল্যও কম নয়।

সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপন কবা হয়েছে—কে কর্মেব ক্ষয কবতে পাবে ? আমাদেব সঞ্চিত সংস্কাব কি কবে নিঃশেষে ক্ষয পেতে পাবে ? এই প্রশ্নেব উত্তবে বলা হয়েছে—

ন কম্মুণা কম্ম খবেংতিবালা
অকম্মুণা কম্ম খবেংতি ধীবা।

অর্থাৎ কর্মেব দ্বাবা কর্মক্ষয হয না। জ্ঞানীগণ অকর্মেব দ্বাবা কর্ম ক্ষয কবেন।

অজ্ঞানী লোক মনে কবে তাবা প্রবৃত্তিব দ্বাবা প্রবৃত্তিব ক্ষয কববে, সংস্কাব দ্বাবা সংস্কাব নষ্ট কববে। তাবা ভ্রান্ত, অজ্ঞান, তমসাচ্ছন্ন। তাবা সত্যকে জানে, কিন্তু বাস্তবিকতাকে জানে না। প্রবৃত্তি দ্বাবা প্রবৃত্তিকে নিঃশেষ কবা যায না, সংস্কাব দ্বাবা সংস্কাবেব সমাপ্তি ঘটানো যায না। মাঝে মাঝেই প্রবৃত্তিব পুনবাবৃত্তি হয। প্রবৃত্তি অনেক সময়েই গোপন থেকে যায। প্রত্যেক প্রবৃত্তি সংস্কাব চালনা কবে। ঐ

সংস্কাব অন্য প্রবৃত্তিব আশ্রয নেওযাব প্রবোচনা দেয। আমবা অপব প্রবৃত্তিকে আশ্রয কবলে সেই প্রবৃত্তি তাব সংস্কাব চালনা কবে। সেই সংস্কাব তৃতীয প্রবৃত্তিব প্রেবণা দেয। এই বকম চক্রাকাবে প্রবৃত্তি ও সংস্কাব চলতে থাকে। তাব কোনও শেষ নেই। প্রবৃত্তি দ্বাবা প্রবৃত্তিব চক্রব্যূহ ভেদ কবা যায না। এই প্রবৃত্তিব পালা অন্তহীন ভাবে প্রলম্বিত শৃঙ্খল। কেউ তাকে অতিক্রম কবতে পাবে না, তাব শেষেব নাগাল পায না। তাহলে এই প্রশ্ন দাঁডায যে, এই প্রবৃত্তিব পালাকে কি ভাবে ভেঙ্গে দেওযা যায। এই সব সংস্কাবেব কি কবে সমাপ্তি ঘটানো যায? যে সব সংস্কাব আমাদেব প্রবৃত্তিব সঙ্গে সংলগ্ন কবে বেখেছি, একেব পব এক যে সব সংস্কাব নির্মিত হচ্ছে, আব যা বহু বিভিন্ন প্রবৃত্তিব প্রেবণাদাতা, তাদেব কি কবে নির্মূল কবা সম্ভব হতে পাবে? তাব উত্তবে বলা হযেছে, 'অকর্ম্মণা কর্ম্ম খবেন্তি ধীবা।' যে জ্ঞানী, যাব সত্যেব বোধ হযেছে, অন্ধকাব ভেদ কবে যে আলোতে পৌঁছেছে, যাব বাস্তবিকতাব বোধ এসেছে, সে জানে অকর্মেব দ্বাবা কর্মকে ক্ষীণ কবা যায। অকর্ম অর্থাৎ নিবৃত্তি দ্বাবা প্রবৃত্তিব সমাপ্তি ঘটানো যায।

প্রবৃত্তিব অবসান হলে পুবানো সংস্কাব জেগে থাকলেও তাব বৃদ্ধি বা পুনবাবৃত্তি হয না, ফলে সংস্কাব শিথিল হযে যায। আবাব জাগলে যদি তাব পুনবাচবণ না হয তবে তা আবও শিথিল হযে যায। সংস্কাব মাথা উঁচু কবলে যদি তাব পুনবাবৃত্তি না ঘটে তবে তাব বিলোপ হয, বিনাশ হয।

অতিথি এসেছে। তাব সংস্কাব কবা হযেছে। সে যদি আবাব আসে এবং সে যদি আবাব আতিথ্য পায তো সে আবাব আসবে। সে মনে কববে—এ তো বেশ ভাল ব্যাপাব, আতিথ্যও মিলছে, পবিচর্যাও মিলছে। সে আসতেই থাকবে।

অতিথি এল। সে সৎকাব পেল না। সে উপবাসে বইল। যদি সে নির্লজ্জ বেহাযা হয তবে দ্বিতীযবাব আসবে। আবাব উপেক্ষা পেলে আব তৃতীযবাব আসবে না। সে ভাবে—যেখানে শুধু তিবস্কাব পাওযা

যায় সেখানে কেন যাব? সে আর যায় না।

এই হল প্রবৃত্তির রীতি। সংস্কার জেগে উঠলে তার যদি থাকার জায়গা মেলে তবে তা জমতে আরম্ভ করবে। সে আর তখন অতিথি থাকতে চায় না, পরিবারের সদস্য হতে চায়। তখন তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। যে সংস্কার এসেছে তার যদি থাকার জায়গা না মেলে, যদি সে শুধু উপেক্ষা পায়, তবে তার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তিরস্কৃত হলে সংস্কার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যায়। একবার তিরস্কার কটু বলে অনুভূত হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও যদি একই অনুভূতি হয় তবে সেই সংস্কার আর আসতে পারে না, তা ক্ষীণ হয়ে যাবে, বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এ রকম হতে হতে অবশেষে সংস্কার শেষ হয়ে যাবে। সে আর পরিবারের সভ্য হতে পারে না, আবার অতিথির ভূমিকা নিয়েও ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।

এই জন্যই বলা হয়েছে—'অকম্মণা কম্ম খবেন্তি ধীরা।' যে লোক গম্ভীর, যার ধৃতি ও ধৈর্য আছে, যে ঘটনাকাণ্ডে ভীত হয় না, বিচলিত হয় না, যা ঘটে তা জানে, দেখে, কিন্তু বিচলিত হয় না, সে অকর্ম দ্বারা, অপ্রবৃত্তি দ্বারা কর্মকে ক্ষীণ করে। সে সংস্কারকে নিঃশেষ করে, বিলীন করে।

অকর্ম দ্বারা কর্মকে ক্ষীণ করার, নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তিকে ক্ষীণ করার, তথা নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির দোষসমূহ ক্ষীণ করার তত্ত্ব আজকাল আমাদের কাছে গৌণ এবং অনেক দূরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল একটা রব উঠেছে, 'কর', 'কর', আরও 'কর'। তার পরিণাম হিসেবে আজকালকার লোক শারীরিক ক্লান্তি, স্নায়বিক শ্রান্তি এবং মানসিক অবসাদে পীড়িত হচ্ছে। এই সমস্ত অবসাদ বা ক্লান্তি থেকে বিরক্তি, চিত্তবিক্ষেপ, অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি, আকুলতা, ব্যাকুলতা, লোভ প্রভৃতি নানা প্রকার দোষ সমুদ্ভূত হয়। তার পরিণাম কোথাও লড়াই, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও সংঘর্ষ, কোথাও বিরোধ, কোথাও বা বিবাদ। সবাইকে এ সব অপ্রিয় পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে। এত দুঃখ, এত

ক্লেশ সত্ত্বেও কেন আমবা এই বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা কবি না ?

উদ্যোগপতিবা এবং বাজনীতিব নেতাবা বাব বার প্রগতিব কথা বলতে ক্লান্তি বোধ কবেন না। তাঁবা সদা সর্বদা প্রগতির কথা বলে চলেছেন। প্রগতিব জন্যই প্রবৃত্তি অনিবার্য। ভৌতিক প্রগতি বা পদার্থতান্ত্রিক প্রগতিব জন্য প্রযোজন বিবামবিহীন কঠোব পবিশ্রম, আব নিববচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি। প্রগতিব জন্যই প্রবৃত্তি অনিবার্য হয়েছে। এ কথা সত্য, কিন্তু এব পবিণামেব কথা যেন আমবা ভাবি। পবিণাম বিবেচনা কবলে আমবা জানতে পাবব যে নিবঙ্কুশ ঔদ্যোগিক এবং ভৌতিক প্রগতি মানুষকে অন্য আব এক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ শুধু এলোমেলো ভাবে ঘুবে মবে। পবিণাম সুখকব হয না। মানুষ নিজেই প্রবৃত্তিব গ্রাস হযে পড়েছে, প্রবৃত্তিব শিকাবে পবিণত হয়েছে। আধুনিক বাজনীতিব নেতাবা এবং উদ্যোগপতিবা যদি আপন আপন স্বার্থকে গৌণ কবতে পাবে এবং এই তথ্য বুঝতে পাবে যে প্রবৃত্তিকে সীমাবদ্ধ কবা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তিব যে মূল্যাযন কবা উচিত, আমি স্বীকাব কবি যে তাহলে মানুষেব চেতনা ঠিক দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং সত্যেব দিকে বিকশিত হবে।

আজকালকাব সংঘর্ষ চেতনা ও পদার্থেব সংঘর্ষ। বর্তমান কালে পদার্থই প্রধান হযে পড়েছে। পদার্থেব আববণে চেতনা আচ্ছন্ন হযে যাচ্ছে। কিন্তু তা না হযে চেতনায বিকশিত হওযা এবং পদার্থেব চেতনাব অনুগামী হওযা উচিত। যদি তা নাও হয তবে অন্তত তাদেব একটা ভাবসাম্য নিযে আসা অত্যন্ত প্রযোজন। কিন্তু আজকাল সব বিপরীত ঘটনা ঘটছে। সমস্ত বিশ্ব আজ তাব দুঃখময পবিণাম ভোগ কবছে।

এই জন্য আমাদেব কাযগুপ্তিব মূল্য বোঝা প্রযোজন। তাব মূল্য অতি মহৎ। সাধনাবও মূল্য অনেক মহৎ।

লোকে শিবিবে আসে দশ, বিশ কিংবা খুব বেশি হলে ত্রিশ দিনেব জন্য। তাবা মনে কবে তাবা নিষ্কর্মা হযে বসে আছে। কোনও কাজ

করতে হচ্ছে না। বিনা কাজে সময় কেটে যাচ্ছে। শিবির আলস্য শিক্ষা দিচ্ছে, এই রকম অনুভব হয়। যে বহু কাজ করতে অভ্যস্ত এবং প্রবৃত্তিতে অতিশয় বিশ্বাসী, তার মনে হবে শিবিরে নিতান্ত কর্মহীন ভাবে দিন কাটাচ্ছে। এতে অলস লোকের সমাজ তৈরি হবে। আমি বুঝি, ঐ চিন্তা যথার্থ নয়। ঐ রকম চিন্তা করা উচিত নয়। আমরা তো প্রবৃত্তিময় জীবন যাপন করছি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নিবৃত্তি কি তা বোঝা, নিবৃত্তির মূল্য নিরূপণ করা এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা ভারসাম্য স্থাপন করা। এই অভিমুখে যদি আমাদের গতি হয় তবে শিবিরের মস্ত বড় সার্থকতা হবে। যদি শিবিরে অকর্মের বাস্তবিক অভ্যাস হয়ে থাকে এবং তার যথার্থতার মূল্য আমরা বুঝতে পেরে থাকি তবে আমি মনে করব শিবিরের বিরাট সার্থকতা লাভ হয়েছে, ব্যর্থতার অনুভূতি আসবে না। অকর্মের ক্ষণেই আমাদের জীবনের বিকাশ হয়। যে লোক সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে তার পক্ষে এই জ্ঞান যথেষ্ট উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যদিও শারীরিক দৃষ্টিতে প্রবৃত্তির এই ব্যবস্থা যে, লোকে দিনের বেলায় জেগে থাকবে এবং রাতে ঘুমোবে, যতটা কাজ করবে ততটা বিশ্রাম করবে, লোকে এই নিয়মও লঙ্ঘন করছে। যে সময়টা নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট সেটাও তারা কেড়ে নিচ্ছে। আগেকার দিনে যারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করত তাদের নিশাচর বলত। নিশাচরের অর্থ রাক্ষস। তারা রাত্রিকালে পরিভ্রমণ করে। আজকালকার মানুষ সেই নিশাচরে পরিণত হয়েছে। তারা রাতে খাওয়াদাওয়া করে, রাতে কাজ করে, রাতে যাতায়াত করে। জীবনযাত্রার ধারা একেবারে উলটে গিয়েছে। কিন্তু শারীরিক এবং স্নায়বিক ব্যবস্থার তথা আপেক্ষিক বিশ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নিবৃত্তিজাত প্রবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা এ কথা অস্বীকার করতে পারব না যে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির, কর্মের সঙ্গে অকর্মের সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। কর্মের পরিমাণ এত হওয়া উচিত নয় যে তাতে অকর্ম লোপ পেয়ে যাবে। কর্মের বোঝ এত গুরুভার না হয় যে তাতে মানবচেতনা একেবারে

আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আচারাঙ্গ সূত্রে বলা হয়েছে—'অকর্মে জানই।' যে অকর্মা সেই জানবে, দেখবে। আপনারা হয়ত পড়েছেন যে বৈজ্ঞানিকদের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধিগুলি তাঁদের নিশ্চিন্ত এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থানের সময়ে হয়। খুব কম লোকের কাজ করতে করতে মহত্ত্বপূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। যে লোকের ইনটুইশন অর্থাৎ আন্তরিক বোধ তথা আন্তরিক শক্তি বিকশিত হয়েছে, কোনও মহৎ তত্ত্বের অনুভূতি হয়েছে, তার সেই উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে চিন্তাশূন্য এবং নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান-কালে। নিষ্ক্রিয়তা নিজেই একটি মহৎ উপলব্ধি। নিষ্ক্রিয়তার অর্থ, বাইরে কর্মহীনতা আর ভেতরে সক্রিয়তা। নিষ্ক্রিয়তার অর্থ আলস্য নয়। কোন লোক বাইরে সক্রিয় এবং ভেতরে নিষ্ক্রিয় হতে পারে। আবার, অন্য কোনও লোক বাইরে নিষ্ক্রিয় এবং ভেতরে সক্রিয় হতে পারে। যারা চেতনার জগতে সক্রিয় কিন্তু বাইরের জগতে নিষ্ক্রিয়, তাদের আমরা অলস মনে করে থাকি। এটা আমাদের মস্ত বড় ভুল। যে লোক বাইরেও নিষ্ক্রিয় ভেতরেও নিষ্ক্রিয়, সেই লোকই প্রকৃতপক্ষে আলস্যপরায়ণ। সে লোক মূর্চ্ছাগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত, প্রমাদগ্রস্ত। সেই ব্যক্তি অকর্মণ্য, আলস্যপরায়ণ। কিন্তু যে ব্যক্তি বাইরে নিষ্ক্রিয় থেকে থেকে অন্তরে চেতনার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, যার ভেতরে আগুন নিরন্তর জ্বলছে, চেতনার বহ্নিশিখা যার ভেতরে দেদীপ্যমান, সে ব্যক্তি অকর্মণ্য এবং অলস নয়। পরন্তু সে লোক সক্রিয়, সে এক অতি মহৎ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে ব্যস্ত। পদার্থজগতেও ঐ শক্তির উপযোগিতা অনেক।

গীতায় বলা হয়েছে—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্ত কৃৎস্ন কর্মকৃৎ॥

যে কর্মের ভেতরে অকর্ম দেখে এবং অকর্মের ভেতরে কর্ম দেখে, সে যোগী। পুরুষ, সে-ই সম্পূর্ণ কর্ম করতে সমর্থ।

আমরা অকর্মের ভেতরে কর্ম দেখার তত্ত্ব ভুলে গিয়েছি। অকর্মের

অন্তবে মহৎ কর্ম হযে থাকে। অকর্ম থেকে সম্ভূত কর্ম বাস্তবে অনেক বেশি নির্দোষ কর্ম। কর্ম থেকে উদ্ভূত কর্মে সমূহ দোষ থাকে। অকর্মেব এই মহত্ত্ব আমবা বুঝতে পাবি। কাযাগুপ্তি, কাযা শিথিলীকবণ, কাযাবিসর্জন—এ সব যেন আমবা বুঝতে চেষ্টা কবি। আজ আমি বিধিব আলোচনা কবব না। বিধি প্রযোগেব দ্বাবা বোঝানো হচ্ছে। প্রযোগেব দ্বাবা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিভাবে সমস্ত শবীব স্থিব কবা যায সে বিষযে চর্চা কবা যায। শবীব এতটা স্থিব কবা সম্ভব যে তাতে চপলতা থাকবে না, প্রকম্পন থাকবে না, সমস্ত শবীব স্থিবতা লাভ কববে। স্থিবতাব জন্য যদি একবাব মানসিক উত্তেজনা উৎপন্ন কবা প্রযোজন হয তবে তাই করুন। এতে শিথিলীকবণ অনেক তাডাতাডি সম্ভব হবে।

আপনি মাটিব ওপবে শুযে পা ছডিযে দিন, হাত ওপব দিকে তুলুন, যতই পাবেন হাত পাযেব দিকে টান করুন। একবাব এইভাবে শবীব টান কবতে পারলে পবম স্থিবত্ব অনুভূত হবে। শবীবেব টান অবস্থা শিথিল কবে দিন, শবীব সম্পূর্ণ শিথিল হযে যাবে। শিথিলীকবণেব এই এক প্রক্রিযা।

শিথিলীকবণেব অন্য একটি প্রক্রিযা আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গে সঙ্কল্প করুন যে, সে অঙ্গ শিথিল হোক। আবাব মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই সঙ্কল্পেব পুনবাবৃত্তি করুন। শবীব শিথিল হযে যাবে। কেবলমাত্র শুলেই শবীব শিথিল হয না। সঙ্কল্প কবতে হবে, শবীবকে প্রেবণা দিতে হবে। এই হল শিথিলীকবণেব দ্বিতীয বিধি বা প্রক্রিযা।

সাধনাব দৃষ্টিকোণ থেকে শিথিলীকবণেব প্রক্রিযা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয। এব মূল্য অনেক। আমি চাই প্রত্যেক সাধক সে মূল্য অনুভব করুন।

৬

মৌনতার মূল্য

কথা বলাব সঙ্গে আমাদেব পবিচয আছে। কথা বলাব কি মূল্য তা আমবা ভালভাবেই জানি। আমাদেব সমস্ত ব্যবহাব, অর্থাৎ পবস্পবেব মধ্যে আদান-প্রদান, কথাব মাধ্যমেই চলে। কিন্তু কথা না বলাবও একটি নিজস্ব মূল্য আছে। ভাষণেব যতটা মূল্য, অ-ভাষণেব মূল্য ততটাই, ববং সম্ভবস্থলে বাক-সংযমেব মূল্য বেশি। ঐ মূল্য আমাদেব বুঝতে হবে। যে প্রাণী বিকশিত হযে ওঠে তাব কথা বলাব ওপবে নির্ভব কবতে হয না। দেবতাদেব পর্যাপ্তি পঞ্চবিধ। তাব মধ্যে· ভাষাপর্যাপ্তি এবং মনপর্যাপ্তি নামে দু বকম হলেও প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। সাধাবণ মানুষেব, সাধাবণ প্রাণীব পর্যাপ্তি ছয, কিন্তু দেবতাদেব পর্যাপ্তি পাঁচ। একথা স্বীকাব কবা হয যে চক্রবর্তীদেব পর্যাপ্তি পাঁচ। যে মনেব দ্বাবা নিজেব কথা বলে তাব কথা বলাব প্রযোজন হয না। যখন আমবা আমাদেব কথা মনেব দ্বাবা বলতে পাবি না তখন এবং সেই জন্য আমাদেব কথা বলাব দবকাব পড়ে। যখন আমবা মন দ্বাবা ভাষণ বুঝতে পাবি না তখন আমাদেব কথা বলে আলাপ কবা প্রযোজন হয। কিন্তু যদি মনেব দ্বাবা ভাষণ সম্ভব হয তখন ভাষা ব্যর্থ বা নিবর্থক হযে যায। তাব আব কোনও সার্থকতা থাকে না। তখন

ভাষণেব ওপবে নির্ভব কবতে হয না। মানুষ যেমন যেমন জ্ঞানেব ভূমিব দিকে অগ্রসব হবে তেমন তেমন ভাষণেব ওপবে নির্ভব কমে যাবে। তবুও এবকম প্রশ্ন ওঠে, তীর্থঙ্কব কথা বলেন কেন? কেবল জ্ঞানী কেন কথা বলেন? তাঁবা যখন কৃতকৃত্য হযেছেন, যখন তাঁদেব সমস্ত কার্য সম্পন্ন হযে গিযেছে, যখন তাঁদেব সব কিছুতে সিদ্ধি হযেছে, তখন তাঁদেব কথা বলাব প্রযোজন কি? কেন তাঁবা কথা বলেন? কেন বাক্যালাপ কবেন, কেন ধর্মবিষযে ভাষণ দেন, কেন উপদেশ-কথা বলেন? তাঁদেব তো কথা বলাব, উপদেশ দেবাব কোনও প্রযোজন নেই। প্রাচীন ব্যাখ্যাকাববা এই প্রশ্নেব উত্তব দিতে গিযে বলেছেন তীর্থঙ্কব তথা কেবলী কৃতকৃত্য। তাঁদেব কথা বলাব কোনও প্রযোজন নেই। কিন্তু তীর্থঙ্কব শাস্ত্রবিহিত কর্মেব উদযস্বৰূপ, সেই জন্য তাঁবা কথা বলেন। তাঁবা নিজস্ব ভঙ্গিতে যথার্থ চিন্তা কবেছেন আব সমাধানেব এই ভাষা প্রস্তুত কবেছেন। এব অন্য বকম সমাধানও হতে পাবে। সে হল এই—জ্ঞানী লোকেবও অজ্ঞানী লোকেব জন্য কথা বলাব প্রযোজন হয। যখন কোনও লোকেব পবম জ্ঞানেব উপলব্ধি হয় তখন তিনি পবম-জ্ঞানীতে পবিণত হন। তাঁদেব মনে এক করুণা জাগে যে তাঁবা যা জেনেছেন, যা দেখেছেন, যা অনুভব কবেছেন তা অন্যেবও লাভ হোক। তাঁদেব মনে পবম করুণা, পবম অনুকম্পা, পবম সৌহার্দ্য আব মৈত্রীব ভাবনা জাগে। ঐ ভাব থেকে যাবা পবম বসেব আস্বাদ পায নি, পবম জ্ঞান প্রাপ্ত হয নি তাদেব তাঁবা এমন কিছু বলতে চান যা তাবা জানে না। তাঁবা এক ইশাবা কবতে চান, এক ইঙ্গিত কবতে চান, আব কিছু দিতে চান। তাঁবা করুণাপববশ হযে বাণী দিযে থাকেন। যদি দুই কেবলজ্ঞানী মিলিত হন তাঁদেব কথা বলাব প্রযোজন হয না। তাঁদেব মধ্যে বাক্যেব বিনিময হয না। তাঁদেব আত্মাব সঙ্গে আত্মাব আলাপ হয। সেখানে ভাষা নিবর্থক, তাব কোনও উপযোগিতা নেই। দুই বিশিষ্ট জ্ঞানীব সাক্ষাৎ হলে তাঁদেব বাক্যবিনিমযেব কোনও প্রযোজন হয না। যদি একজন জ্ঞানী

এবং আর একজন অজ্ঞানী হয় তবে কথা বলার কিছুটা প্রয়োজন হয়। দুই জ্ঞানীর মিলন হলে কথাবার্তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কথা বলবেন না। ইনিও মূক, উনিও মূক। দুজনে বোবার মত একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকেন, কেউ কথা বলেন না।

এক ঘটনা ঘটেছিল। ফরীদ বহু শিষ্যসহ পদযাত্রা করেন। যখন তিনি কাশীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বলল, খুব সুন্দর সুযোগ মিলেছে। পাশেই কবীরের আশ্রম। সেখানে চলুন এবং দুদিন বিশ্রাম করুন। বিশ্রামও হবে এবং দুই জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে আলাপও হবে। আমরা জানার, বিশেষতঃ শোনার, সুযোগ পাব। শিষ্যরা ফরীদকে অনুরোধ করল। ফরীদও অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন।

এদিকে কবীরের শিষ্যরা সংবাদ পেল যে ফরীদ কাশীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে শিষ্যরাও আছে। তাদের মনেও ভাবনা জাগল। তারা কবীরকে বলল, 'ফরীদ এই দিক দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাঁকে এখানে আটকাই। আপনাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হবে। দুই জ্ঞানী লোকের সাক্ষাৎ হবে। কবীর এবং ফরীদ পরস্পরের সাথে মিলিত হবেন। দুজনে জ্ঞানী পুরুষ। খুব জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা হবে। আমাদের শোনার এবং জানার সুযোগ মিলবে। খুব ভাল হবে।' কবীর বললেন, 'খুব ভাল কথা।' কবীর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে চললেন। ফরীদও আসছিলেন। তাঁদের দেখা হতে দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরলেন। কবীর ফরীদকে থাকতে বললেন। ফরীদ তাঁর অনুরোধ মেনে নিলেন। তাঁরা দুজনে এলেন। আশ্রমে রইলেন। আশ্রম কবীরের। সেখানে কবীর এবং ফরীদ দুজনেই রইলেন। তাঁদের শিষ্যরাও ছিল। দুজনেরই শিষ্যরা খুব উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন। এক দিকে ফরীদ এবং তাঁর শিষ্যরা বসেছিলেন। আর একদিকে সশিষ্য কবীর বসেছিলেন। সব শিষ্যই দুজনের কথাবার্তা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে ছিল। শিষ্যরা ভাবছিল কে আগে কথা বলবেন—কবীর, না ফরীদ। সবাই বসে প্রতীক্ষা

করতে লাগল। এক ঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টা গেল। সবাই মৌন। দুই জ্ঞানীও মৌন। কবীর ফরীদের এবং ফরীদ কবীরের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। দু জনের চোখে চোখে মিলন হচ্ছিল। কিন্তু তাঁদের মুখের তালা খোলে নি। মৌন, মৌন, কেবল মৌন। কেউ কথা বলছেন না। না কবীর কথা বলছেন, না ফরীদ কথা বলছেন। শিষ্যরা প্রতীক্ষা করে ধোঁকা খেয়ে গেল। এই ভাবে সময় চলে যেতে লাগল, প্রতীক্ষার কাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল, সবাই প্রতীক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এই ভাবে প্রতীক্ষার কাল বেড়ে চলল, আর সবার মনে গভীর আকাঙ্ক্ষা আর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হল। প্রতি ক্ষণ তাদের অতি দীর্ঘ মনে হতে লাগল। এক এক ক্ষণ এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ বোধ হল। সব শিষ্য প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত এবং বিরক্ত হল। তারা ভাবতে লাগল— ফরীদ কি বোবা, না কবীরই বোবা। দুজনেই নীরব। দুজনের কেউই কথা বলছেন না। শেষ পর্যন্ত কি হল? আরও কিছুটা সময় কেটে গেল। তার পরে কবীর উঠে দাঁড়ালেন। ফরীদও উঠলেন। দুজনেই সেখান থেকে চলে গেলেন। নিজ নিজ কাজে রত হলেন। ভোজনের সময় এল। ভোজন করলেন। বিশ্রাম করলেন। মধ্যাহ্নে দুজনে আবার মিলিত হলেন। তাঁরা দুজনে বসে রইলেন, আর একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। দুজনের চোখে চোখে মিলন হল, দুজনে মৌন। শিষ্যরা প্রতীক্ষা করে রইল। পুরো দিন কেটে গেল। সূর্যাস্ত হল। সভা শেষ হল। শিষ্যরা ভাবল, হয়তো তাঁরা রাতে কথা বলবেন। রাতে আবার তাঁরা একত্র হলেন। আবার সেই নীরবতার পালা। শিষ্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবার দিন এল। সারা দিন গেল। শুধু নীরবতা। কোনও কথাবার্তা নেই। রাতে দেখা, তবুও কোন কথা নেই। শিষ্যদের মন বিরক্তিতে ভরে গেল। তৃতীয় দিন এল। ফরীদ চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কবীর তাঁকে এগিয়ে দিতে সাথে সাথে চললেন। দুজনেই নীরবে চলতে লাগলেন। অবশেষে দুজনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় এল। দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে

ধবলেন। ফবীদ এগিযে গেলেন। কবীব নিজেব আশ্রমে ফিবে এলেন। আশ্রমে পৌছে শিষ্যবা কবীবকে বলল, 'এ কেমন ব্যাপাব ? আমাদেব শুধু ধোঁকা দিলেন কেন ? আপনাবা কেউ কথা বলবেন না, এ কথা আমাদেব আগে বলতে পাবতেন। আমবা তাহলে এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা কবতাম না। আমবা আটচল্লিশ ঘন্টা প্রতীক্ষা কবেছি। আমাদেব কি গভীব উৎকণ্ঠা হযেছিল। আকাঙ্ক্ষা হযেছিল, ভাবনা হযেছিল। আমবা ভেবেছিলাম—দুই জ্ঞানী মিলবেন। এক কবীব, আব এক ফবীদ। দুজনেব কথাবার্তা হবে। আমবা শুনব, আমাদেব জ্ঞান বাডবে।'

কবীব বললেন—কাব সঙ্গে বাক্যালাপ কবব ? কাব সঙ্গে কথা বলব ? ফবীদ সামনে বসে ছিলেন। ফবীদ এত জ্ঞানী যে মনেব কথা বুঝতে পাবেন, তাঁব সামনে কথা বলে কি নিজেব অজ্ঞতা প্রকাশ কবব ? কথা বললে শুধু নিজেব অজ্ঞতা প্রকাশ পেত। আমি কাব সঙ্গে কথা বলব ? তোমবাই বল। আমাব সামনে যদি কোনও অজ্ঞানী লোক বসে থাকত তবে অবশ্যই তাব সঙ্গে কথা বলতাম। কিন্তু তিনি তো মহাজ্ঞানী, তাঁব সঙ্গে কি কথা বলব ? তিনি আমাব মনেব সমস্ত কথাই জানতে পেবেছেন।

ফবীদেব শিষ্যবাও ফবীদকে ঐ প্রশ্ন কবেছিল এবং তিনিও তাদেব ঐ উত্তবই দিযেছিলেন। আমি কাব সঙ্গে কথা বলব ? কবীবেব মত জ্ঞানী ব্যক্তি সামনে ছিলেন, তিনি আমাব মনেব সমস্ত কথা জেনেছিলেন। তাব পবে আমি আব কি বলব ? আমি যা বলতে চেযেছিলাম সে সব কিছুই তিনি জানতে পেবেছিলেন। ঐ বকম পবিস্থিতিতে তাঁব সামনে আমি কিছু বললে শুধু নিজেব মূর্খতাই প্রকাশ কবতাম। আমাব সামনে কথা বলাব কোনও প্রশ্নই ছিল না। যেখানে সামনে অজ্ঞানী উপস্থিত থাকে সেখানেই কথা বলাব দবকাব হয। দুজনেই যদি অজ্ঞানী হয তবে তাদেব কথা কখনই শেষ হয না। দীর্ঘকাল বাক্যালাপ হয। দুই পণ্ডিতেব সাক্ষাৎ হলে শাস্ত্রার্থ আলোচনা কখনও শেষ হয না। বিবাদ

কখনও সমাপ্ত হয না। এই বকম পবিস্থিতিব কথা মনে বেখে ভগবান মহাবীব বলেছেন—যদি কোন পণ্ডিত, কোনও অর্থশাস্ত্রীব সঙ্গে সাক্ষাৎ হয তাকে বোঝাও, আবাব বোঝাও। যদি বোঝাবাব পবেও সে স্বীকাব না কবে তবে বাকগুপ্তি কব, বচন গোপন কব, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন কব। একেবাবে মৌন হযে যাও। সেটিই সবচেযে সুন্দব সমাধান।

বাদশাহ বীববলকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—'মুর্খেব পাল্লায পডলে কি কবা উচিত?' বীববল বলেছিলেন—'জাঁহাপনা, মৌন হযে যাওযা উচিত। মৌন থাকাই সবচেযে ভাল সমাধান।' বিবাদ শেষ কবাব এব চেযে ভাল উপায আব হতে পাবে না।

মহাবীবও বলেছেন, যদি কোনও পণ্ডিত বা ভাষাশাস্ত্রী উপস্থিত হয় এবং কেবল তর্কেব কথা বলে বিবাদ বাড়াতে চায, শাস্ত্রার্থ কবতে চায তবে মৌন হযে যাও, বাকগুপ্তি কব। ঐ তাব সমাধান বটে।

দুই জ্ঞানী মিলিত হলে তাঁবা বাক্যালাপ কবেন না। যেখানে এক জন অতিশয জ্ঞানী আব একজন তাঁব চেযে কম জ্ঞানী, সেখানে ভাষাব প্রযোগ হয। যেখানে দুজনেই জ্ঞানী, দুজনেই সমান বোদ্ধা, সেখানে ভাষাব প্রযোগ নিবর্থক।

মৌন থাকাব এই বড় সুবিধে যে তাতে আমাদেব জ্ঞান বাডে। যখন ভাষাব ব্যবহাব কম হবে তখন আমাদেব জ্ঞান বাড়বে। যত বেশি ভাষাব প্রযোগ হবে, আমবা যত বেশি কথা বলব ততই আমাদেব অন্তর্জ্ঞানে বাধা ঘটবে। চঞ্চলতা বাধা সৃষ্টি কবে। ভাষাব প্রথম কাজ চঞ্চলতা সৃষ্টি কবা। পূজ্যপাদ লিখেছেন—জনেভ্যো বাক্ ততঃ স্পন্দঃ—যখন সম্পর্ক হয় তখনই বাক্য আসে। একলা একলা তো কোনও কথাবার্তা হয না। একাকী কেউ কথা বলে না। একলা থাকলে কথা বলাব কোনও প্রযোজন থাকে না। দ্বিতীয কেউ থাকলে সম্পর্ক হয এবং বাক্যালাপ হয। আব, কথাব পবে আসে চঞ্চলতা। কথা বলাব আগেও চঞ্চলতা, আব পবেও চঞ্চলতা। আমাদেব কথা বলতে হলে সবাব আগে আমাদেব মনকে চঞ্চল কবতে হয। মনকে চঞ্চল না কবলে

কোনও লোক কথা বলতে পারে না। লোকে কোনও কিছু বলতে চাইলে প্রথমে চিন্তা করে, তার পরে বলে। বলার মতলব থাকলে প্রথমে মনকে চঞ্চল কর, তারপরে বল। বলার আগে চঞ্চলতা, আবার পরেও চঞ্চলতা। কথা বলা নিজেই চঞ্চলতা বিশেষ। বলার পরে ঐ বিষয়ে আবার যে চিন্তা হতে থাকে তা স্বয়ং চঞ্চলতা উৎপাদন করে। ভাষণের আগে চাঞ্চল্য, ভাষণের সময়ে চাঞ্চল্য। ভাষণের পরেও চাঞ্চল্য। এ সমস্তই চঞ্চলতার ব্যবহার, আর এই ব্যবহার অন্তর্জ্ঞানের পথে বাধা উপস্থিত করে। যে লোক অন্তর্জ্ঞানের সঠিক মর্ম বোঝেন তিনি খুবই কম কথা বলে থাকেন। তিনি বেশির ভাগ সময় মৌন থাকেন।

ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'ভগবন, বচনের গুপ্তি অর্থাৎ মৌন দ্বারা লোকে কি পায়?' ভগবান উত্তরে বলেছিলেন যে বচনগুপ্তি থেকে মানুষ নির্বিচারতা প্রাপ্ত হয়। 'নিব্যিযারত্তং' কথাটি প্রাকৃত ভাষার শব্দ। সংস্কৃতে তার দুটি রূপ হতে পারে—নির্বিচারত্ব বা নির্বিকারত্ব অর্থাৎ নির্বিচারতা বা নির্বিকারতা। বচনগুপ্তি দ্বারা নির্বিচারতা বা নির্বিকারতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিকৃতির অর্থ পরিণতি। নির্বিকৃতির অর্থ স্থিরতা, যার কোনও পরিণতি নেই। স্থিরতা স্থায়ী। ভাষা থেকে যে বিকৃতি সম্ভূত হয় তার সমাপ্তি আছে।

বচনগুপ্তির এক পরিণাম—নির্বিচারতা। আমরা এই জন্য চিন্তা করি যে আমরা বলব, অন্য লোককে বলব। আমাদের মনে যখন বলার কথা আসে তখন আমরা চিন্তা করি। যখন আমরা মৌন থাকি তখন নির্বিচারতার স্থিতি উৎপন্ন হয়। বচনগুপ্তি থেকে মহৎ লাভ নির্বিচারতা। অভাষণের মূল্য নির্বিচারতা। সেখানে বিচারের স্থিতির শেষ।

ভাষা ব্যবহার না করার আর একটি মূল্য—বিবাদমুক্তি। বিবাদ থেকে ছুটি মিলে যায়। মৌন হয়ে যাও, বিবাদ আপনা থেকে শেষ হয়ে যাবে। হামেশাই কথা বলার ফলে বিবাদ তথা লড়াই হয়। যখন একজন বলতে থাকে তখন অপর জন যদি মৌন থাকে তবে বিবাদ সমাপ্ত হয়ে যায়। 'অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেব বিনশ্যতি।' আগুন

জ্বলছে। তার ইন্ধন স্বরূপ ঘাস না মিললে, ভোজন না মিললে সে নিবে যাবে, আর জ্বলবে না। সেই রকম দুই ব্যক্তি যদি কথা বলে চলে তবে লড়াইয়ের আগুন লকলক করে জ্বলে ওঠে, নেবে না, শান্ত হয় না। লড়াইয়ের আগুনের ইন্ধন মিলে যায়, খাদ্য মিলে যায়, আর আগুন জ্বলতেই থাকে। যখন একজন কথা বলে তখন আর একজন যদি চুপ করে থাকে, কোনও কথা না বলে তাহলে আগুনের খাদ্য মেলে না, ফলে তা আপনা থেকে শান্ত হয়ে যায়, নিবে যায়। মৌনের দ্বিতীয় লাভ—বিবাদমুক্তি।

মৌনের তৃতীয় লাভ—অহংমুক্তি। কথা না বললে অহঙ্কার শেষ হয়ে যায়। কথায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। 'আমি বেশ বলেছি'—এ অহঙ্কার। 'ভাষার উপরে আমার প্রভুত্ব আছে'—এও অহঙ্কার। এতে অহং উৎসাহিত হয়। ভাষার জ্ঞান যতটা হয় ততটাই অহং বোধ বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'ন চিন্তা তায়যে ভাসা কযো বিজ্জাণুসাসনং'—ভাষা আমাদের ত্রাণ করে না। নানা প্রকার ভাষা ত্রাণস্বরূপ হয় না। আমি সংস্কৃত জানি, হিন্দি জানি, প্রাকৃত জানি—এই রকম ভাবে ভাষার অহঙ্কার বেড়ে যায়। ভাষা বাক্যের মাধ্যম, বিচার ব্যক্ত করার মাধ্যম, তা আমাদের অহঙ্কারের মাধ্যমে পরিণত হয়।

স্বামী রামতীর্থ আমেরিকা গিয়েছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রাধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামীজি, আপনি নিজেকে বাদশাহ বলে থাকেন, এ কেন করেন? আপনার তো কিছুই নেই। যা আছে তা সামান্য। তবে আপনি বাদশাহ কিভাবে হলেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' রামতীর্থ বলেছিলেন—'আমার কিছু নেই বলেই তো আমি বাদশাহ। যে বস্তুকে আঁকড়ে ধরে সে তো গরীব। যে গরীব সে সব কিছু সংগ্রহ করতে চায়, সব কিছু সঞ্চয় করতে চায়। আমি গরীব নই, আমি বাদশাহ। আমার কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। সারা দুনিয়া আমার। আমি

কেন সংগ্রহ করব, কেন সঞ্চয় করব, কোথায় সঞ্চয় করব ? সারা দুনিয়া তো আমার। গরীব সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। আপনারা সবাই সংগ্রাহকের দল, আপনারা সবাই তো গরীব। আমিই প্রকৃত বাদশাহ, যে কিছুই সংগ্রহ করে না বা সঞ্চয় করে না। আমার কিছুই নেই, এই জন্য আমি বাদশাহ।'

বস্তুত এই কথা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। তা রাষ্ট্রাধ্যক্ষের মনে বোধ জাগিয়েছিল। একজন অকিঞ্চন লোকের কথা কার্যকর হতে দেখে সন্ন্যাসীও সন্তোষ লাভ করেছিলেন। তিনি ভারতে ফিরে এলেন। তিনি ভাবলেন—আমি যা কিছু বলেছি, যা কিছু অনুভব করেছি তা ভারতের লোকদেরও বলব। ভারতে তিনি কাশীধামই বেছে নিলেন, কারণ কাশী পণ্ডিতদের নগর। পণ্ডিতরা তাঁর ঐ কথা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে, বেশি গুরুত্ব দেবে। তিনি কাশী এলেন। সভা আয়োজিত হল। বহু লোক এল। বড় বড় পণ্ডিত, দিগ্‌গজ বিদ্বান লোক এলেন। রামতীর্থ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। সে কথা শোনার পরে এক বিদ্বান উঠে বললেন—'মহারাজ! আপনি কি সংস্কৃত জানেন ?' রামতীর্থ উত্তর দিলেন, 'আমি সংস্কৃত জানি না।' তখন সেই পণ্ডিত বললেন, 'তবে আপনি জ্ঞানের কথা কি বলছেন ? যে সংস্কৃত জানে না সে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কি বুঝবে। সে আবার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কি আলোচনা করবে, কেমন করেই বা করবে ? সে লোকের ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার নেই।'

আলোচনা সেখানেই শেষ হয়ে গেল, মনে হল সংস্কৃত যেন ব্রহ্মজ্ঞান অধিকার করে নিয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে অন্য ভাষারও অধিকার আছে। যে ব্রহ্মজ্ঞান আত্মার নির্মলতা, পবিত্রতা তথা বিশুদ্ধি থেকে উদ্ভূত হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞান অন্তঃকরণের পবিত্রতা থেকে সঞ্জাত, তাকে ভাষায় বন্দী করা হয়েছে, এ কত বিড়ম্বনা। যে সংস্কৃত জানে সে-ই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী। যে সংস্কৃত জানে না সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার প্রাপ্ত হয় না। অন্তরের জ্ঞান, আত্মার সহজভাবে উৎপন্ন জ্ঞানকে

ভাষাব বাঁধনে বেঁধে আমবা অহংকে বর্ধিত কবাব বাস্তা প্রস্তুত কবেছি। এই জন্যই ভগবান মহাবীব বলেছেন—'ন চিত্তা তাযযে ভাসা।' নানা প্রকাব ভাষা আপনাকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে না, দুঃখ থেকে ত্রাণ কবতে পাবে না, আত্মিক জ্ঞান উৎপন্ন কবতে সমর্থ হবে না। 'কযো বিজ্জাণুসাসনং'। এই বিদ্যাব অনুশাসন, যা সমস্ত হয বচনেব মাধ্যমে, ভাষাব মাধ্যমে, তা আপনাকে সুবক্ষিত কবতে পাবে না। আপনাব নিজেব সুবক্ষা আপনাব জ্ঞানে, আপনাব নিজেব মধ্যেই নিহিত আছে। ঐ জ্ঞান কথাব দ্বাবা পাওযা যায না, কিন্তু অভাষণেব দ্বাবা অবশ্যই পাওযা যায। ঐ জ্ঞানেব কথা নিজেব বলাব প্রযোজন নাই, কোনও ভাষাবও প্রযোজন নাই।

দুনিযাতে অনেক আত্মজ্ঞানী লোক এসেছেন। ইংবেজি, ফবাসী, তথা হিন্দি ভাষা জানা লোকও আত্মজ্ঞানী হযেছেন। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত জানা লোকও আত্মজ্ঞান লাভ কবেছেন। এ ছাড়া কোনও ভাষাই ভালভাবে জানেন না বা বুঝতে পাবেন না, এমন লোকও আত্মজ্ঞানী হযেছেন। আবাব এমন লোকও আত্মজ্ঞানী হযেছেন যিনি নিজেব বিচাব ভাষায প্রকাশ কবতে পাবেন না, ভাষণ দিতে জানেন না, নিজেব কথাও সম্পূর্ণ বলতে পাবেন না। ভাষাব সঙ্গে আত্মজ্ঞানেব কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাষা বাইবে থেকে আসে, আব আত্মজ্ঞানেব স্রোত ভেতব থেকে প্রবাহিত হয। ভাষা কথা বলাব একটি উপায বা যন্ত্র মাত্র, ব্যবহাবেব মাধ্যম মাত্র। সেই ভাষাকেও আমবা অহঙ্কাবেব সাধনযন্ত্রে পবিণত কবেছি। আমি বুঝতে পাবি না—বলা থেকে একটা মস্ত বড লাভ হয। সেটা অহংমুক্তি বটে। অহঙ্কাব থেকে আমবা মুক্ত হযে যেতে পাবি, ছাড়া পেতে পাবি, আব যাব মাধ্যমে অহঙ্কাব এত বর্ধিত হয তা থেকে বেঁচে যেতে পাবি।

আমি একথা মানি সাধাবণ মানুষেব কথাব প্রযোজন আছে, কথা ছাড়া তাব ব্যবহাব চলতে পাবে না। বাক্যেব ব্যবহাব ছাড়া তাব জীবনচর্যা অচল হযে যেতে পাবে। বলতেই হয, এ এক বকম কথা।

আব বলা আবশ্যক, বলাকে আমবা অনিবার্য বলে মেনে নিযেছি, বলাতে আমবা প্রাথমিকতা আবোপ কবেছি, এ সব অন্য বকম কথা। এই দু বকম কথাব মধ্যে অনেক তফাৎ। কেননা যখন বলাকে আমবা প্রাথমিকতাব গুরুত্ব দিই, তাকে অনিবার্য বলে মেনে নিই, তখন আমাদেব মানসিক ক্ষমতা কমে যায, ক্ষীণ হযে যায। যে কথা মনেব দ্বাবা বলা যায সে কথা বলতে আমবা অসমর্থ হযে পড়ি। মনেব শক্তিব বড় অন্তবায এসে যায।

আধুনিক প্যাবাসাইকোলজিস্টবা টেলিপ্যাথিব প্রযোগ কবছেন। টেলিপ্যাথিব অর্থ বিচাবসংপ্রেষণ। একটি লোক হাজাব ক্রোশ দূবে আছে। তাব সঙ্গে কথা বলতে হবে। কি ভাবে তা সম্ভব হতে পাবে? আজ তো টেলিফোন এবং বেতাব যন্ত্র হযেছে। ঘবে বসে লোকে হাজাব ক্রোশ দূবে থাকা নিজেব লোকেব সঙ্গে কথা বলছে। প্রাচীনকালে এসব যন্ত্র ছিল না, তখন লোকে দূবে অবস্থিত মানুষেব সঙ্গে কথা বলত কি কবে? তাবা টেলিপ্যাথি বা বিচাব-সংপ্রেষণ দ্বাবা আলাপ কবত। প্রাচীনকালে টেলিপ্যাথি বলে কোনও কথা ছিল না। ঐ কথাটি ইংবেজি কথা। সে সমযে প্রচলিত শব্দ ছিল বিচাব-সংপ্রেষণ। তাব অর্থ—এক জাযগায বসে নিজেব বিচাব হাজাব ক্রোশ দূবে প্রেষণ কবা। যথা—এক যোগী ছিলেন। তাঁব শিষ্য পাঁচ হাজাব মাইল দূবে ছিল। যোগী তাকে কিছু বলতে চেযেছিলেন, তাব সঙ্গে আলাপ কবতে চেযেছিলেন। এখন তিনি কি কবে বাক্যালাপ কবলেন? তখনকাব দিনে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু তখন বিচাব-সংপ্রেষণেব সাধনা কবা হত। এই সাধনায সুদক্ষ ব্যক্তি ধ্যান মুদ্রায স্থিত হযে আপন বিচাবেব তবঙ্গ অভীষ্ট স্থানে সংপ্রেষিত কবতেন। বিচাবেব তবঙ্গ শক্তিশালী হযে যে সুদূব স্থানে সাধক তাঁব চেতনা পৌঁছতে চান সেখানে পৌঁছে যেত। সেখানে কোনও ব্যক্তিব মস্তিষ্ক চেতনা-প্রাপকেব কাজ কবত। সেই ব্যক্তি সেই বিচাব তবঙ্গকে ধাবণ কবত আব তাব মাধ্যমে জানতে পাবত

কে কি কথা বলছে। আবার যদি তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হতো তবে সে নিজে ধ্যানস্থ হয়ে যেত এবং ধ্যানযোগে বিচারতরঙ্গ গুরু বা ইষ্ট ব্যক্তিকে পৌঁছে দিত। এই ভাবে বিচার জানানো হতো। এই ছিল বাক্যালাপ করার পদ্ধতি। এই ছিল বিচার সংপ্রেষণের মাধ্যম, আর তার জন্যই মানসিক ক্ষমতার বিকাশের প্রয়োজন হতো। সাধকরা মানসিক ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করতেন।

আমরা অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস করে ফেলে মানসিক ক্ষমতাকে ক্ষীণ করে ফেলি, হারিয়ে ফেলি। আজকাল মানসিক ক্ষমতা বিকশিত করার কোনও চেষ্টা নেই। তারও দুটি কারণ আছে। এক কারণ, আমরা বলাকেই প্রাথমিক অধিকার বা প্রাধান্য দিয়েছি। পত্র দ্বারাও আমরা কিছু কিছু বলার কাজ করে থাকি। আজকাল নানা রকম যন্ত্রপাতি বা কর্মসাধনোপায় উদ্ভাবিত হয়েছে, তার ফলে মানসিক ক্ষমতার কোনও প্রয়োজন অনুভূত হয় না। যখন আমাদের মানসিক ক্ষমতার ওপরে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা ভাষা-প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করি। যদি আমরা কথা না বলে আমাদের মানসিক ক্ষমতা বিকশিত করি তবে এ রকম হওয়া সম্ভব যে, না বলা কথা আমরা বুঝতে পারব। 'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।' যে গুরুর আত্মশক্তি প্রবল তিনি মৌন ভাবে সমাসীন থাকেন। নানা প্রকার সন্দেহ নিয়ে শিষ্যরা আসে। গুরুর পাশে বসে, গুরুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। তার সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয়ে যায়, তাদের সমাধান হয়ে যায়। তারা আপনা-আপনি তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে যায়। কারণ কি? তখন মনের ভাষা চলতে থাকে। মন নিজের কাজ করে, সন্দেহ মিটে যায়। কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। দিগম্বরগণ বলেন, তীর্থঙ্কর কথা বলেন না, শ্বেতাম্বরগণ বলেন যে তীর্থঙ্কর কথা বলেন। আমি শাস্ত্রীয় আলোচনার মধ্যে যাব না। দিগম্বরগণ বলেন—তীর্থঙ্কর কথা বলেন না। কেবল ধ্বনি নির্গত হয়। আমার এ কথা বৈজ্ঞানিক মনে হয়। এ কথা বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত।

তাঁরা কথা বলেন না, কিন্তু যা বলতে চান সে সব কিছু সবার কাছে পৌঁছে যায়। সেখানে কেবল ধ্বনি হয়, কিন্তু কোন ভাষার প্রয়োগ হয় না। কিন্তু যত লোক সেখানে উপস্থিত থাকে তারা ঐ ধ্বনি আপন আপন ভাষায় বুঝে নেয়। শ্বেতাম্বররা বলেন, তীর্থঙ্কর এক ভাষায় কথা বলেন। যে হিন্দি জানে সে হিন্দিতে সে কথা বোঝে, যে সংস্কৃত জানে সে সংস্কৃত ভাষায় বোঝে, যে প্রাকৃত ভাষা জানে সে প্রাকৃত ভাষায় বোঝে। যে হিন্দি জানে সে বোঝে তিনি হিন্দিতে কথা বলছেন, সংস্কৃতজ্ঞ মনে করেন তিনি সংস্কৃতে কথা বলছেন, আবার প্রাকৃতজ্ঞ মনে করেন, তিনি প্রাকৃত ভাষায় কথা বলছেন। মানুষ বোঝে তিনি মানুষের ভাষায় কথা বলছেন, পশুরা ভাবে তিনি পশুর ভাষায় কথা বলছেন। তাঁর ধ্বনি ও বাণী মানুষ বুঝতে পারে, পশুও বুঝতে পারে, আবার দেবতারাও বুঝতে পারেন। এ কেমন করে সম্ভব হয়? সেখানে কি কোন অনুবাদক বসে থাকে? না, কোনও অনুবাদক থাকে না। এটা স্বাভাবিক পরিণতি। একে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তা ধ্বনি মাত্র এবং ঐ ধ্বনির বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর হয়। আর শ্রোতারা তা নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণ করে। বক্তার কথা বলার কোন প্রয়োজন হয় না। তিনি যা বলতে চান তা ঐ ধ্বনির মাধ্যমে বলেন। মনোবর্গনার পুদ্গল এত শক্তিশালী হয় যে তা বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে নিজের কাজ করে।

ভাষা প্রয়োগ না করার আরও একটি মূল্যের কথা আমি বলব। তা হল আমাদের অনির্বচনীয়তার সিদ্ধান্ত। ভারতের প্রায় সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেই এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। বেদান্তে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। ব্রহ্মকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার কোনও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ দর্শনে অনির্বচনীয়তার বহুল প্রয়োগ হয়েছে। বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—পরলোক কি? বুদ্ধ বলেছিলেন—অনির্বচনীয়, তাকে কথায় প্রকাশ করা যায় না। আত্মা কি? পুনর্জন্ম আছে, কি নেই? বুদ্ধ বলেছেন—অনির্বচনীয়, তাকে

ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কথায় প্রকাশ করা যায় না। যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছিল সবার উত্তরেই তিনি বলেছিলেন, অনির্বচনীয়। তিনি বলেছিলেন ঐ সব বিষয়কে কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না। মহাবীর বলেছেন—পূর্ণ সত্য অব্যক্ত, কথায় তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কেননা বস্তু অনন্তধর্মা। বস্তুতে অনন্ত ধর্ম আছে। আমরা কি করে অনন্ত ধর্মের কথা বলতে সক্ষম হব? আমরা আপন ভাষায় এক ক্ষণে এক ধর্মের প্রতিপাদন করতে পারি। শেষ পর্যন্ত অনন্ত ধর্ম চাপা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আমরা অনন্ত ধর্ম কি করে প্রতিপাদন করতে সমর্থ হব? সেজন্য বলা হয়েছে, বস্তু অবক্তব্য অর্থাৎ ভাষার অতীত। সমস্ত বস্তুর স্বরূপ কথায় প্রকাশ করা যায় না। এক ধর্মের কথা বলা সম্ভব। অনন্ত ধর্ম অনির্বচনীয়। অনন্ত সত্য অবক্তব্য। অখণ্ড সত্য অবক্তব্য। সম্পূর্ণ সত্য অবক্তব্য। এ বেশ ভাল হয়েছে। আমরা ভ্রান্তিতে বা অসত্যেও আবদ্ধ হই না। অনন্তধর্মা বস্তুকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরাও তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। আর যখন তাঁরা ভাষা প্রয়োগ করেন তখন এক ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। কেবলজ্ঞানীই বল, সর্বজ্ঞই বল, পরমাত্মাই বল, যা কিছু বল, তাঁরা পূর্ণকে জানেন, কিন্তু তাঁরা যা কিছু বলেন তা অপূর্ণ হয়ে যায়। তাঁরা অপূর্ণ কথা বলবেন। আমরা আবার সে কথা আরও খণ্ড খণ্ড করে বলব। তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করে বিতরণ করব। আমরা একটি কথা গ্রহণ করব, আর আগ্রহ শুরু হয়ে যাবে। তার ফল এই দাঁড়াবে: আমরা যা জেনেছি তাকে আমরা সত্য বলব, আর তোমরা যা বলবে তাকে অসত্য বলব। এই ভাবে সত্য এবং অসত্যের ঝটাপটি শুরু হয়ে যায়। বিবাদ আরম্ভ হয়। তর্কাতর্কি শুরু হয়। এই পরস্পরের মত খণ্ডন এবং পরস্পর দূষণে কোনও কিছু বস্তু থাকে না। বিবাদেরও কোনও তাৎপর্য থাকে না। যে যা বলে সে শুধু আংশিক তত্ত্ব। আমরা অংশকে পূর্ণ বলে মেনে নিই। আর এই অংশকে সত্য বলে মেনে নেওয়া থেকে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। বাক্‌যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সিদ্ধান্তের লড়াই শুরু হয়ে

যায়। লড়াইয়ের একমাত্র কারণ অপূর্ণকে ভাষায় প্রকাশ করা উচিত নয়, কিন্তু আমরা তাই করে থাকি। যদি লোকে মৌন থাকে, শব্দও থেমে যায়, জ্ঞানীও মৌন থাকেন, এবং বলেন, আমি পূর্ণকে জেনেছি, কিন্তু তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, তাহলে লড়াই থেমে যায়। কিন্তু ঐসব জ্ঞানী লোক অনুকম্পাবশত অল্প কিছু বলেন। সম্পূর্ণ বলা তাঁদের সম্ভব হয় না। তাঁরা অল্প যা কিছু বলেন তার জন্য লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়। তাঁরা যদি পুরো বলতেন তবে লড়াই হতো না।

পাঁচটি শিশু আছে, পাঁচটি লাড্ডু আছে। সবাইকে একটি একটি করে লাড্ডু দেওয়া হল। সবাই সমান ভাগ পেল। কোনও লড়াই হবে না। পাঁচটি শিশু আছে, আর একটি লাড্ডু আছে। আপনি লাড্ডুটি টুকরো টুকরো করে সবাইকে এক একটি টুকরো দিলেন। লড়াই শুরু হয়ে যাবে। শিশুরা বলতে আরম্ভ করবে—ওকে বেশি দিয়েছেন, আমাকে কম দিয়েছেন। ওকে অনেক দিয়েছেন, আমি অতটা পাই নি। যেখানে ভাগ অনেক, আর বিভাজ্য বস্তু কম, সেখানে বিবাদ হয়, লড়াই হয়।

সেই রকম আমাদের আগ্রহ অনন্তকে জানার, সম্পূর্ণ সত্যকে জানার, অখণ্ড সত্যকে জানার। তা আমরা পুরোপুরি পাই না। আমরা জানতে পারি ছোট একটি অংশ, অনন্তের এক খণ্ড। আমরা ঐ খণ্ডকে আয়ত্ত করে, তাকে পেয়ে, অখণ্ডের জন্য লড়াই করতে শুরু করি। ঐ লড়াই কখনও শেষ হয় না। লোকে যদি কথা না বলে তবে ভাল হয়। অন্তত তারা যদি সত্য সম্বন্ধে কোনও কথা না বলে, কেবল ব্যবহারের সম্পূর্তির জন্য কথা বলে, তবে লড়াই হতে পারে না। সত্যের সম্বন্ধে কিছু না বলাই অসত্য থেকে রক্ষা পাবার সবচেয়ে ভাল উপায়। কিন্তু এ রকম হতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনুকম্পা করেন, দয়া করেন যাতে অজ্ঞ লোক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে না পারলেও অন্তত অল্প কিছু জানুক। এই অনুকম্পা ভার হয়ে পড়ে, কারণ সেটাই বিবাদের পথ খুলে দেয়। আজকাল পরিস্থিতি এ রকম

দাঁড়িয়েছে যে লোকে সত্যকে জানুক বা না জানুক, তারা সত্যের জন্য বিবাদ করতে প্রস্তুত হয়।

কথা না বলার একটি মহৎ উপকারিতা—সত্যকে সুরক্ষিত করা। কথা না বললে সত্য সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়। অবক্তব্য, অনির্বচনীয় অব্যাকৃত—এই কথাগুলি সত্যকে সুরক্ষিত করে। এক জন বলে, 'অস্তি' অর্থাৎ আছে। আর একজন বলে, 'নাস্তি' অর্থাৎ নেই। দুই কথারই দুটি দিক আছে। বিবাদের পরিস্থিতি এসে যায়। মহাবীর বলেছেন, 'যে অস্তি বলে সেও ঠিক বলে না, আর যে নাস্তি বলে সেও ঠিক বলে না।' দুজনের কথাই ঠিক হতে পারে যদি দুজনেই আপন আপন বক্তব্যের সঙ্গে অপেক্ষা যোগ করে দেয় আর বলে যে, এই দৃষ্টি-কোণ থেকে এটা হয় আর অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হয় না। স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি। যখন স্যাদস্তি বললেও কাজ হয় না আবার স্যান্নাস্তি বললেও কাজ হয় না। তখন স্যাদ্ অবক্তব্য বলা হয়। আমরা যেন একথা মেনে চলি যে সত্যের সম্পূর্ণ সত্যের স্বরূপ কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সত্যের প্রকৃতি এরকম, সত্যের স্বভাব এরকম, এ কথা বলা চলে না। আমরা যা করছি সেটি সত্যের অংশ মাত্র। এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, আমরা আমাদের দৃষ্ট অংশ মাত্র সত্য ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে অখণ্ড সত্যের প্রতি কখনও কখনও অন্যায় করে বসি। এ কথা মানা প্রয়োজন, তুমি শুধু বলবে যে পূর্ণ সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তা বোবার কণ্ঠস্বরের মত গূঢ় অপ্রকাশ্য। তার স্বাদ অবর্ণনীয়।

আমি এই বুঝি যে ভাষা প্রয়োগ না করা, মৌন থাকা সত্যের সুরক্ষার সবচেয়ে সুদৃঢ় এবং প্রবল উপায়। আমি মৌনের মূল্যই কিছুটা বর্ণনা করলাম। আমরা যেন মৌনের মূল্য বুঝি, যেন শুধু ভাষা প্রয়োগের মূল্যই না বুঝি। না বলারও যে মহৎ মূল্য আছে সেটা অনুভব করি, এবং বলা ও না বলার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করি। ভাষাপ্রয়োগবর্জন সন্নিহিত মহত্ত্ব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে

যেন বাক্‌গুপ্তিব তাৎপর্যও অনুভব কবি। এই দুটি দিক সমভাবে বুঝতে পাবলে এই সাধনার মর্ম গ্রহণ কবা সম্ভব হবে এবং নিজেব আন্তবিক জ্ঞানকে প্রকটিত কবা সম্ভব হবে।

৭

চিন্তাশূন্যতার মূল্য

জলাশযেব ধাবে গিযে কলসী ভবতি কবে জল নিযে আসে এমন বহু লোক পাওযা সম্ভব। নদী বা পুকুবেব পাডে গিযে তাবা যত খুশি জল নিযে আসে। কিন্তু নদীব গভীবে ডুব দিতে পাবে এমন লোক খুবই কম পাওযা যায। পুকুব বা সাগবেব গভীবতায ডুব দিতে পাবে এমন লোকেব সংখ্যা খুব কম। তীবে দাঁডিযে থাকাব লোকই মেলে অনেক বেশি।

চিন্তাব ঘডা হাতে এমন লোক বহু পাওযা যায। তাবা চেতনাব সামান্য পবিমাণ অংশ পেযেছে, এবং চিন্তা কবে, দেখে ও জেনে তা মনেব আধাবে সঞ্চয কবেছে। কিন্তু চেতনা-রূপ সমুদ্রে অবগাহনকাবী লোক মেলে খুবই কম। কাবও ডুব দেবাব সাহস হয না। তাদেব ভয হয পাছে তাবা তলিযে যায। ডুব দিতে বা তলদেশে নেমে যেতে তাদেব সাহসে কুলায না। কেউ সে সাহসই কবে না। যেখানে অনন্ত গভীবতা সেখানে যেতে তাবা ভয পায। আত্মাব অন্তহীন গভীবতায তথা অখণ্ড চেতনা-রূপ সাগবে ডুব দিতে সাহস কবে এমন লোক খুব কমই আছে। কিন্তু এ কথা নিছক সত্য যে তাতে ডুব না দিলে বাঞ্ছিত বস্তু পাওযা যায না। যে লোক সমুদ্রেব তীবে দাঁডিযে থাকে

সে পাড়ে বা আশপাশে যা পড়ে থাকে তাই পায়। নদী বা পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে অল্পবিস্তর জল পেতে পারে। সাগরতীরে যে দাঁড়িয়ে থাকে সে হয়তো কিছু ঝিনুক পেতে পারে, কিন্তু তার গভীরতর কোনও অনুভূতি সম্ভবপর নয়। সমুদ্রের তলদেশে যে সব মণিমুক্তা পড়ে আছে ডুব না দিলে তা পাওয়া যায় না। যার ডুব দেবার সাহস আছে, গভীর তলদেশে যাবার ধৈর্য আছে সে সত্যিসত্যিই কিছু না কিছু পেয়েছে। আমরা চিন্তার অর্থ বুঝি, চিন্তার কি মূল্য তাও বুঝি, আর চিন্তার ঘড়া হাতে নিয়ে নিজের কাজে চালিয়ে যাই। আমরা এক সীমা বেঁধে নিয়েছি যে যা কিছু সেই কলসীতে ধরে তাই সব কিছু। তারপরেও যে কিছু থাকতে পারে সে কথা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। প্রকৃতপক্ষে কল্পনা করা সম্ভবও নয়। যে মানুষ সীমার ভেতরে আবদ্ধ সে অসীমের নাগাল পায় না। সীমাই সীমা বেঁধে দেয় এবং অসীমের দিকে যেতে দেয় না। আমাদের বুদ্ধির এক সীমা আছে, তথা মনেরও এক সীমা আছে। কাজেই তারা আমাদের অসীমের দিকে নিয়ে যেতেপারে না। মনের দ্বারা যা জানা গিয়েছে, বুদ্ধির দ্বারা আমরা শুধু তাই জানতে পারি। যা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা গিয়েছে তাই মন দিয়ে জানতে পারি। যা স্থূল, ইন্দ্রিয় শুধু তাই জানতে পারে। শব্দ, রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ এই সব স্থূল বস্তুকে ইন্দ্রিয় জানতে পারে। এই সমস্ত বস্তুর আধারে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আধারে মন কিছুটা এগিয়ে যায়। ঐ সমস্ত কাঁচা মাল বা র-মেটিরিয়াল নিয়ে ইন্দ্রিয় কিছু কিছু তৈরি করে, বুদ্ধি তাতে কিছুটা সংযোগ করে, আর বিবেকও কিছুটা করে এবং নির্ণয়ও করে। এইখানেই আমাদের সীমানা সমাপ্ত, আমাদের গ্রহণ করার সীমানা সমাপ্ত। এই সব জ্ঞান কোন মতেই কোরা জ্ঞান নয়। আমরা কখন 'কোরা' জ্ঞান লাভ করতে পারি? 'কোরা' জ্ঞান কি করে লাভ করতে হয় তা আমরা জানিই না, কেননা, ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধির সীমার মধ্যে বিশুদ্ধ বলে কোন বস্তুই নেই। সব কিছুই মিশাল, সব কিছুই ভেজাল। যখনই কোন কিছু তাদের আওতায়

আসে অমনি মিশ্রণ শুরু হযে যায। বাগেব জল এসে তাতে মেলে, দ্বেষেব জল এসে তাতে মেলে, আবও নানা বকম মযলা এসে তাতে মেশে। কোথাব প্রিযতাব প্রভাব এসে সংযুক্ত হয, কোথাও বা অপ্রিযতাব ভাব জড়িত হয। কোথাও ইচ্ছা সংযুক্ত হয, কোথাও বা ঘৃণা এসে মেশে। এই চিন্তাব সীমাব মধ্যে আমবা চিন্তাকে খুবই মূল্য দিযে থাকি। কিন্তু তাকে আমবা যতটা মূল্যবান মনে কবি আসলে তা ততটা মূল্যবান নয। অচিন্তনেব মূল্য বুঝতে পাবি না বলে আমবা চিন্তাকে এত মূল্য দিযে থাকি। চিন্তা না কবা এবং বিচাব না কবাব মূল্য আমবা জানি না বলেই আমবা চিন্তা ও বিচাবেব অধিক মূল্য দিই, তাতে অধিক মহত্ত্ব আবোপ কবি। যেদিন আমবা অতল গভীবতাব মধ্যে ডুব দিতে পাবব সেদিন আমবা না চিন্তা কবব, না বিচাব কববাব অর্থাৎ অচিন্তনেব মূল্য বুঝতে পাবব, মহত্ত্ব অনুভব কবতে পাবব, সেদিন আমাদেব জীবনে বিবাট ঘটনা। ইন্দ্রিয, মন ও বুদ্ধিব সীমানা অতিক্রম কবে, পৃথিবীব গুরুত্বাকর্ষণকে অতিক্রম কবে যদি আমবা আকাশপথে এগিযে যাই তবে আমবা এক বিচিত্র ভাবহীনতাব অনুভূতি পাই। সেখানে ভাব নেই, উদ্বেগ নেই, সমযেব বন্ধনও নেই। সমযেব গতি সেখানে মন্থব হযে যায। আমবা এই বকম অবস্থিতিব মধ্যে চলে যাই। এই বকম অবস্থায আমবা অনুভব কবতে পাবি পৃথিবীব গুরুত্বাকর্ষণে আবদ্ধ মানুষেব চেযে ঐ আকর্ষণেব বন্ধন থেকে মুক্ত মানুষেব তফাৎ কত বেশি হতে পাবে।

আমবা যদি জীবনে অচিন্তনেব ক্ষণগুলি উপলব্ধি কবতে পাবি তবে বিচাবেব স্থিতি ও নির্বিচাবেব স্থিতিব, তথা চিন্তনেব ক্ষণ ও অচিন্তনেব ক্ষণগুলিব মধ্যে ব্যবধান কতটা তা বুঝতে পাবব। চিন্তনেব গুরুত্বাকর্ষণেব সীমা অতিক্রম না কবলে অচিন্তনেব মহত্ত্ব বোঝা সম্ভবপব হয না।

এই বন্ধন কিভাবে ছিন্ন কবা যায? এ এক মস্ত বড প্রশ্ন। আমবা গুরুত্বাকর্ষণেব পবিধি অতিক্রম কবে কিভাবে যেতে পাবি? কেননা আমবা শব্দ, রূপ ও শবীব দ্বাবা পবিবেষ্টিত হযে আছি। আমাদেব

চাবদিকে যা কিছু আছে সব শব্দময়, রূপময় বা আকাবময়। আমবা শব্দেব দ্বাবা এমনভাবে বেষ্টিত হয়ে আছি যে শব্দেব কাবাগাবেব প্রাচীব আমবা ভাঙ্গতে পাবি না। আমবা রূপেব দ্বাবা এমনভাবে পবিবৃত যে তাব পিঞ্জব থেকে আমবা কোন মতেই মুক্তি পেতে পাবি না। বাঁধন এত কঠিনভাবে গেড়ে বসেছে যে বেবিয়ে আসাব কোনও পথই খোলা নেই বা তাব কোনও সুযোগও নেই। আমাদেব চাবপাশে শব্দ আব শব্দ, কোলাহল আব কোলাহল, আকাবেব জটিলতাব পব জটিলতা, আকৃতিব পব আকৃতি কেবল ঘুবে ফিবে বেড়াচ্ছে। এই সব শব্দ, রূপ আব আকৃতি আমাদেব এমন অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়েছে যে শবীব ছাড়া আব কোনও কিছু আমাদেব চোখেই পড়ে না। শবীব স্বয়ং এক আকাব। আমবা তাব মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমবা শুধু শবীবই দেখতে পাই। তাব বাইবে কোনও কিছুই আমবা দেখতে পাই না। শবীবেব সঙ্গে প্রাণ, প্রাণেব সঙ্গে মন, আব মনেব সঙ্গে বুদ্ধি সংযুক্ত হয়ে আছে। তাব ফলে এমন এক বলয় বা বৃত্ত তৈবি হয়েছে যাব বাইবে যাবাব কোনও পথই আমাদেব নেই। সুতবাং আমবা ঐ বলয়েব মধ্যেই ঘুবতে ফিবতে থাকি। কখনও বুদ্ধি থেকে মনে চলে আসি, কখনও বা মন থেকে ইন্দ্রিয়ে চলে আসি, কখনও ইন্দ্রিয় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে শবীবে যাই। আবাব উল্টো পথে আমাদেব যাত্রা শুরু হয়। শবীব থেকে প্রাণে পৌঁছই, প্রাণ থেকে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় থেকে মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে ফিবে আসি। এই ভাবে বলয়েব সঙ্গে সঙ্গে আমবা ঘুবতে ফিবতে থাকি, আব এই বলয়েব কোন আদিও নেই, অন্তও নেই। তাব কোনও বেবোনব পথ নেই, কোথাও ফাঁক নেই। কেবল চক্কব দিতে থাকে, বন বন কবে পাক খেতে থাকে। কলুব বলদেব মত ঘানিব চাব দিকে পাক খেতে থাকাই আমাদেব কাজ হয়ে পড়ে। এই চক্র ভেদ না কবা পর্যন্ত অচিন্তন্ সম্বন্ধে কোনও কথাই আমাদেব বোধগম্য হতে পাবে না। অচিন্তনেব কথা বোধগম্য না হলে শুদ্ধ চেতনাব গূঢ় অর্থ বোধ হয় না, আত্মাকে জানা বা তাব

পবিচয পাওয়া সম্ভবপব হয় না। আত্মাকে ঘিবে হাজাব হাজাব তর্ক বচিত হযেছে। আস্তিকগণ তাব অস্তিত্ব সমর্থনে বহু যুক্তি উপস্থিত কবে, আবাব নাস্তিকবাও ঐ সব যুক্তিব খণ্ডনে বহু তর্কেব অবতাবণা কবে। মনে হয় উভয পক্ষই নিজ নিজ প্রচেষ্টায অসফল হযেছে। অস্তিকও তাব তর্ক দ্বাবা আত্মাব অস্তিত্ব প্রমাণ কবতে পাবে নি, আবাব নাস্তিকও তার তর্ক দ্বাবা আত্মাব অনস্তিত্ব প্রমাণ কবতে সক্ষম হয নি। ঐ বেঁচাবাবা চিন্তাব চক্রেব মধ্যেই পাক খাচ্ছে। তাবা সেই চিন্তাব বলয়েব মধ্যে ঘুবতে থাকে, যেখানে কখনও আত্মাব উপলব্ধি হয় না। যেখানে যা নেই সেখানে তা খোঁজা বৃথা। সেখানে তাকে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ প্রমাণ কবাব প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয। সেখানে তাকে স্থাপিত কবাও সম্ভব নয, উত্থাপন কবাও সম্ভব নয। যদি কোনও ব্যক্তি ঐ চিন্তনেব উর্ধ্বে, ঐ শব্দজালেব, তর্কেব তথা চিন্তনেব উর্ধ্বে উঠে আত্মাকে সিদ্ধ কবাব প্রযত্ন কবতে চায তবে সে কখনও অসফল হয না। সত্যি সত্যিই আত্মাব স্থাপনা ও উত্থাপনা সেই সব ব্যক্তিবই ঘোষণা, যাঁবা শব্দ আব রূপ থেকে ওপাবে উঠতে পেবেছেন, যাঁবা ঐ বলযকে বিদীর্ণ কবে বেবিযে আসতে পেবেছেন। যে লোক শব্দ আব রূপেব জালে আবদ্ধ থাকে সে লোক কখনও আত্মাকে জানতে পাবে না বা তাব পবিচয পায না। সে তাব স্থাপনাও কবতে পাবে না, উত্থাপনাও কবতে সক্ষম হয না।।

কথাটি খুব জটিলতাপূর্ণ। আমাদেব সামনে যা কিছু আছে সে সবই সাকাব। যাব আকাব নেই তাকে আমবা দেখতে পাই না। যা মূর্ত বা মূর্তিবিশিষ্ট তাই আমাদেব চোখেব সামনে আছে। যা অমূর্ত তা আমাদেব দেখাই দেয না। আমবা কি কবে জানব অমূর্ত কি, অনাকাব কি? সে কি অখণ্ড চেতনা? সে কি আত্মা? কেমন কবে তা জানব? তা জানাব কি উপায আমাব কাছে আছে? উপায আছে। এই দুনিযাতে কোন কিছুই নিরুপায নয। নিরুপায বলে কোনও কিছু হতেই পাবে না। দইয়েব মধ্যে ঘি থাকে। মানুষ

উপায় বের করেছে। তাতে ঘোল আলাদা হয়ে যায়, আর মাখনও আলাদা হয়ে যায়। ফুলে সুগন্ধ আছে। মানুষ উপায় বের করেছে। তাতে সুগন্ধ আলাদা হয়ে যায়, ফুলও আলাদা থেকে যায়। আতর তৈরি হয়, সুগন্ধি পদার্থ তৈরি হয়। মানুষ আলাদা করতে, বিশ্লেষণ করতে জানে। মানুষ এও জানে যে আত্মাকে শরীর থেকে আলাদা করা যেতে পারে, শরীরকে চেতনা থেকে আলাদা করা যেতে পারে। এই নশ্বর থেকে অনশ্বর বা পরম তত্ত্বকে আলাদা করা যায়। তার উপায় আছে। উপায়ের কথা বলাও হয়েছে। নিজেকে দেখারও উপায় আছে। মানুষ নিজের মুখ দেখতে পায় না। তার উপায় বের হয়েছে। তার সামনে আয়না এসেছে। তাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আয়নাতে মানুষ নিজের মুখ দেখে না, শুধু তার প্রতিবিম্ব দেখে। মানুষ আয়নাও দেখে না, নিজের মুখও দেখে না। সে কেবল প্রতিবিম্ব দেখে। প্রতিবিম্ব তাকে বিশ্বাস করায় যে তার মুখ দেখতে ঐ রকম। প্রতিবিম্ব থেকে সে তার মুখের পরিচয় পায়। প্রতিবিম্ব দ্বারাই তার আত্মাকে জানা সম্ভব হতে পারে। আমরা আকাশ দেখতে পাই না, কারণ আকাশ অমূর্ত। কিন্তু তাকে দেখারও উপায় আছে। যে লোক ছায়া-পুরুষের সাধনা করে সে সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়াকে দেখে থাকে। নিজের ছায়া দেখতে দেখতে তার এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে কিছুক্ষণ পরে যেমনই সে নিজের ছায়ার ওপরে ধ্যান কেন্দ্রিত করে এবং চোখ বন্ধ করে, আর তার পরে আকাশের দিকে তাকায় সে আকাশপটে হুবহু নিজের আকার দেখতে আরম্ভ করে। ছায়া-পুরুষ এমন এক দর্পণে পরিণত হয় যে আমরা ঐ প্রতিবিম্ব দ্বারা আকাশকেও দেখতে সক্ষম হই।

আত্মাকেও দেখা সম্ভব হতে পারে। তাকে দেখার উপায় হচ্ছে অচিন্তন, চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া, শব্দ থেকে মুক্ত হওয়া, রূপ থেকে মুক্ত হওয়া। তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? হ্যাঁ, তা সম্ভব। করার সাধনা প্রেক্ষা ধ্যানের দ্বারা করা যেতে পারে। নিজেকে

নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া যায়, 'দেখ আর জান'। সুষ্ঠুভাবে দেখ আর জান। তার সঙ্গে রাগ জুড়ে দিও না, দ্বেষ জুড়ে দিও না, প্রিয়-অপ্রিয় বোধও যোগ কোর না, যে জিনিস যেমন তাকে সেই রকম দেখবে। দেখার ক্রিয়া আর জানার ক্রিয়া—এগুলি আত্মার প্রতিবিম্ব। এ হল এক দর্পণ যাতে আত্মাকে দেখা যেতে পারে। এই প্রতিবিম্ব দ্বারা মানুষ আত্মার নাগাল পেতে পারে। জানা ও দেখাই হল আত্মার স্বরূপ। কেবল জানা আর দেখা। যে শুধু জানে আর দেখে, আর কিছুই করে না সেই আত্মার নাগাল পায়। আত্মাকে লাভ করার প্রকৃষ্ট মাধ্যম জ্ঞান ও দর্শন, অর্থাৎ জানা ও দেখা। শুধু জানা আর দেখা, তার সঙ্গে আর কিছু সংযুক্ত না করা। অন্য কিছুর সংযোগ করলেই মনের পরিধির ভিতরে ময়লা জমতে থাকে।

আপনি একটি ফুল দেখছেন, তার মিষ্টি সুগন্ধে আপনার মন লুব্ধ হয়েছে। আপনার মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। আপনার জানা ও দেখা মনের সীমার অন্তর্গত হয়েছে। যে জিনিস যেমন শুধু তাই জানছেন না, তার প্রিয়তাকে জানছেন। আপনি তার আকর্ষণে আবদ্ধ হয়েছেন এবং আপনার জানা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা সব সময় জানা ও দেখার সীমার মধ্যে থাকি না, আরও অন্য জিনিসের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। যেখানেই বন্ধন তৈরি হয় সেখানেই আমরা আত্মা থেকে দূরে চলে যাই। যেখানে বিশুদ্ধ জানা ও দেখা ঘটে, সেখানেই তার সমাপ্তি ঘটে। যখন আমার শব্দের ওপরে উঠে যাই তখনই আমাদের আত্মার ঝলক বা জ্যোতির দর্শন ঘটে, আর ঐ ঝলক আমাদের নির্বিচারতার দিকে প্রেরণা দেয়। আত্মার ঝলক দর্শন না হলে নির্বিচারতার স্থিতি হতে পারে না। আত্মদর্শন ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়।

পিণ্ডস্থ ধ্যানে শরীর ধ্যেয় হয়ে থাকে। পদস্থ ধ্যানে শব্দ ধ্যেয়, রূপস্থ ধ্যানে আকার ধ্যেয়। এই সব ধ্যানের ধ্যেয় আছে। চতুর্থ ধ্যান হল রূপাতীত ধ্যান। যেখানে রূপাতীত, ভাবাতীত স্থিতি লাভ ঘটে

সেখানে কোনও ধ্যেয থাকে না। চিন্তনেব ধ্যানই হচ্ছে ধ্যান, আব নির্বিচাবতাই বাস্তবে সমাধি।

জৈন পবম্পবায দুটি শব্দ প্রচলিত আছে—ধ্যান ও সামাযিক। সামাযিকও ধ্যান, কিন্তু তা এ ধ্যান থেকে অনেকটা ভিন্ন। কেননা, ধ্যানে দ্বিতীয কাবও সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হযে থাকে। যখনই আমি বলি ধ্যান কব, তখনই প্রশ্ন হয, কাব ধ্যান কবব? কিভাবে কবব? কোথায কবব? কে কববে? ধ্যাতা আব ধ্যেয আলাদা হযে যায, ধ্যান পদ্ধতিও আলাদা হযে যায এবং ধ্যানেব সাধনাও ভিন্ন হযে যায। ঐ সব কর্তা কর্ম আধাব সংই ভিন্ন ভিন্ন হযে পড়ে। আপনি হযতো জিজ্ঞাসা কববেন, কাব ধ্যান কবব? তখন বলতে হবে, এব ধ্যান করুন বা অমুক আকৃতিব ধ্যান করুন, অথবা অমুক শব্দেব ধ্যান করুন। ধ্যেয বলে দিতে হয। কোনও ধ্যেযেব নির্দেশ না দেওযা পর্যন্ত আপনি ধ্যান কবতে পাববেন না। কিন্তু নির্বিচাবতায স্থিতি হলে এই সমস্ত প্রশ্নেব সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীযেব সমাপ্তি হযে যায। দ্বিতীয পক্ষ বলে আব কিছু থাকে না। তখন ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয আব আলাদা থাকে না। যে ধ্যাতা, সেই ধ্যান, সেই ধ্যেয, সেই ধ্যানেব সাধনা, আবাব সেই ধ্যানেব আধাব হযে থাকে। সব কাবক এক হযে যায। সব কাবকেব সমাপ্তি ঘটে। ভেদেব অবসান হয, অভেদ প্রাপ্তি হয।

নির্বিচাবতাব স্থিতিতে কেবল সামাযিক হযে থাকে। সামাযিকেব অর্থ, সমযেব মধ্যে হওযা। সমযেব এক অর্থ আত্মা। আত্মাতে স্থিত হওযাই সামাযিক। যে অবস্থা হলে এই স্থিতি হয সে অবস্থা উপস্থিত হলে সব স্থিতিব পবিসমাপ্তি ঘটে।

ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা কবা হযেছিল, 'ভন্তে, কে সামাই-এ? কে সামাইযস্স অটঠে?' [সামাযিক কি? সামাযিকেব অর্থ কি?]

ভগবান বলেছিলেন—'আযা খলু সামাই-ত্র। আযা সামাইযস্স অটঠে।' ['গৌতম! আত্মাই সামাযিক। আত্মাই সামাযিকেব অর্থ।']

সামাযিকেব অর্থ আত্মায স্থিত হওযা। তথা নিজেব মধ্যে স্থিত

হওযা। যেখানে নিজেব মধ্যে স্থিত হওযাব কথা সেখানে ধ্যান কবাব কথা গৌণ হযে যায। সামাযিকে আমবা কাবও ধ্যান কবি না, কেবল নিজেব অস্তিত্বেব মধ্যে নিমগ্ন থাকি। আব তাই হল নির্বিচাবতাব স্থিতি। যতক্ষণ আমবা নিজেব মধ্যে না হই ততক্ষণ আমবা নির্বিচাবতাব কল্পনা কবতে সমর্থ হই না, নির্বিচাব হতে পাবি না। প্রকাবান্তবে বলতে হয, কোনও না কোনও বিচাব আমাদেব ঘিবে থাকে, বিচাবেব দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যে আত্মায স্থিতি থাকে সে শুধু জানা ও দেখাব কাজ কবে, আব কিছুই কবে না। ঐ স্থিতিতে সামাযিক হয আব নির্বিচাবতা আসে। আমবা যদি নির্বিচাব ধ্যানকে সামাযিক বলি তবে খুব ভাল হয। শব্দেব এই প্রযোগ অতিশয় সুষ্ঠু। ভগবানই এ শব্দেব প্রযোগ কবে গিযেছেন। তাই 'সামাযিক' কথাটিব ব্যবহাব ন্যায্য।

এক ব্যক্তি মুনিব কাছে এসে বলল, 'সংসাবে অনেক বকম দুঃখ আছে। সে সব দুঃখ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওযা যায। আপনি তাব উপায বলে দিন।' সাধু বললেন, 'দেখ, এ প্রশ্ন বড কঠিন। তুমি যখন জিজ্ঞাসা কবেই ফেলেছ তখন উত্তব দিতেই হবে। তা না হলে উত্তব দিতাম না। এ প্রশ্ন খুবই জটিল। তোমাকে একটি উপায বাতলে দিচ্ছি। যাও, এমন একজন লোকেব অঙ্গবাখা নিযে এস যাকে জীবনে কখনও দুঃখ স্পর্শ কবে নি। তাব সেই অঙ্গবাখা গাযে দাও, তোমাব সব দুঃখ দূব হবে।'

সেই লোকটি বলল, 'আপনি খুব সোজা উপায বলে দিলেন। আমি ঘুবে ঘুবে অঙ্গবাখা যোগাড কবব। কোনও দিন দুঃখ অনুভব কবে নি এমন লোক মিলবেই।'

সে নিজেব বাডি থেকে বেব হল। সবাব আগে সে পাশেব বাডিতে গেল। গৃহস্বামীকে বলল, 'আমি তোমাব জামা নিতে এসেছি। কিন্তু জামা দেওযাব আগে তুমি আমাকে বল, তোমাব জীবনে কখনও দুঃখ এসেছে কিনা।' গৃহস্বামী বলল—'এই দুনিযায বেঁচে থাকব অথচ

দুঃখ হবে না—এ কি বকম কথা বলছ ? এই দুনিযাতে এমন কোন লোক বেঁচে আছে যে জীবনে কোন দুঃখ অনুভব কবে নি ? আমি তো খুব দুঃখী। আমাব অনেক টাকা আছে কিন্তু ছেলে নেই। এ কি দুঃখ নয ? এ তো খুবই বড দুঃখ।'

সেই লোকটি বলল, 'তোমাব জামা আমি চাই না।' সে আব একটি বাডিতে গেল। জিজ্ঞাসা কবল, 'তোমাব তো কোনও দুঃখ নেই।' গৃহস্বামী বলল, 'তুমি দুঃখেব কথা জিজ্ঞাসা কবছ ? এই ভাঙ্গা চোবা বাডি, ফুটো বাসনপত্র। এই ফাটাছেঁডা কাপডচোপড। এব পবেও জিজ্ঞাসা কবছ আমাব দুঃখ আছে কিনা ? আমি অত্যন্ত দুঃখী।'

সেই লোকটি বলল, 'বড বাডি দেখে গেলাম সেখানেও দুঃখ, আবাব ছোট বাডি দেখে গেলাম সেখানেও দুঃখ।'

সে আব এক বাডিতে গেল। জিজ্ঞাসা কবল, 'তোমাব কোন দুঃখ নেই তো ?' সে বলল, 'সংসাবে থাকব আব দুঃখ থাকবে, না তাও কি সম্ভব ? বোজ বোজ আমাব স্ত্রীব সঙ্গে ঝগডা, কলহ হয। আমি দুঃখী।'

সে সেখান থেকেও ফিবে আসে। সে ঘুবতেই থাকে। অনেক দিন, অনেক মাস সে ঘুবে বেডায। গাঁযে গাঁযে ঘুবে বেডায। তাব সঙ্কল্প ছিল যে সেই অঙ্গবাখা পেতেই হবে এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পেতেই হবে। ঘুবতে ঘুবতে সে ক্লান্ত হযে পডল। তাব মন নিবাশায ভবে গেল। 'আমি দুঃখী নই' এ কথা বলতে পাবে এমন লোক সে একটিও খুঁজে পেল না। ধনবান লোকও দুঃখী, গবীব লোকও দুঃখী। যাব সন্তান আছে সেও দুঃখী, যাব সন্তান নেই সেও দুঃখী। সে ক্লান্ত হল, হযবাণ হল। অসফল হযে সে গুরুব কাছে গেল এবং বলল, 'মহাবাজ, ঐ অঙ্গবাখা তো পাওযা গেল না। আমি তো মনে কবেছিলাম একদিন না একদিন আমি সফলকাম হবই। কিন্তু আমি মাসেব পব মাস বৃথাই চেষ্টা কবলাম। শেষ পর্যন্ত অসফল হযে আপনাব কাছে ফিবে এলাম। এমন লোক পেলাম না যে বলতে পাবে সে সুখী আব

যাব জামা পবে আমি দুঃখ থেকে মুক্তি পাব।'

গুরু বললেন, 'কত বড মুর্খ তুমি। তুমি এই সত্য জান না যে এই দুনিযায় যে জন্মেছে সে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না।'

সে তখন বলল, 'গুরুদেব। আপনি যখন এ সত্য জানতেন তখন কেন শুধু শুধু ঘুবিযে হযবাণ কবলেন? প্রথম দিনই তো এ কথা বলতে পাবতেন। আপনিই তো আমাকে মাসেব পব মাস ঘুবিযে মাবলেন। কেন এ বকম কবলেন?'

গুরু বললেন, 'সত্য দুষ্পাচ্য। কঠিন পবিশ্রম ছাডা সত্য পবিপাক হয না। আমি যদি প্রথমেই বলতাম যে এই দুনিযায যে-ই জন্মেছে সে-ই দুঃখ থেকে বাঁচতে পাবে না, দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না, তাহলে সেই সত্য তোমাব বোধগম্য হতো না। এখন তুমি অনেক জাযগায ঘুবে এসেছ, অনেক কষ্ট কবেই ঘুবেছ। এবা। তুমি এই সত্য সহজেই বুঝতে পাববে যে এই দুনিযাতে কোনও লোকই দুঃখেব স্পর্শ থেকে বাঁচতে পাবে না। ঐ সত্য এতই অপাচ্য, এতই দুষ্পাচ্য যে প্রথম ক্ষণেই তা পবিপাক কবা সম্ভব হতো না।'

অনেক লোক জিজ্ঞাসা কবে—'নির্বিচাব কিভাবে হবে?' আমি যদি প্রথম দিনেই বলে দিতাম যে এইভাবে নির্বিচাব হতে পাবে তবে ঐ সত্য তোমাব পবিপাক হতো না। তোমাব বোধগম্য হতো না। প্রথমে তো তোমাকে জামাব খোঁজ কবতে হতো। ঘুবে ঘুবে বেডাতে হতো, বাডিতে বাডিতে গ্রামে গ্রামে যেতে হতো। সব কিছু দেখতে হতো। সব কিছু দেখে, চিন্তনেব সম্পুর্ণ প্রক্রিযাব পবে, বিচাবেব পথ সম্পূর্ণ অতিক্রম কবে, বিচাবেব ক্রিযা সম্পূর্ণ হলে এ কথা বুঝতে পাববে যে নির্বিচাবতাবও মূল্য আছে, আব এই ভাবেই নির্বিচাব হওযা যায। যত দিন পর্যন্ত এই বকম না হবে, যত দিন পর্যন্ত চিন্তনেব পবিক্রমা সম্পুর্ণ না হবে, যত দিন বিচাবেব পথে যাত্রা সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন অচিন্তনেব কথা, চিন্তা না কবাব কথা তোমাব বোধগম্য হবে না, আব তাব মূল্যও তুমি বুঝতে পাববে না।

এই দুনিযায যাবা বাস কবে, যাবা শবীব, প্রাণ, মন আব বুদ্ধিব সীমাব মধ্যে বাস কবে তাবা কেউ নির্বিচাব হতে পাবে না। কাবণ মোহ, মাযা ও মমতাব সীমাব মধ্যে যাবা জীবন ধাবণ কবে তাবা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয় না। সেই রকম বুদ্ধিব ও শবীবেব গণ্ডিব মধ্যে যাবা বাস কবে তাবা কেউ বিচাব থেকে মুক্ত হতে পাবে না। এই হল পবম সত্য। এই সত্য তখনই আমবা উপলব্ধি কবতে পাবব যখন আমবা অঙ্গবাখাব সন্ধানে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুবে বেড়াব, বিচাবেব যাত্রা সম্পূর্ণ কবব, আব চিন্তনেব সম্পূর্ণ সম্পর্ক বুঝতে পাবব। তখনই এই কথা আমাদেব বোধগম্য হবে, তখনই আমবা এই সত্য জানতে পাবব, পবিচয কবতে পাবব, পবিপাক কবতে পাবব।

অচিন্তন ও নির্বিচাবতাব কথা বড়ই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয, কেন না আমবা সর্বদাই চিন্তনেব মধ্যে বেঁচে থাকি, আব তাব মধ্যেই জীবনকে অনুভব কবি। কিন্তু যখন আমাদেব সামনে অচিন্তনেব কথা, চিন্তা না কবাব কথা, বিচাবশূন্যতাব কথা হতে থাকে তখন সহজেই একটি আকর্ষণ সৃষ্ট হয এবং আমাদেব মনে হয ঐ ভাবে জীবন যাপনই শ্রেয। এ এক অভিনব ব্যাপাব। এও কি সম্ভব ? লোকে চিন্তা আব বিচাব বাদ দিযে জীবন যাপন কবতে পাবে, এ আবাব কি বকম কথা ? বিচাবেব প্রবাহ এত প্রবল আব তাব শৃঙ্খল এত দীর্ঘ যে কেউ তা ভাঙ্গতে বা ছিঁড়তে পাবে না। একেব পর এক বিচাব আসে যায। কখনও তাব প্রবাহ রুদ্ধ হয না। সে সদা সর্বদা গতিশীল। তাব কোনও শেষ নেই। এই বকম পবিস্থিতিতে এটা কি সম্ভব, এই নির্বিচাবতাব কথা লোকে চিন্তা কবতে পাবে এবং সেই অনুসাবে জীবন যাপন কবতে পাবে ? এ প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ। এ বকম প্রশ্নও হয এবং আকর্ষণও সৃষ্ট হয। এই আকর্ষণেব আধাবে এ দিকে যত্নবান হই।

চিন্তনেব চেযে অচিন্তনেব মূল্য অনেক বেশি। এ কথাটি খুবই অর্থপূর্ণ। আমবা এ কথা জানি যে বেশি ভাবা বা চিন্তা কবা শুধু শক্তি ক্ষয কবা। প্রত্যেক কর্ম ও প্রবৃত্তি শক্তিকে ক্ষীণ কবে।

শরীরের কর্ম, বাণীর কর্ম, মনের কর্ম, চিন্তনের কর্ম ইত্যাদি প্রত্যেকে কর্মশক্তি হ্রাস করে। শরীরশাস্ত্রী বলেন যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহে বিষ উৎপাদিত হয়, শক্তি ক্ষীণ হয়। যে লোক বেশি চিন্তা করে তার রোগ হয়, মানসিক বিকৃতি ঘটে। বুদ্ধিজীবীদের শরীর বেশি পরিমাণে খারাপ হয়। তারা পেটের রোগে আক্রান্ত হয়। তার কারণ তারা অধিক ভাবে, অধিক চিন্তা করে। চিন্তা শরীরের ধর্ম হতে পারে। কিন্তু শরীরের ধর্ম হলেও তার একটা সীমা আছে। সীমার অধিক চেষ্টাও হানিকারক হয়ে থাকে।

অচিন্তন শরীরের ধর্ম নয়। অচিন্তন শব্দ ও রূপের কার্যও নয়। তা আত্মার ধর্ম, তার স্বভাব। যা স্বভাব তার দ্বারা শক্তি ক্ষয় হয় না। অচিন্তন আমাদের স্বভাব। আমরা অচিন্তনের অবস্থায় যখনই উপনীত হই বা থাকি তাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হতে পারে না। তাতে শক্তি বৃদ্ধি পাবে। চিন্তাতে ওজঃশক্তি নিঃশেষিত হয়, কারণ চিন্তার জন্য ওজঃশক্তির প্রয়োজন, ইন্ধনের প্রয়োজন। যাতে ইন্ধনের প্রয়োজন হয় তাতে ইন্ধন নিঃশেষিত হয়। অচিন্তনের জন্য প্রাণীজ ওজঃশক্তির কোন প্রয়োজন নেই। তার কারণ তা আত্মার স্বভাব, অখণ্ড চেতনার সহজ ধর্ম। এই কারণে তাকে জানা ও দেখার মধ্যে স্থিতি আছে। তার জন্য কোনও শক্তির অপব্যয় হয় না। ঐ সময় আমরা আপন মূল স্বভাবে অবস্থান করি।

চিন্তনের কাজ হল শক্তি ব্যয় করা। অচিন্তনের অবস্থার স্থিতিতে আমাদের শক্তি বাড়ে, কমে না। অচিন্তনে শক্তির বিস্ফোরণ হয়। আমাদের জানার শক্তি এত বেড়ে যায় যে চিন্তনের দ্বারা অতটা জানার ক্ষমতাও হয় না, জানতেও পারি না। আমাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। চিন্তনের দ্বারা সেইটুকু জানতে পারি যা আমাদের জানার সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সীমার মধ্যে জানা সম্ভব হয়। জানার সীমার মধ্যে অবস্থিত নয় এমন বস্তুও অচিন্তনের দ্বারা আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়। তার দ্বারা দূরবর্তী বা ব্যবস্থিত বস্তুকেও জানা সম্ভব হয়, আবার

সূক্ষ্ম বস্তুকেও জানা সম্ভব হয়। এ সবই অচিন্তনের দ্বারা সম্ভব হয়। বস্তুত অচিন্তন খুবই মূল্যবান। তার মহত্ত্ব বুঝতে পারি। আমরা তার মূল্য নিরূপণও করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা কি করে অচিন্তনের স্থিতিতে পৌঁছতে পারি। এখনই আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। এখনই নির্বিচারের কথা ভাববেন না। প্রথমে অভ্যাস করতে আরম্ভ করুন। ধ্যেয় নির্বাচন করুন এবং ঐ ধ্যেয়ের সঙ্গে চলতে থাকুন। এই ভাবে আপনার মনকে এক অভ্যাস দিন। ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা আপনি উত্তীর্ণ হতে পারবেন, চলতে পারবেন। চলতে চলতে এমন অবস্থা আসবে যখন আপনার একাগ্রতা সাধিত হবে। আপনার অভ্যাস পরিপক্কতা লাভ করবে, আর আপনি অপ্রিয়তা ও প্রিয়তার মঞ্জিল খানিকটা পার হয়ে যাবেন। আপনি কেবল জানা এবং দেখার ক্ষমতা আয়ত্ত করবেন। এই অবস্থায় নির্বিচারতার কথা সহজে বোধগম্য হবে।

আমি শুরুতেই বলেছিলাম, লোকে যা দেখে তা ভাবে না, যা ভাবে তা দেখে না। দেখা ও ভাবা—এ দুটি একই সঙ্গে চলতে পারে না। যে জানে সে বিচার করে না। আর যে বিচার করে সে জানে না। ভাবা, দেখা, বিচার করা—এ সবই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, মস্তিষ্কের ক্রিয়া। এ সবই মস্তিষ্কের মাধ্যমে ঘটে।

দেখা ও জানা—এ যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়। এ অখণ্ড চেতনার ক্রিয়া এবং স্বভাবত স্ফূর্ত হয়। এর উৎস বা উদ্গমস্থল অখণ্ড চেতনা, আত্মা। এ যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়, মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয়, এমন কি মনোদৈহিক ক্রিয়াও নয়। এর ফলে আমরা অখণ্ড চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, তাতে ডুব দিই। এতে বিপদ হতে পারে। যার বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এসে যায় এবং যে মরতে সাহস সংগ্রহ করতে পারে সে-ই এ পথে অগ্রসর হতে পারে। যে মানুষ নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে চায় তাকে সবার আগে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হবে। মরণের জন্য তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অচিন্তনের কথা উঠতেই পারে না।

কোন কোন লোক ভয় পেযে যায। ধ্যানেব গভীবতায যায, তখন এক প্রকার বিচিত্র অনুভূতি হতে থাকে। তাবা ভয পেযে ধ্যান ছেডে দেয়। জিজ্ঞাসা কবলে বলে, 'ধ্যানেব গভীবতাব মধ্যে গিযেছিলাম। মনে হল যেন হৃদপিণ্ডেব স্পন্দন বন্ধ হযে গিযেছে।' এমন লোক অচিন্তনেব মধ্যে ডুব দিতে পাবে না।

আচার্য ভিক্ষু মহান সাধক ছিলেন। তাঁব সামনে এক লক্ষ্য ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীমজ্জযাচার্য লিখেছেন, 'মবণেব ধাব শোধ চেযে নাও।' আচার্য ভিক্ষু মৃত্যুব জন্য' প্রস্তুত হযে শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হলেন। মবণেব কথা না ভাবলে কোন লোক শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হতে পাবেন না। শুদ্ধ মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওযাব মার্গ অনেক পাওযা যায়। যে ব্যক্তি মৃত্যুব জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হযেছে সে-ই শুধু শুদ্ধ মার্গে পৌছনোব পথ খুঁজে পায। সে এত সাহস সঞ্চয কবেছে যে তাব বেঁচে থাকাব আকাঙ্ক্ষাও নেই, মবণেব ভযও নেই। ঐ লোক নির্বিচাবতাব স্থিতিতে পৌছতে আব চেতনাব অতল গভীবতায ডুব দিতে সক্ষম। ঐ ব্যক্তিব অখণ্ড চেতনাব ৰূপসাগবে ডুব দেওযাব অধিকাব আছে, তাব জন্য আমবা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হযে না যেন ভাবাব ভূমিকায যাই, অচিন্তনেব ভূমিকায যাই। ৰূপ এবং আকৃতিব সীমা অতিক্রম কবে সেই স্থিতিতে চলে যাই যেখানে কোন শব্দ আমাদেব প্রভাবিত কবে না।

ধ্যান শব্দকে প্রভাবিত কবে। বাজর্ষি প্রসন্নচন্দ্র ধ্যানস্থ অবস্থায দণ্ডাযমান ছিলেন। একটি লোক এল। তাকে একটি কথা বলে রাজর্ষি বাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন। বাজ্যেব ভাব ছেলেকে দিলেন। ছেলে খুবই ছোট ছিল। এই ছোট ছেলেব কাঁধে বাজ্যেব বিবাট ভাব পড়ল। শত্রুবা বাজ্য আক্রমণ কবল। তাবা বাজ্য ধ্বংস কবতে শুরু কবল। তাতে অনেক শব্দ হল। কোনও ঘটনাই ঘটে নি। বাজর্ষি শুনলেন। শব্দ তাঁকে এতই প্রভাবিত কবল যে ধ্যানে দণ্ডায়মান হযেই তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যুদ্ধ আবম্ভ হযে গেল, তিনি

শত্রুকে পরাস্ত করতে লাগলেন। এই সময়ে এক লোক এল এবং ধ্যানস্থ রাজর্ষিকে দেখে বলল, 'কত বড ধ্যানী! কত বড় ধ্যানী! কত বড সাধক! অচল ধ্যানমুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছেন।' রাজর্ষি এ কথা শুনলেন, তাঁর চেতনা মোড নিল। যুদ্ধভূমি থেকে ধ্যানভূমিতে ফিরে এলেন। আবার ধ্যানের ধারা অখণ্ড প্রবাহে বইতে লাগল।

শব্দের পরিধির মধ্যে গতিশীল ধ্যান শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধ্যাতা কখনও লডাই করতে লেগে যায়, কখনও বা আত্মসাধনার কথা ভাবতে লেগে যায়। সে রূপের দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

অচিন্তনের স্থিতিতে যে প্রতিষ্ঠিত, সামায়িকে যে অবস্থান করে, যে আপন আত্মায় স্থিত, সে কখনও শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কখনও রূপের প্রভাবাধীন হয় না। তার শরীরের অভ্যাস হয় না, জীবনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মৃত্যুর ভয় থাকে না। সে সব কিছুর অতীত হয়। পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ অতিক্রম করে তার আত্মা অন্তরীক্ষে চলে যায়। সেখানে তার ভাবের কোনও অনুভূতি হয় না।

লাড়নু শিবির

(২ মার্চ, ১৯৭৬ থেকে ১১ মার্চ, ১৯৭৬)

রাজলদেসর শিবির

(১ জানুয়ারি, ১৯৭৭ থেকে ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৭)

৮

শরীর পরিচয়

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে মস্তিকের জ্ঞান আবশ্যক। মস্তিষ্কের জ্ঞান না থাকলে অনেক সাধনা সত্ত্বেও সাধক যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারেন না।

মস্তিষ্ক তিন ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের গঠন অত্যন্ত জটিল। তা অসংখ্য প্রকোষ্ঠ দ্বারা রচিত এবং তার যন্ত্রপ্রণালী এত জটিল ও দুরূহ যে আজ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় নি। বহুদিন ধরে এ বিষয়ে গবেষণা চলছে। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু আজও এর কার্যপ্রণালী রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। মস্তিষ্ক মানুষের সকল মনোবৃত্তি ও সংস্কারের মূল কেন্দ্র। শরীরশাস্ত্রীগণ অনেক কেন্দ্রের সন্ধান পেয়েছেন। সংবেদন, জ্ঞান, বাসনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রের সূক্ষ্মতাও এখন আমাদের বিদিত। তাদের চিকিৎসা, এমন কি তাদের পরিবর্তনও করা হয়।

আমাদের মস্তিষ্কে দুই প্রকার পদার্থ ও বর্ণ পাওয়া যায়। এক রকম দ্রব্য ধূসর বা হালকা হলুদ বর্ণের। তা বুদ্ধির ধারক। যে লোকের

ধূসব বস্তু অধিক পবিমাণে থাকে তাব জ্ঞানবাহী তন্তু সবল হয এবং বুদ্ধি প্রখব বা সতেজ হয। মস্তিষ্কেব অপব পদার্থটি শ্বেত বর্ণ, তা কর্ম-প্রেবণাব সূচক। মস্তিষ্কেব শ্বেত অংশ দ্বাবা ক্রিযা এবং ধূসব অংশ দ্বাবা বুদ্ধি নিযন্ত্রিত হয।

আমাদেব বৃহৎ মস্তিষ্ক থেকে অসংখ্য তাব বা সুতোব মত বস্তু বেবিযেছে। সেগুলি জ্ঞানবাহী ও গতিবাহীও বটে। ঐ তন্তুগুলি বৃহৎ মস্তিষ্ক থেকে বেবিযে লঘু মস্তিষ্কেব ভেতব দিযে সুষুম্নাশীর্ষ পাব হযে পৃষ্ঠবজ্জু বা মেরুদণ্ডেব মধ্যে যে সুষুম্না আছে সেখানে গিযেছে এবং সেখান থেকে সমস্ত শবীবে ছডিযে পডেছে। এক দৃষ্টিতে বলা যায মস্তিষ্ক শবীবেব নিযামক বা নিযন্ত্রণকর্তা। বৃহৎ মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষ—এই তিনটিই শবীবেব নিযামকতত্ত্ব।

মস্তিষ্ক জ্ঞানকেন্দ্র। তা চৈতন্যেব সবচেযে বড কেন্দ্র। সূক্ষ্ম শবীবেব মুখ্য প্রকাশ মস্তিষ্কেব মাধ্যমেই আমাদেব স্থূল শবীবে নেমে আসে। মস্তিষ্ক এক প্রকাব মধ্য-সেতু। স্থূল শবীব ও সূক্ষ্ম শবীবেব মধ্যে তা সেতুব কাজ কবে। সূক্ষ্ম শবীব থেকে অববোহী শক্তি বা চৈতন্য মস্তিকেব মাধ্যমে স্থূল শবীব বা জাগ্রত মনে নেমে আসে। অবচেতন মন ও চেতন মনেব কাজও তাব মাধ্যমে হয। এই কাবণে সাধকেব পক্ষে মস্তিষ্কেব জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। যদি আমি মস্তিষ্কেব ক্রিয়া ঠিকমত বুঝতে পাবি তবে আমাব পক্ষে জ্ঞানকেন্দ্রকে বিকশিত কবা সম্ভবপব। এখ আধাবেই সাধকগণ সহস্রাবেব পবিকল্পনা কবেছেন। তাঁদেব কল্পনা অনুযাযী আমাদেব মস্তিষ্কে সহস্রাব নামে এক চক্র বা চৈতন্যকেন্দ্র আছে। আমবা আমাদেব খুশিমত তাকে চক্র, বুদ্ধি বা অন্য কোনও নাম দিতে পাবি। তা একটি অতি বৃহৎ জ্ঞানকেন্দ্র বটে। তাকে বিকশিত কবতে পাবলে অতিবিক্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভবপব হতে পাবে। এ সামান্য কথা, তেমন বড ব্যাপাব কিছু নয। প্রত্যেক লোকই তা পবীক্ষা কবে দেখতে পাবে। যদি কোন লোকেব মনে হয তাব বুদ্ধি সঙ্কুচিত হযে যাচ্ছে, জ্ঞান মন্দীভূত হচ্ছে তবে সে দশ মিনিট

কাল নিজেব মস্তিষ্কেব তালুতে হলুদ বঙের ওপবে ধ্যান কেন্দ্রিত করুক। ধীবে ধীবে তাব অনুভব হবে জ্ঞানেব বিকাশ হচ্ছে, বুদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি এই উপায প্রযোগ করুন, তখন নিজেবই বিশ্বাস হবে। এই প্রয়োগ দ্বাবা বুদ্ধি প্রবল হতে পাবে, চৈতন্যশক্তি পুষ্টি ও দৃঢ়তা লাভ কবতে পাবে, বিকশিত হতে পাবে। একে সমগ্রভাবে উপাসনা কবলে মানুষেব মধ্যে অতিবিক্ত জ্ঞানেব অবতবণ সম্ভব হতে পাবে।

দুটি মুখ্য কেন্দ্র আছে—জ্ঞানকেন্দ্র ও কামকেন্দ্র। মস্তিষ্ক জ্ঞান-কেন্দ্র আব কটিদেশেব আশপাশেব স্থান কামকেন্দ্র।

মানুষ কামেব উত্তেজনা দ্বাবা অতিশয অভিভূত। তাব মধ্যে বিচিত্র প্রকাব কামনা উৎপন্ন হয, তাব উত্তেজনা হয এবং তাব উত্তেজনা দীর্ঘকাল থাকে। ক্রোধ থেকেও উত্তেজনা হয, কিন্তু তা মাঝে মাঝে হয। অভিমান, লোভ ও মাযা থেকেও উত্তেজনা হয, কিন্তু তাও সর্বদা হয না। কিন্তু কামনাব উত্তেজনা দীর্ঘকাল ধবে চলতে থাকে। এই উত্তেজনাই সবচেযে প্রবল ও তীব্র।

আমাদেব শবীবেব ওজঃ বা শবীবেব বিদ্যুৎ কামকেন্দ্রেব দিকে অধিক প্রবাহিত হলে কামকেন্দ্র পুষ্ট হয এবং জ্ঞানকেন্দ্র ক্ষীণ হয। আমাদেব শবীবেব সাবাংশ ওজঃ বা বিদ্যুৎ যদি জ্ঞানকেন্দ্রেব দিকে প্রবাহিত হয় তবে জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হয এবং কামকেন্দ্র ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয। এই দুটিব মধ্যে সম্বন্ধ অতিশয নিবিড।

সাধনাব অর্থ, কামকেন্দ্রস্থিত ওজঃশক্তিকে ওপবেব দিকে প্রবাহিত কবে জ্ঞানকেন্দ্রে নিযে যাওযা যাতে জ্ঞানকেন্দ্রেব সিঞ্চন, পোষণ ও পুষ্টি হতে পাবে। সাধাবণত মানুষ নিজেব কামনা দ্বাবা ধ্যানকেন্দ্রকে নিচেব দিকে নিযে যায এবং কামকেন্দ্রকে পুষ্ট কবে। শবীবেব গঠন সম্বন্ধে বোধ হবাব পবে কামকেন্দ্রগত ওজঃশক্তিকে জ্ঞানকেন্দ্রে নিযে যাওযা সম্ভব হয। সাধনাব দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেব এ বিষযে যত্নবান হওযা উচিত। তাব সবচেযে প্রশস্ত পথ—সুষুম্না।

আমাদের শবীবে তিনটি প্রধান প্রধান পথ আছে—ডানে, বাঁযে

আব মাঝখানে। এই তিনেব মহত্ত্বেব কাবণ, তাদেব ভেতব দিযে প্রাণ-তবঙ্গ ওপবের দিকে যায। এগুলি প্রাণধাবা বা প্রাণতবঙ্গেব প্রবাহ-কক্ষ। তাই তাব মহত্ত্ব। তিনটিব মধ্যেই সুষুম্না আছে। তা সবচেযে বড এবং মহত্ত্বপূর্ণ প্রাণধাবাব প্রবাহকক্ষ। তাব ভেতব দিযে প্রচুব মাত্রায প্রাণধাবা ওপব দিকে যায। যোগেব ভাবায বাঁ দিকেব পথকে ইডা আব ডানদিকেব পথকে পিঙ্গলা বলে। মাঝখানকাব পথকে সুষুম্না বলা হয। পৃষ্ঠবজ্জু ছত্রিশটি হাড় দিযে গঠিত। তাব ভেতবকাব কোমল অংশ হল সুষুম্না কক্ষ। এব ভেতব দিযে প্রাণতবঙ্গ আসে ও যায। বাঁযেব পথ পৃষ্ঠবজ্জুব বাইবে নিচু থেকে আবম্ভ হযে ওপবেব দিকে যায এবং বাঁ দিকেব নাসাছিদ্রে এসে তাব শেষ হয। ঐ হল ইড়াব পথ। ডান দিককাব পথ পিঙ্গলাব পথ। পৃষ্ঠবজ্জু নিচে তাব আবম্ভ এবং ওপবে গিযে ডান দিকেব নাসাছিদ্রে তাব সমাপ্তি। মাঝখানকাব পথ সুষুম্নাব পথ। পৃষ্ঠবজ্জুব নিচ থেকে তাব আবম্ভ, আব মাস্তষ্কে এসে তাব সমাপ্তি। এই তিন পথ আছে। দুটি যায নাসাছিদ্রে, আব একটি যায মাস্তষ্কে। আমাদেব প্রাণধাবাকে বাম ও দক্ষিণেব পথে যেতে না দিযে মধ্যপথ দিযে চালনা কবাব চেষ্টা কবা উচিত। প্রাণেব তবঙ্গকে বেশি মাত্রায় প্রবাহিত কবতে হবে যাতে তা মাস্তষ্ক পর্যন্ত পৌছতে পাবে। দুটি পথ দিযে প্রবাহিত প্রাণধাবা মাস্তষ্ক পর্যন্ত পৌছয না। কেবল মাঝখানকাব পথ দিয়ে অর্থাৎ সুষুম্না দিযে প্রবাহমান প্রাণধাবা মাস্তষ্ক পর্যন্ত পৌছতে পাবে। মস্তিষ্কে প্রাণ-ধাবা নিযে যাওযাব অর্থ, জ্ঞানকেন্দ্রকে প্রাণধাবা দিযে পবিপূর্ণ কবা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুষুম্নাকে জানা, ঐ পথে প্রাণধাবাকে প্রবাহিত কবা, তাকে প্রাণ দিযে পবিপূর্ণ কবা, সাধনাব জন্য প্রযোজন। এই প্রযোজন মেটাবাব জন্য আমবা অনেক ক্রিযা কবে থাকি।

আমবা দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস কবি। তাতে শাবীবিক লাভ হয। ফুসফুসে নির্মলতা আনা সম্ভব হয। প্রাণবাযু পূর্ণ মাত্রায ভেতবে চলে যায। কার্বন ডাই-অক্সাইড সম্পূর্ণভাবে তা থেকে বেব হযে যায।

আমাশযেবও নিবামষ হ্য। সম্পূর্ণ উদব যন্ত্র শোধিত হ্য। এ সব শাবীবিক লাভ। কিন্তু লাভ হবে, কেবল এই উদ্দেশ্যে আমবা দীর্ঘশ্বাস অভ্যাস কবি না। যদি শুধু তাই উদ্দেশ্য হতো তবে তা আমাদেব স্বাস্থ্য নিকেতন হতো, সাধনা-নিকেতন হতো না। কিন্তু তা সাধনা-নিকেতন হলেও স্বাস্থ্যনিকেতন নয। আমবা আধ্যাত্মিক লাভেব জন্য দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস কবি। দীর্ঘশ্বাসেব দ্বাবা সুষুম্নাব পথ উন্মুক্ত হয, বিদ্যুৎ তবঙ্গ প্রবল হয। কামাব হাপব চালনা কবে, তাব ফলে আগুন প্রবলভাবে জ্বলে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসেব কাজও এই। তাব এমন ক্ষমতা যে তা সুষুম্নাব পথ খুলে দেয এবং তাব ভেতব দিযে প্রাণধাবাকে প্রবাহিত কবে। প্রাণধাবা ঐ পথে প্রবাহিত হযে মস্তিষ্কেব কেন্দ্রে পৌঁছে জ্ঞানকেন্দ্রকে পুষ্ট কবে। দীর্ঘশ্বাস অভ্যাস কবাব এই প্রযোজন। সেখানে পৌঁছতে পাবলে আমাদেব প্রত্যেক কাজেবই আধ্যাত্মিক প্রযোজন থাকে এবং তাব দ্বাবা অনুপ্রেবিত হযে আমবা ঐ সব কাজ কবে থাকি।

যে সাধক পূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং তন্ময়তাব সঙ্গে দীর্ঘশ্বাসেব প্রযোগ অভ্যাস কবে তাব প্রথম প্রথম অনুভূতি হয তাব পৃষ্ঠবজ্জুব তাব ঝনঝন কবছে। তাব ভেতবে কাঁপনও শুরু হবে। একটু গভীবতায গিযে সে যদি অনুভব কবতে চেষ্টা কবে তবে তাব মনে হবে তাব পেছনে কিছু নডাচডা কবছে।

দ্বিতীয কথা—যখন সুষুম্নাব পথ খুলে যায তখন এক বিচিত্র শান্তি ও তন্ময়তাব অনুভূতি হয এবং সমস্ত শবীবে শীতলতা ব্যাপ্ত হয। মনে হয যেন গ্রীষ্মেব প্রখব তাপে উৎপীডিত কোনও পথশ্রান্ত পথিক গভীব ছাযাচ্ছন্ন কোন জাযগায এসে বসেছে।

তৃতীয কথা—দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস পবিপক্ব হলে দশ-পনব মিনিট কাল অভ্যাস কবাব পব এক নির্বিচাব স্থিতি সঞ্জাত হয এবং সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্প বন্ধ হযে যায।

এ সবে কি হয? এ একটি প্রশ্ন বটে। এব উত্তব এই যে,

সুষুম্নাতে প্রাণধারা প্রবেশ করার ফলে এই সব ঘটে। যদি আমাদের শ্বাস ডান দিকের পথে প্রবাহিত হয় তবুও চঞ্চলতা আসবে। যখন আমাদের শ্বাস সুষুম্না বা মধ্যের পথ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে তখন সমস্ত চঞ্চলতা আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে। ঐ চঞ্চলতা শেষ হওয়ার একটি প্রবল কারণ আছে। যদি আমরা শরীরশাস্ত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব দেখতে না পাই, তবে যোগসাধনার তথা আভ্যাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকেও এর দ্বারা লাভবান হতে সক্ষম হব না। এই কারণে শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা একজন শরীরশাস্ত্রীর পক্ষে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, একজন যোগী বা সাধকের পক্ষেও ততটা গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আমরা অন্যান্য চৈতন্যকেন্দ্রের আলোচনা করব।

মস্তিষ্কের একটু আগে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। ওটাও চৈতন্যের অতি বৃহৎ কেন্দ্র। এর ক্ষমতা প্রভূত। কোনও কোনও শরীরশাস্ত্রী তথা পরামনোবিজ্ঞানী একে এক রকম সর্বজ্ঞতার কেন্দ্র বলেছেন। একে আজ্ঞাচক্রও বলা হয়, আবার তৃতীয় নেত্রও বলা হয়। তা মস্তিষ্ক এবং তালুর নিচে, ভ্রূর নিকটে গভীরতায় অবস্থিত। পাশ্চাত্য দেশের সাধকরা একে 'থার্ড আই' নাম দিয়ে এর সম্বন্ধে অনেক চর্চা করেছেন এবং এ বিষয়ে অনেক বইও লেখা হয়েছে। এটিও চৈতন্যের এক কেন্দ্র। আমাদের শরীরের অনেক জায়গায় চৈতন্যকেন্দ্র আছে। আমাদের শরীরে যেখানে যেখানে চৈতন্যকেন্দ্র আছে, সেখানে সেখানে স্নায়ুগুলি বড় জালের মত তৈরি হয়েছে। ঐ স্নায়ুজালকে আমরা গ্রন্থি বলি, চক্র বলি বা অন্য কোন নামে অভিহিত করি। কিন্তু এ কথা সত্য যে আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় চৈতন্যকেন্দ্র আছে। ঐ সব চৈতন্যকেন্দ্র স্থূল শরীরের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্থূল শরীরে কেবল তাদের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এই সমস্ত কেন্দ্র অতিশয় গভীরতায় সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত আছে। এ রকম হওয়া সম্ভব যে আমাদের শরীর-পর্যাপ্তিতে ঐ সব চৈতন্যকেন্দ্র আছে। সূক্ষ্ম শরীরে তো ঐ কেন্দ্রগুলি নিশ্চিতভাবে অবস্থিত। শরীরের প্রতিবিম্ব শরীর পর্যাপ্তিতে পড়ে,

এবং শবীব পর্যাপ্তিব ছাযা স্থূল শবীবে পড়ে—এই বকম এক চিন্তাধাবা প্রচলিত আছে।

আজ্ঞাচক্র এক শক্তিশালী চৈতন্যকেন্দ্র। কোনও লোক জিজ্ঞাসা কবে, চেতনাকে জাগিযে তোলাব কোনও পথ পাওযা যায কিনা। বাস্তবে কোন পথ আছে, কিংবা তা কল্পনা মাত্র? পথ অবশ্যই আছে, কিন্তু খুঁজে বেব কববে কে? আমাদেব অধ্যবসায এবং প্রযাসেব ওপবে এই পথ পাওযা নির্ভব কবছে। পথ কঠিন নয। নিশ্চযই পথ আছে—অবশ্যই আছে। তাব অস্তিত্ব অনুভূত সত্য। তা কল্পনা মাত্র নয। আমি মনে কবি, কোনও সাধক যদি তিন ঘণ্টা ধবে আজ্ঞাচক্রে মন কেন্দ্রিত কবে বাখতে পাবে, যদি সে একাগ্র হযে থাকতে পাবে, তবে দশ দিন বাদে সেই সাধক কখনই বলবে না যে চেতনাব জাগবণেব কোন পথ নেই। দেখতে হবে তিন ঘণ্টাব মধ্যে কোনও বিকল্প না আসে। এটি অবশ্য কঠিন কথা। সাধাবণত এক-দুই মিনিট বা পাঁচ-দশ মিনিট কালও মনকে এক ধাবায চালিত কবা কঠিন, একই স্থানে এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা মনঃসংযোগ কবে বাখা অত্যন্ত দুষ্কব বটে। যে সাধক দশ-পনব মিনিট পর্যন্ত একাগ্রভাবে অবস্থানেব অভ্যাসে পৌঁছে যায সে অনুভব কবতে পাবে যে, যদি কোনও লোক তিন ঘণ্টা ধবে একাগ্রতায অবস্থিত থাকতে পাবে সে অবশ্যই পথেব সন্ধান পেযেছে এবং বৃথা ইতস্তত ভ্রমণ থেকে মুক্তি পেযেছে। তাব আব গুরু বা উপদেশকেব প্রযোজন হয না। কিন্তু তাঁব এতটা শ্রদ্ধা, তন্ময়তা ও সামর্থ্য থাকা প্রযোজন যাতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তিনি সাধনায সিদ্ধি লাভ কবতে পাবেন।

অনেকে মনে কবে যাবা ধ্যান কবে তাবা কর্মহীন ভাবে থাকে, এবং অকর্মণ্য হযে যায। তাদেব নিষ্কর্মা বলা হয। ধ্যানকালে এত পবিমাণ শক্তি প্রযোগ কবতে হয যে ধ্যানভাসী অনেক সমযে নিজ শবীবেব ওপবে বলপ্রযোগ কবে। ফলে শবীবে কঠিন ব্যাধি উৎপন্ন হতে পাবে। ধ্যানকালে ওজঃ বা শাবীব-বিদ্যুৎ ব্যযিত হয। তাব

ফলে মস্তিষ্কের এতটুকু শ্রম হলে মনে হয় মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। এরকম অনুভূতির কারণ মস্তিষ্কের ওজঃ বা বিদ্যুৎশক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যয় হয়। এ রকম অবস্থায় কেন মাথা গরম হয়? তার কারণ, যতটা ওজঃশক্তি বা বিদ্যুৎ আছে তার উপযোগিতা আমরা অধিক মাত্রায় ব্যয় করি। তার ফলে তা এত বেশি জ্বলতে আরম্ভ করে যে আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়, চুল্লির মত জ্বলতে থাকে। যে অবয়বের ওজঃ আমরা উপযোগ হিসাবে ব্যয় করি তাতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

ধ্যানকালে ওজঃশক্তির অধিক ব্যয় হয়। মনকে একাগ্র করার জন্য বহু চেষ্টা করতে হয়। এ প্রয়াস প্রবল হলে ওজঃশক্তির ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রয়াস না করলে নির্বিকার স্থিতি পাওয়া সম্ভবপর নয়। যদি আমাদের প্রযত্ন সফল হয়, ওজঃশক্তি সম্পুর্ণভাবে প্রয়োগ করি, তবে লক্ষ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় চৈতন্যকেন্দ্র—কণ্ঠ। যোগের ভাষায় একে বিশুদ্ধিচক্র বলে। একে বিকশিত করলে বাসনাসমূহের ওপরে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পাওয়া যেতে পারে। নিয়ন্ত্রণ নয়, আমি ভুল করছি। নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পাওয়া তেমন বড় কথা নয়। প্রযত্ন ব্যতীত আমরা নির্বিচার হতে পারি না। বড কথা হল, বাসনাকে নির্মল ও উদাত্ত করা। বিশুদ্ধিচক্র বিকশিত হলে আমাদের বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ চৈতন্যকেন্দ্র—নাভিচক্র। এটি হল অগ্নির স্থান। এখানে অনেক তাপ, অনেক তেজস্বিতা অবস্থিত। যেখানেই উত্তাপ সেখান থেকেই তা অন্য সমস্ত বস্তুতে তেজ সংক্রমিত করে। এই চক্রে যদি একাগ্রভাবে ধ্যান কেন্দ্রিত করা যায় তবে বৃত্তিগুলি, তথা বাসনাগুলির তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজস্বিতার ফলে সমস্ত বস্তু প্রবল হয়ে উঠে।

বিশুদ্ধিচক্র ও নাভি চক্র—এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। কোন লোক নাভিচক্রকে জাগ্রত করে যদি বিশুদ্ধিচক্রকে জাগ্রত না করে তবে তার কঠিন পীড়া উৎপন্ন হয়। দুই চক্রকেই এক সঙ্গে জাগ্রত করতে হয়। যদি তা করা যায় তবে তেজস্বিতা

বৃদ্ধি পায়, শক্তি সঞ্চিত হয়, বৃত্তিসমূহ শান্ত হয়।

এক মস্ত বড চৈতন্যকেন্দ্র হল—হৃদয। মস্তিষ্কেব স্থান প্রথম, আব হৃদযেব স্থান দ্বিতীয। এ একটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ স্থান। এ সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত পুবনো বিবাদ আছে—আত্মা মস্তিষ্কে, না হৃদযে অবস্থিত। আয়ুর্বেদ গ্রন্থ লিখেছে, 'হৃদযং চেতনাধিষ্ঠানং'—হৃদযে চেতনাব অধিষ্ঠান। 'চৈত্য পুরুষ', 'হৃদয পুরুষ' এই সমস্ত কথা হৃদয সম্বন্ধে ব্যবহৃত হযে থাকে। 'থাবে ঘট মে বাম বিবাজে'—এই ঘট বামেব বাসস্থান বটে। বাম, আত্মা বা প্রভুব অবস্থান ঘটে হৃদযে। হৃদয অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। জীবনেব দিক থেকেও হৃদযেব স্থান মহৎ বা প্রধান। হৃদয থাকলে জীবন থাকে, হৃদয না থাকলে জীবনও থাকে না। হৃদযেব স্পন্দন বন্ধ হলে জীবন শেষ হযে যায। শবীব-তন্ত্রেব সঞ্চালক বক্ত। বক্তই জীবন। বক্ত থাকলে জীবন থাকে। বক্তেব সঞ্চালক হৃদয। হৃদযে বক্ত প্রবাহিত হয। ফুসফুসে তাব শুদ্ধি হয, তাবপব সেখান থেকে তা সমস্ত শবীবে ছডিযে পডে। বক্তই জীবন, আব তাকে সমস্ত শবীবে প্রসাবিত কবে হৃদয। এই হল হৃদয়েব গুরুত্বেব কাবণ। ওটা আমাদেব ভাবপক্ষও বটে। যদি মস্তিষ্ক জ্ঞান-পক্ষ হয় তবে হৃদয ভাবপক্ষ।

হৃদয় চেতনাব অতিশয বৃহৎ কেন্দ্র। সাধনাব দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। যে সাধক এই চক্রেব উদঘাটন কবে এবং তাকে জাগ্রত কবে, সে বাহ্য জগতেব বন্ধন থেকে মুক্ত হযে ভেতবের জগতে প্রবেশাধিকাব পায।

আমাদেব শবীবে এই বকম অনেক চৈতন্যকেন্দ্র আছে। কোন কোন যোগী বলেছেন চৈতন্যকেন্দ্র ছটি, কেউ বলেছেন সাতটি, আবাব কেউ বলেছেন নটি। আমি মনে কবি চৈতন্যকেন্দ্রেব সংখ্যা এই সংখ্যাগুলিব চেযে বেশি। প্রধান প্রধান কেন্দ্রেব নামগুলি গোনা হযেছে। সেগুলি ছাডা আব যে সব ছোটখাটো চৈতন্যকেন্দ্র আছে সেগুলি গোনা হয নি। প্রকৃতপক্ষে তাদেব সংখ্যা অনেক।

চৈতন্যকেন্দ্রেব অর্থ—মর্মস্থান। ভাবতীয আয়ুর্বেদেব পূর্বস্কর্তাগণ (অগ্রণীবা) সত্তবটি মর্মস্থানেব কথা বলেছেন। চীন দেশে প্রচলিত আকুপাংচাব নামক চিকিৎসাপদ্ধতিতে সাতশ' মর্মস্থানেব কথা স্বীকৃত হযেছে। শবীবে এই বকম সাত শ' বিন্দু বা মর্মস্থান আছে যেখানে চৈতন্যেব প্রবাহ সমধিক। এই সমস্ত মর্মস্থানকে উত্তেজিত কবে অনেক বকম বোগ নিবামষ কবা যায। এভাবে অসাধ্য বোগেব চিকিৎসা হচ্ছে।

'মর্ম' কথাটিব অর্থ বহস্য বা গোপন। মর্মস্থান কথাটিব অর্থ গূঢতাব বা গোপনতাব স্থান। এই সব মর্মস্থানে চেতনাব বিশেষ ধবনেব অভিব্যক্তি হয। প্রযোজন বোধ কবলে যে কেউ এক, দুই, তিন বা চাবটি মর্মস্থান স্পর্শ কবে পবীক্ষা কবে দেখতে পাবেন। তাহলে বিশেষ উপলব্ধি হবে। চীন দেশে চিকিৎসকেব দৃষ্টিকোণ থেকে মর্মস্থানেব সন্ধান কবা হযেছে। সাধনাব দিক থেকে তাব অনেক মহত্ত্ব আছে। মর্মস্থান ও চৈতন্যকেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কবেছি। ঐ প্রকাব মর্মস্থান আবও থাকতে পাবে।

আবও এক চৈতন্যকেন্দ্রেব কথা আলোচনা কবব। পৃষ্ঠবজ্জুব নিচেব স্থানকে মূলাধাব বলা হয। তা চৈতন্যেব কেন্দ্র বিশেষ। সাধনাব দিক থেকে তাব তাৎপর্য অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এবং তা বিদ্যুৎ কেন্দ্রও বটে। আমাদেব সমস্ত শাবীবিক ওজঃশক্তিব তা সঞ্চযগৃহ। সেখান থেকে ওজঃশক্তিব প্রসাবণ ঘটে। এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয এবং সেখান থেকেই তাব বিস্তাব ঘটে।

আপনাবা জানতে চান যে ধ্যানকালে আপনাদেব মন একাগ্র হযেছে কিনা। এ বিষযে পবীক্ষা কবাব একটি কষ্টিপাথব আছে। যখনই মন একাগ্র হবে নিচেব স্নাযু ওপব দিকে উঠতে থাকবে। ঊর্ধ্বাকর্ষণেব অনুভূতি আপনাব সহজভাবেই হতে থাকবে। যদি এ বকম অনুভূতি হতে থাকে তবে জানবেন আপনাব মন একাগ্র হযেছে বা হচ্ছে। যদি এ বকম অনুভূতি না হয তবে আপনাব মন একাগ্র হয নি বা হচ্ছে না। তা চঞ্চলভাবে ঘুবে বেডাচ্ছে। মনেব একাগ্রতাব সঙ্গে নিচেকাব

স্নায়ুসমূহেব নিবিড সম্বন্ধ আছে। মন একাগ্র হতে বা কেন্দ্রিত হতে থাকলে নিচেব স্নায়ু আপনা আপনি ওপব দিকে উঠতে আবম্ভ কববে। যেমন যেমন একাগ্রতা বাডতে থাকবে তেমনি সঙ্কুচিত হতে থাকবে। সব কিছু সঙ্কুচিত হতে থাকবে। তাব অর্থ, যে বিদ্যুৎ সঞ্চিত আছে তা ওপব দিকে উঠছে। বিদ্যুতেব ধাবা ওপবেব দিকে প্রবাহিত হতে আবম্ভ কবেছে, ওপবেব দিকে যাবাব জন্য তা পথ খুঁজতে আবম্ভ কবেছে।

এই এক কষ্টিপাথব। প্রত্যেক সাধক একে কাজে লাগাতে পাবেন, নিজেই পবখ কবে দেখতে পাবেন। কোন উপাযে মন একাগ্র হতে আবম্ভ কবলে নিচেব স্নায়ু সঙ্কুচিত হতে শুরু কবে। এই সঙ্কোচন একাগ্রতাব বিন্দুব সূচনা কবে। সাধনাব দিক এ কথা মানতে হবে যে, সাধক যে কোনও বকম সাধনা করুন না কেন নিচেকাব স্নায়ুব সঙ্কোচ বা সঙ্কুচিত করা অবশ্য প্রযোজন। স্নায়ু যতটা সঙ্কুচিত থাকবে ওপব দিকে ততটা বিকাশ ঘটবে। ঊর্ধ্বীকবণ তথা উদাত্তকবণ ঘটবে। বিদ্যুতেব যে ধাবা নিচেব দিকে প্রবাহমান ছিল তাকে রুদ্ধ কবে ওপরেব দিকে প্রবাহিত কবা হযেছে। এব নাম সাধনা। এ এক বকম বিদ্যুতেব ধাবা বদলানো, তাব মোড ঘোবানোব উদ্যোগ। এই জন্য একে মূলবন্ধ বলা হয। মূল যতটা দৃঢ হয ওপবকাব সমস্ত অবযব ততটা দৃঢ হবে। বৃক্ষেব মূল দৃঢ এবং সুস্থ হলে তাতে পাতা, ফুল ও ফল ধরতে থাকবে। তাকে কেউ আব বাধা দিতে পাববে না। মূল যদি বিকৃত এবং অসুস্থ হয তবে বৃক্ষটি দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পাববে না, ধবাশাযী হবে।

সাধনাব দিক থেকে এই হল মূল স্থান। এ যদি সুস্থ হয তো সমস্ত বিকাশ সহজ সবল হযে যাবে। যদি আমবা এই কথাগুলি ঠিক মত বুঝে থাকি, যদি তাব তাৎপর্য হৃদযঙ্গম কবে থাকি, তবে ওপবকাব কেন্দ্রগুলিকে বিকশিত কবা আমাদেব পক্ষে সহজ হবে। ঐ সব কেন্দ্রেব বিদ্যুৎধাবা উপযুক্ত সিঞ্চন ও পোষণ পাবে। এই জন্য ঐ স্থানেব ওপবে ধ্যান কেন্দ্রিত কবা অতিশয আবশ্যক।

এই বাব আমবা স্থূল শবীবেব প্রসঙ্গ ত্যাগ কবে সূক্ষ্ম শবীবেব আলোচনা কবব। সাধনাব সঙ্গে সূক্ষ্ম শবীবেব বিবাট সম্বন্ধ। দৃশ্য শবীব বা স্থূল শবীব পর্যাপ্ত নয। তাব সঙ্গে সূক্ষ্ম শবীব সংযুক্ত আছে। আমাব বৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, সংস্কাব প্রভৃতি সব কিছু স্থূল শবীবে প্রকট হয, জাগ্রত মনে প্রকাশিত হয। এ সব কোথা থেকে এল? এব স্রোতই বা কি? আমাকে তাব খোঁজ কবতে হবে। স্রোত কি, কোথা থেকে এল, এ সব খুঁজে বেব কবতে হবে। এই স্থূল শবীবে যদি এই স্রোতেব উৎস না থাকে তবে এ সব কোথা থেকে আসছে? কাব মাধ্যমে আসছে? মাধ্যম সম্বন্ধে আমি এব আগে আলোচনা কবেছি। এব মাধ্যম হল মস্তিষ্ক। ঐ সমস্তই মস্তিষ্কেব সাহায্যে নেমে আসে, কিন্তু তাদেব মূল উৎপত্তিস্থল কোথায? এই প্রশ্ন এখনও অবশিষ্ট আছে।

এব স্রোত হল—সূক্ষ্ম শবীব। আমবা তাকে দেখতে পাই না। বহু আববণ আছে। আমবা শুধু স্থূল শবীবকেই দেখতে পাই। সাধকদেব সূক্ষ্ম শবীব দর্শন কবাব জন্য প্রযত্ন কবা আবশ্যক। সূক্ষ্ম শবীব দেখতে পাওযা সম্ভব, তাকে অনুভব কবা সম্ভব। আপনি নিজেব সূক্ষ্ম শবীব দেখতে পেতে পাবেন, আবাব অন্যেব সূক্ষ্ম শবীবও দেখতে পাবেন। আপনাব শবীবেব চাবদিকে প্রভামণ্ডল দেখা যেতে পাবে, অন্য লোকেবও প্রভামণ্ডল দেখা যেতে পাবে।

একটি ছোটখাটো প্রযোগেব আলোচনা কবব। আপনাবা একাগ্রতা অভ্যাস কবেছেন। আপনাব কাছে কোন লোক গেল। আপনি অনিমেষ দৃষ্টিতে এক মিনিট ধবে তাব দিকে চেযে থাকলেন। তাকে দেখাব পবে আপনি চোখ বন্ধ কবলেন। আপনাব চোখ দুটি বন্ধই থাকল। তাব প্রতিমূর্তি আপনাব সামনে থেকেই গেল। তাব শবীব আপনি দেখছেন না। তাব আকৃতি দেখছেন না। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আপনি দেখছেন তাব শবীব প্রমাণ প্রতিরূপ আপনাব চোখেব সামনে আসবে। আপনি সেই প্রকাশমূর্তিব চাবদিকে নীল, কালো বা সাদা বঙেব যে বলয আছে তা আপনি দেখতে পাবেন। এই প্রকাব

একাগ্রতাব সাধনা দ্বাবা অন্য লোকেব সূক্ষ্ম শবীব ও তাব আভাবলয দেখতে পাওয়া সম্ভব। নিজেব শবীবও দেখা সম্ভব হয। ঐ ধ্যান এক বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রিত হয়, তাতে এক বিশেষ ধবনেব স্থিতি উৎপন্ন হয। তখন সাধকেব সামনে তাঁব শবীবেব এক বিশেষ তৈজস-প্রকৃতিও প্রকটিত হয। তিনি চোখ বুঁজে থাকলেও তাঁব অন্তর্দৃষ্টি দ্বাবা তিনি তা দেখতে পান।

সূক্ষ্ম শরীব আব স্থূল শবীবেব কি সম্বন্ধ তা জানা বিশেষ প্রযোজন। সূক্ষ্ম শবীব কিভাবে স্থূল শবীবকে প্রভাবিত কবে এবং স্থূল শবীব ও স্থূল মন কিভাবে জাগ্রত মনেব সাধনাব দ্বাবা সূক্ষ্ম মনেব প্রকম্পনেব নাগাল পেতে পাবে, এ সব বিষয জানা অত্যন্ত আবশ্যক।

৯

প্রেক্ষা প্রয়োগ

দুটি তত্ত্ব কাজ কবে—দেখা এবং জাগা। আমবা একই সময়ে দেখি ও জেগে থাকি। আমবা গভীব ভাবে চিন্তা কবলে দেখতে পাব যে দেখা ও জাগা দুটি পৃথক কাজ নয়, দুটি একই কাজ। এ দুটিই প্রেক্ষাধ্যানে কাজ কবতে থাকে। জাগা অর্থাৎ অপ্রমত্ত থাকা। এ মস্ত বড় কথা। 'সুত্তেসু যাবি পডিবুদ্ধজীবী।' ঘুমন্ত লোকেব মধ্যে জেগে থাকা অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ ব্যাপাব। আমি যদি আব একটু গভীবে যাই তবে এই বচনেব এই অর্থ হবে যে, ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলিব মধ্যে আমাদেব জেগে থাকতে হবে। অর্থাৎ চেতনাব এমন এক শিখা জ্বালাতে হবে যাতে বাতাসেব ঝাপটা তাকে নেভাতে না পাবে। হাওযা বযে যাবে, ঝড উঠবে, তুফান উঠবে, ঝঞ্ঝা আসবে, তবুও আমাদেব অন্তবে এমন জ্যোতি, এমন শিখা জ্বেলে বাখতে হবে যাকে কোন কিছুই নেভাতে পাববে না। এব নাম সাধনা। এই হল সাধনাব বল। আমাদেব ভেতবে এমন জ্যোতির্ময শিখা প্রজ্বলিত কবতে হবে যাকে বিশ্বেব কোনও শক্তিই নির্বাপিত কবতে সমর্থ হবে না। বাইবে যাই হতে থাক ভেতবে এই জ্যোতি অনির্বাণ জ্বলতে থাকবে। এ শিখা কখনই খণ্ডিত হবে না। তাবও এক সাধনা আছে। তা

প্রেক্ষাব অভ্যাস, দেখাব অভ্যাস। কেবল জানাব সাধনা হয় না, কবাব সাধনা হয। শুধু জেনে নেওয়া পর্যাপ্ত, কবাও জরুবী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব। কিছু কব। প্রযোগ কব। প্রয়োগের জন্য, জাগ্রত থাকাব জন্য কোন কথা গুরুত্বপূর্ণ।

আপন অস্তিত্ব থেকে শবীবকে ভিন্ন কবে দেখতে হলে এক প্রযোগ কবতে হবে। আমবা যদি অভ্যাস কবি তবে মৃত্যুকে দেখতে পাই। মৃত্যুকে দেখতে হলে, শবীব থেকে নিজেব অস্তিত্বকে পৃথক কবে দেখতে হলে তাব জন্য প্রযোগ আবশ্যক। সে হল জাগৃতিব প্রযোগ, অপ্রমাদেব প্রযোগ।

ক্ষুধা লাগে বলে আমবা খাই। খিদে লাগে শবীবেব। আমাব খিদে লাগে না। অন্য কোনও বস্তুব ক্ষুধা লাগে। যদি প্রাণশক্তি থাকে, যদি শবীব থাকে তবে ক্ষুধা লাগবেই। চেতনাব ক্ষুধা বোধ হয না। শবীবেব খিদে পায আব চেতনা দেখতে থাকে কিসে তাব ক্ষুধা পায আব কিসে ক্ষুধা পায না। চেতনাব স্থিতি যদি অভিব্যক্ত হয, যদি তাব জ্যোতি জ্বলে ওঠে, সে ক্ষুধাকে দেখে আব সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কবে, ক্ষুধাবোধ তাব নয, সে স্বযং তৃপ্ত, সদা তৃপ্ত, কখনও তাব অতৃপ্তি নেই, ক্ষুধাবোধ নেই। এই স্থিতিব অনুভূতিই প্রকৃতপক্ষে তপস্যা। চেতনাকে এভাবে জাগিযে তোলা যাতে সে দেখতে পাবে কাব ক্ষুধা পেযেছে—এ এক খুব বড তপস্যা।

লোকে ঘুমোয, শুযে থাকে, মূর্চ্ছিত হয। আচার্য কুন্দকুন্দন একেবাবে মর্মেব কথা লিখেছেন। সে কথা বোঝা সহজ নয। তিনি লিখেছেন, আহাব বিজয, নিদ্রাবিজয এবং আসন বিজয যে না জানে সে জৈনশাসন জানে না। সে ভগবান মহাবীবেব বাণী বুঝতে পাবে না, তাঁকে বুঝতে পাবে না। এ তুচ্ছ কথা নয, বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ কথা। যে আহাববিজয, নিদ্রাবিজয ও আসনবিজযেব তাৎপর্য বুঝতে না পাবে সে জৈন শাসন বোঝে না, জানে না।

আহাববিজয—সাধনাব দিক থেকে এ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

কথা। শরীর শরীরই বটে। আহার ছাড়া দেহ বাঁচতে পারে না। এই স্থিতিতে আহারবিজয় কি ভাবে? আহারবিজয় করতে না পারলে কেউ জৈন শাসন বুঝতে পারবে না। এ দুটি কথা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। বস্তুত তারা পরস্পর-বিপরীত নয়। তাদের মধ্যে সঙ্গতি আছে। যে ব্যক্তি ক্ষুধিত, খাইয়ে লোক ও চৈতন্যের প্রভেদ করতে না পারে সে আহারবিজয় করতে সমর্থ হয় না। যে আহারবিজয় করতে সক্ষম হয় না তাঁর অনবরত ক্ষুধা বোধ হয়। সে উপবাস করলেও তার নিরন্তর ক্ষুধার অনুভূতি হতে থাকে, আর ক্ষুধার অনুভূতি হতে থাকলে তাপের অনুভূতি কোথা থেকে হবে? করে হবে? কি করে হবে? খাবেও না, না খাওয়ার জন্য সর্বদাই ক্ষুধার দ্বারা পীড়িত বোধ করবে না, তবেই হবে আহারবিজয়। যখন আমার এই ভেদ স্পষ্ট অনুভূতিতে আসবে যে, যার ক্ষুধা লেগেছে সে এবং আমি এক নয়, দুই ভিন্ন লোক, তখনই আমার আহারবিজয় সম্পূর্ণ হবে। আমার কখনও ক্ষুধা বোধ হতে পারে না, আমি কখনও ক্ষুধার দ্বারা পীড়িত বোধ করি না। এই তথ্য ভেদ প্রয়োগ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আমরা যেন না খাই এবং না খেয়ে এই প্রয়োগ করি। ভগবান মহাবীর তপস্যা এবং উপবাসের ওপরে এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে মনে হয় তপস্যাও তাঁর এক প্রয়োগ। উনি এক প্রয়োগ করেছেন যে, না খেয়ে স্থিতিতে অধিষ্ঠিত থেকে চৈতন্যকে কতটা অনুভব করা সম্ভব হয়, এবং ক্ষুধা দ্বারা যে সকল ব্যাধি হয়, ক্ষুধা থেকে সঞ্জাত সে সকল পীড়া থেকে নিজের অস্তিত্বকে কতটা পৃথক বা মুক্ত রাখা যায়। তপস্যা তাঁর এক প্রয়োগ। শুধু না খাওয়া, শুধু উপবাস করা তপস্যা নয়। নিরন্তর ধ্যান ও আমি খাই না এবং না খাওয়ার জন্য আমার কোনও কষ্ট হয় না, এই জাগরূকতা তার সঙ্গে সংযুক্ত হলে তপস্যা হয়। অনাহারকষ্ট কার হচ্ছে? এই কষ্ট কে অনুভব করছে? এই তথ্য সুষ্ঠু-ভাবে বোঝা তপস্যার এক প্রয়োগ। এই কথা যে লোক বুঝতে পারে সে আহারবিজয় করতে সমর্থ হয়। সে জৈন শাসনের মর্ম বুঝতে

সমর্থ হয়।

আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় নিদ্রাবিজয়। যে নিদ্রাকে জয় করতে পারে না সে জৈন শাসন বুঝতে পারে না। শরীর আছে, সুতরাং এ সম্ভব নয় যে প্রত্যেক লোকই নিদ্রাকে জয় করবে। অকপটে স্বীকার করতে হয় যে কিছু লোক আছে, যাদের নিদ্রা হয় না বা খুব অল্প নিদ্রা হয়। সবাই ঘুমোয়। যাঁরা বড় বড় তপস্বী হয়েছেন তাঁরাও ঘুমোতেন। তা হলে এটা কি করে হতে পারে যে লোক নিদ্রা জয় করতে পারে নি সে জৈন শাসন বুঝতে সক্ষম হবে না?

'আচারাঙ্গ সূত্রে' একটি বচন আছে—'সুত্তেষু জাগরমাণে'—নিদ্রিত লোকের মাঝখানে যে জেগে থাকে অথবা যে নিদ্রিত অবস্থাতেও জেগে থাকে। মানুষ তিন প্রকার—সুপ্ত, জাগ্রত এবং সুপ্ত-জাগ্রত। সুপ্ত—যে নিদ্রিত, জাগ্রত—যে জেগে আছে, সুপ্ত-জাগ্রত—যে নিদ্রিত অবস্থাতেও জেগে আছে। মুনির এমন হওয়া উচিত যে সে নিদ্রিত হয়েও জেগে থাকবে। সে শুয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু অনুভব করে, 'আমি জাগ্রত, আমি জেগে আছি।' এক মুহূর্তের জন্যও তার মনে হয় না যে সে ঘুমিয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে অনুভব হতে থাকে, 'আমি জেগে আছি।' এ খুব বড় সাধনা। যে ব্যক্তি এ রকম সাধনা করে থাকে সে ছয় ঘণ্টা অনবরত ঘুমিয়ে থাকলেও তার অনুভূতি হয় 'আমি জেগে আছি,' সে এক মহৎ উপলব্ধির অধিকারী হয়। অর্থাৎ স্থূল চেতনা ঘুমোয়, শরীর ঘুমোয়, কিন্তু যে জ্যোতি অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তা নিরন্তর জাগ্রত থাকে এবং অনুভব করে, 'আমি জেগে আছি।'

'সুত্তেসু যারি পডিবুদ্ধজীবী'—সুপ্ত হয়েও প্রবুদ্ধ হয়ে জীবন ধারণ করুন, ঘুমিয়ে থেকেও জেগে থেকে বাঁচুন। যে এই সাধনা করেছে সে জৈন শাসনের মর্ম বুঝতে পেরেছে, সে নিদ্রাবিজয়ী হতে পারে। এরও প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন, অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োগ ও অভ্যাস ছাড়া কেউ নিদ্রাকে জয় করতে সক্ষম হয় না। আমরা

প্রতিদিন শোবাব সময সঙ্কল্প কবব যে জাগ্রত থেকে ঘুমোব, নিদ্রিত অবস্থাতেও অপ্রমত্ত থাকব, সম্বিত থাকবে যে আমবা জেগে আছি।' এক দিনে কোনও নিষ্পত্তি হবে না। অনেক দিন ধবে প্রযোগ কবতে হবে। দীর্ঘ কাল অভ্যাস কবতে হবে। আব দ্বিতীয কোনও লোকেব-সঙ্গে এই প্রযোগ সম্বন্ধে আমবা আলোচনা কবব না। কাবও সঙ্গে আলোচনা কবলে সে বলবে, 'লোকটা কি বকম পাগল।' ঘুমিযে থেকেও জেগে থাকাব কথা পাগলামি নয তো কি? আপনি ঐ প্রযোগ কবতে থাকুন। এমন হতে পাবে আপনাব সফলতা লাভ কবতে এক মাস, দু মাস, ছয মাস, এমন কি পুবো এক বছব লাগতে পাবে। এমন এক দিন আসবে যখন আপনি স্বযং অনুভব কববেন যে আপনি নিদ্রিত থেকেও সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত আছেন, ঘুমিযে থেকেও আপনি জেগে আছেন। আমি এ কথা বলতে পাবি না ছয ঘণ্টা নিদ্রিত থাকাব কালে পুবো ছয ঘণ্টাই জাগ্রত অবস্থাব স্থিতি হবে। কিন্তু আমি এটা বলতে পাবি কিছু সময এমন যাবে যে, আপনি নিদ্রিত থেকেও অনুভব কববেন আপনি জেগে আছেন।

আমি জাগ্রত থাকাব বিষযে আলোচনা কবলাম। এব পবে আমি ক্ষেত্রেব, সেই সন্ধি-স্থলেব কথা বলছি, যেখানে চেতন ও অচেতনেব সঙ্গম হয। চেতন এবং অচেতনেব ঐ সন্ধিস্থল কি বকম হবে এটা বোঝা দবকাব। কোন্ সে বিন্দু যেখানে এই দুযেব মিলন হয? আহাব কার্যেব সঙ্গে তুলনা কবে এ বিষয বোঝানো যেতে পাবে। চেতনেব ক্ষুধা লাগে না। চেতন আহাব কবে না। ভোজন চেতনেব কাজ নয। আহাব প্রাণশক্তিব কাজ। এ দিকে চেতনা আছে, অপব দিকে শবীব আছে, আব আছে সেই প্রাণেব ধাবা যাব ক্ষুধা পায, যে খায।

চোখ দেখে। ইন্দ্রিযগুলি আপন আপন কাজ কবে যায। ইন্দ্রিযেব জ্ঞান বলে কিছু নেই। তাদেব জানাব শক্তি নেই। চেতনাব চোখ নেই, আব তাব চোখেব কোন প্রযোজনও নেই। যদি চেতনাব

চোখেব প্রযোজন থাকত তাহলে বলতে হতো অশবীব একেবাবে অন্ধ, কিছুই দেখতে পায না। চেতনাব কোন ইন্দ্রিযেব প্রযোজন নেই, আব ইন্দ্রিয়েব জানার, জ্ঞান লাভ কবাব কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু এমন এক সন্ধিস্থল আছে যেখানে চেতনাব প্রাণধাবাব বিন্দু এবং ইন্দ্রিযেব প্রাণধাবাব বিন্দু মিলিত হয। এই ইন্দ্রিযেব বিন্দু এবং চেতনাব বিন্দুব সন্ধিস্থলকে আযত্ত কবাব চেষ্টা কব। শ্বাস ও প্রশ্বাসেব সঙ্গমস্থলকে আযত্ত কব। চেতনাব শ্বাসেব প্রযোজন নেই। চেতনা এমন দীপ নয যে তাতে তেল দিলে তবে জ্বলবে, তেল না ঢাললে জ্বলবে না, নিভে যাবে। চেতনা তো অখণ্ড জ্যোতি। সে আপনা আপনি জ্বলে। তাব জন্য শ্বাসেব প্রযোজন হয না। কিন্তু শ্বাসেব প্রাণধাবা আব চেতনাব সঙ্গমস্থল বা সন্ধিস্থল আছে। তাদেব মিলনবিন্দু আছে, তাকে আযত্ত কব। এই সব বিন্দু আমাদেব জাগৃতিব বিন্দু হতে পাবে। যদি এই বিন্দুব ওপবে প্রযোগ কবা যায তবে তা জাগৃতিব একটি বিবাট বড় প্রযোগ হবে, আব এই প্রযোগেব দ্বাবা আমবা ঐ সূত্রকে সম্পর্ক কবতে সমর্থ হব, আব শবীব এবং আত্মা ভিন্ন বস্তু—এই কথাব অর্থ বুঝতে পাবব। তা ছাড়া আমাব এ কথা বটনা মাত্র থেকে যাবে। আমবা যখন চেতনা ও শবীবেব মিলনবিন্দু ধবতে পাবব তখনই আমবা তাদেব ভিন্নতা বুঝতে পাবব, তাব আগে নয।

সেই মহৎ মিলনবিন্দু হল—ভাষা। চেতনা কথা বলে না। যে কথা বলে সে চেতনা থেকে ভিন্ন। যে বিন্দুতে ভাষা এবং চেতনাব সঙ্গম হয সেটি একটি মহত্ত্বপূর্ণ বিন্দু। ভাষাব মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে সে শক্তি চেতনা থেকে আসে। উভযেব সঙ্গমস্থলকে আমাদেব বুঝতে হবে, তাদেব মিলনবিন্দুকে আমাদেব ধবতে হবে।

চেতনাব সঙ্কল্প বা বিকল্পেব প্রয়োজন নেই। তাব ইচ্ছাও হয় না। চেতনাব সঙ্কল্পও হয না। ও সব কিছুই মনেব কাজ। চেতনাব মনকে প্রযোজন নেই। কিন্তু চেতনা ব্যতীত মন নিষ্কর্মা হযে যায। তাব নিজস্ব এমন কোন ক্ষমতা থাকে না যে সে সংকলন কববে, ইচ্ছা

করবে, কল্পনা করবে অথবা সঙ্কল্প করবে। তারও এক মিলনবিন্দু আছে।

আহার, শ্বাস, ইন্দ্রিয়, ভাষা এবং মন—এই পাঁচ মিলনবিন্দুকে আমরা ধরব। নিদ্রা এবং জাগরণের মিলনবিন্দু আমরা আয়ত্ত করব এবং নিদ্রিত অবস্থার ভেতরে জেগে থাকব। এই দিকে আমার চেষ্টা চলতে থাকবে।

আমি পাঁচ-ছয় দিক থেকে আপনাদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের যদি এই সব দিকে প্রয়োগ চলতে থাকে তবে এমন এক-দিন আসতে পারে, এমন এক ক্ষণ আসতে পারে যখন আমি অনুভব করতে সমর্থ হব যে আমার চেতনা এবং আমার শরীর দুটি পৃথক বস্তু। আমি এবং আমার শরীর দুটি পৃথক বস্তু। আমি এবং আমার দেহ দুটি আলাদা জিনিস। তা না হলে আত্মা ও শরীরের ভিন্নতার কথা, আত্মা আর দেহের পার্থক্যের কথা শুধু আমাদের মেনে নেওয়ার ব্যাপার, আমাদের ধারণার ব্যাপার হয়ে থাকবে। তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম হব না। ঐ কথা আমরা বারে বারে আবৃত্তি করতে থাকব, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারব না।

এ সবই জাগৃতির সাধনা বা অপ্রমত্ত থাকার সাধনা। ভগবান মহাবীর বলেছেন—সর্বদা অপ্রমত্ত থাকবে। যার চেতনার দীপ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকে সে-ই শুধু অপ্রমত্ত থাকতে পারে। যখন চেতনার ওপরে কোন আবরণ পড়ে, মূর্চ্ছা এসে যায়, তখন চেতনা অগ্রসর হতে পারে না।

এক সুফি সন্ত ছিলেন রাবেয়া। তিনি রোদন করতেন এবং হাসতেন। দুই-ই এক সাথে চলতে থাকত। লোকে বলত, এ বড় অদ্ভুত কথা। কোন মানুষ যদি হাসতে থাকে তবে সে কাঁদে না। কেউ যদি কাঁদতে থাকে তবে সে হাসে না। কোন লোকই হাসা এবং কাঁদা এই দুই কাজ এক সঙ্গে করে না। সে যদি কাঁদে তো কাঁদতেই থাকে, আর যদি হাসে তো হাসতেই থাকে। কিন্তু এই

বাবেযা একই সাথে হাসতেন ও কাঁদতেন। প্রশ্ন হল : দুই কাজ, হাসা ও কাঁদা, এক সঙ্গে কেন? বাবেযাকে প্রশ্ন কবা হযেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তোমবা আমাকে বুঝবে না। আমি একই সঙ্গে দুই বকম কাজ কবি, কিন্তু আমি পাগল নই। আমি দেখি পবমাত্মা সব জাযগায ছড়িযে আছেন, তাঁব সত্য সব জাযগায বিস্তৃত হযে আছে। এই দৃশ্য যখন দেখি তখন হাসি। আমাব মনে হয এই জগৎ কত সুন্দব ও বহস্যময। তোমাদেব যখন দেখি তখনই কাঁদতে থাকি, ভাবি, এত স্পষ্ট ভাবে তিনি দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু তবু তোমবা তাঁকে দেখতে পাও না। তিনি এত স্পষ্ট ভাবে দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু তোমবা অন্ধ হযে তাঁকে দেখতে পাও না। এই দেখে আমাব কান্না পেযে যায।'

আমাদেবও একই বকম অবস্থা হযে আছে। চেতনা থেকে শবীব আলাদা। এ দুটোই স্পষ্ট। চেতনা স্পষ্ট, তাব অস্তিত্ব স্পষ্ট, তাব কাজও স্পষ্ট। আবাব শবীবও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমবা এই পার্থক্যেব বিন্দু ধবতে পাবি না। আমি বলি কি মিলনবিন্দুকে ধব, সঙ্গমস্থলকে আযত্ত কব। কত স্থূল কথা। কিন্তু তবুও ধবতে পাবি না। মিলনবিন্দু কোথায তা উপলব্ধিতে আসে না। কোথায বিচ্ছিন্নতা, এই স্থূল তথ্যও আমবা বুঝতে পাবি না। যদি চেতন আত্মা আব অচেতন শবীবেব সঙ্গমস্থল আমবা ধরতে পাবি, সন্ধিস্থল জানতে পাবি, মিলনবিন্দু বুঝতে পাবি, তবে ঐ দুযেব বিভিন্নতাও জানতে আমবা সফল হব।

যে মৃত্যুকে দেখতে পায না, সে মৃত্যুভযে অত্যন্ত ব্যাকুল হয। যখনই তাকে কেউ বলে, তোমাব মৃত্যু হবে, সত্যি সত্যি সেই মুহূর্ত থেকে তাব মৃত্যু শুরু হযে যায, তাব মনেব ওপবে মৃত্যু নামতে শুরু কবে। যখন মনে হয মৃত্যু আসছে, তাব সাবা শবীব ভযে বিকৃত হযে যায। শবীব শক্ত হযে যায। শবীব কেন শক্ত হয? সে মাবা যাচ্ছে বলে নয, মৃত্যুভয় তাব শবীবকে শক্ত কবে দেয। উদ্বেগ এনে দেয। মৃত্যুব প্রক্রিযা এই—শবীবকে ঢিলে কবে দেয, শিথিল কবে

দেয, আব আমাদেব চেতনা এমনভাবে তৈবি কবব যে, আমাদেব আত্মা শবীব থেকে আলগা হযে গেলেও মনে হবে কিছুই হয নি। শবীব তো শিথিল হযেছে। আব আমবা তো শুরু থেকে মবাব জন্য প্রস্তুত হযেছি। শবীব শিথিল হওযাব অর্থ, মৃত্যুব জন্য তৈবি হওযা। যে সর্বদা মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত থাকে তাব শবীবে বিকৃতি হয না, উদ্বেগ হয না, ভয হয না। কোন কিছুই হয না। এই জন্য জৈন আচার্যগণ মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বই হল, 'মৃত্যু মহোৎসব।' মৃত্যু এক মহোৎসব। তা মহোৎসব, কিন্তু তুমি তা থেকে ভীত হও, এ কি বকম ব্যাপাব। মহোৎসব হবে মঙ্গলগীত, প্রীতি, উল্লাস, আনন্দপূর্ণ আলাপ। কিন্তু ভযেব কথা তো হতে পাবে না। মৃত্যু মহোৎসব বটে। তা থেকে আবাব ভয কি ?

জগদীশ কাশ্যপ নামে মস্ত বড এক বৌদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁব সদ্য দেহাবসান হযেছে। একবাব তিনি এক পত্র দ্বাবা আমাদেব জানিযে-ছিলেন, 'আমি অন্তিম সমযে জৈন পদ্ধতিতে সমাধি মৃত্যুতে মবতে চাই। সেই জন্যে আপনি ঐ পদ্ধতি সম্পূর্ণ লিখে জানিযে দিন। কাবণ মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত হওযাব যেবকম বিববণ জৈন সাধনা পদ্ধতিতে দেওযা হযেছে সম্ভবত অন্যত্র তা দুর্লভ।'

জৈন সাধনায মৃত্যুব জন্য প্রস্তুতি বাব বছব আগে থেকে আবম্ভ হযে যায। বাব বছব আগে থেকে মৃত্যুব জন্যে প্রস্তুতি। অর্থাৎ মৃত্যু এমন একটি ঘটনা যাব জন্যে প্রস্তুত হতে বাব বছব লাগা উচিত। এ কথা যথার্থ।

আপনাবা দেখে থাকবেন, ছোটখাটো অপাবেশনেব আগেও অনেক বড় প্রস্তুতি আবশ্যক হয। অপাবেশন হবে একটি অঙ্গেব, কিন্তু তাব জন্য ডাক্তাবকে বেশ বড ধবনেব প্রস্তুতি নিতে হয। এক অপাবেশনেব জন্যে কত ডাক্তাব, কত নার্স, কত উপকবণ, কত যন্ত্র, কত ওষুধ তৈবি বাখতে হয। তাব কাবণ, একটি অবযবেব অপাবেশনেব ফলে অন্যত্র কোন অবযবেব ওপবে প্রভাব পডতে পাবে। তাকে নিবাপদ বাখাব

জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

মৃত্যু সমস্ত শরীরের ওপরে অপারেশন। সমস্ত শরীর থেকে সম্পূর্ণ চেতনার নির্গমন, চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নকরণ—এ কত বড় অপারেশন। এর জন্য বার বছর ধরে প্রস্তুতি প্রত্যাশিত। একে সংলেখনা বলা হয়ে থাকে। সংলেখনার কাল—বার বছর। বার বছর আগে থেকে এভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া হয় যাতে সাধনাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রদ হয়। বার বছর ধরে অনশন করতে হয়, তারপরে সমাধি-মৃত্যু। কত মহৎ প্রস্তুতি। কত সুন্দর ক্রমবিন্যাস। এ বিষয়ে কেন এত লেখা হয়েছে? কেন এত বলা হয়েছে? এর কারণ কি? আমরা কারণ বুঝে নিতে চেষ্টা করি। কারণ এই যে, মৃত্যু সব চেয়ে বড় মূর্চ্ছা। মৃত্যু সবচেয়ে বড় বেহুঁশ অবস্থা। এই বেহুঁশ হওয়ার মুহূর্তে যাতে আমাদের চেতনার দীপ নিভে না যায়, আমরা মূর্চ্ছিত না হই, আমরা জেগে থাকতে পারি, তার জন্য এই প্রস্তুতি। মৃত্যুর ক্ষণে যে জাগ্রত থাকে সে চিরকাল জেগে থাকে। যে মৃত্যুর মুহূর্তে জেগে থাকতে পারে সে চিরকালের জন্য অপ্রমত্ত স্থিতি লাভ করে, সর্বকালে জাগ্রত থাকে। এই রকম জাগৃতির ক্ষণের জন্য আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি চলতে থাকে।

অপারেশনের সময় রোগীকে বেহুঁশ করবার জন্য তাকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল অন্য রকম উপায় অবলম্বন করা হয়। রোগীকে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে মূর্চ্ছিত করা হয় এই জন্য যে, ঐ অপারেশনের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তার সহ্য হবে না। এতে যন্ত্রণার অনুভূতি হয় না। বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফলে তার চেতনা লোপ পেয়ে যায়, সে শান্ত হয়ে যায়, আর খুব বড় অপারেশনও অত্যন্ত সহজভাবে সম্পন্ন হয়।

অপারেশনের জন্য মূর্চ্ছার অবস্থা আনতে হয় যাতে তার অপারেশনের জন্য কষ্টের অনুভূতি না হয়। সম্ভবত প্রকৃতি মেনে নিয়েছে যে, মৃত্যু মস্ত বড় অপারেশন, আর মূর্চ্ছা না হলে মানুষ কি করে যন্ত্রণা সহ্য করবে। এই কারণে মৃত্যুর পূর্বে কেউ দু ঘণ্টা, কেউ বা চার ঘণ্টা আগে,

কেউ বা দুদিন কিংবা চাব দিন আগে বেহুঁশ হযে যায, কেননা সমস্ত শবীবেব ওপবে অপাবেশন হচ্ছে, মৃত্যু আসছে। কেবল যে লোক জাগৃতিব সাধনা কবে সিদ্ধ হযেছে সে-ই বেহুঁশ হয না।

অপাবেশনেব আগে সবাইকে বেহুঁশ কবা হয। কেবল যে জাগৃতিব সাধনায সিদ্ধ হযেছে তাব কোন মূর্চ্ছাকাবী ওষুধেব প্রযোজন হয না, ইনজেকশনেব প্রযোজন হয না বা বিদ্যুৎ প্রযোগেব কোন প্রযোজন হয না।

আমবা এ বকম দেখেছি। এক মস্ত বড শ্রাবক ছিলেন। তাঁব নাম ছিল চাঁদমলজী বৈদ। তিনি বাজল দেশেব অধিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁব শবীবেব কোন গুহ্য স্থানে অপাবেশনেব প্রযোজন হযেছিল। তিনি ধ্যানমুদ্রায অবস্থিত হযে ডাক্তাবকে বললেন, 'আপনাব যা কবাব আছে তা ককন। যতটা কববাব প্রযোজন ততটাই ককন। আমি বসে আছি।' ডাক্তাব বললেন, 'তা কেমন কবে সম্ভব হবে? এত বড অপাবেশন। অচেতন না কবে, মূর্চ্ছিত না কবে এ কেমন কবে হবে? আপনি এই কষ্ট কি কবে সহ্য কববেন?' তিনি বললেন, 'আমি ধ্যানে বসে আছি। আপনি চিন্তা কববেন না। আপনাব যা কবাব তাই ককন।' তাই কবা হল। তিনি ধ্যানে বসে থাকলেন আব অপাবেশন কবা হযে গেল।

আমি স্বযং দেখেছি। যোধপুবে শ্রীকালুগণীব চাতুর্মাস ছিল। মুনি কুন্দনমলজীব অর্শেব অপাবেশন হওযাব কথা ছিল। তিনি শুযে পডলেন। তাঁব বড ভাই মুনি চৌথমলজী আব মুনি মোহনলালজী অর্শ কাটতে শুক কবলেন। মুনি কুন্দনমলজী বললেন, 'সাধু ভাইসব, দেখো, পুবো লক্ষ্য বাখবে। কাজ অর্ধসমাপ্ত না থেকে যায। যতটা কাটা দবকাব সবটাই কেটে দেবে।' এও এক স্থিতি। মূর্চ্ছিত না হযে, জাগ্রত থেকে এই কষ্টেব ধাক্কা সহ্য কবা তখনি সম্ভব হয যখন ভেতবে কিছু জেগে যায।

কাশীব নবেশ সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। তাঁব অপাবেশন হচ্ছিল।

ডাক্তাররা তাঁকে বেহুঁশ করার জন্যে ওষুধ শোঁকাতে চাইলেন। নরেশ নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, 'আমার গীতা এনে দিন। আমি গীতা পড়তে থাকব আর আপনি আপনার কাজ করতে থাকবেন।' তিনি গীতা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং এমন এক জগতে চলে গেলেন যেখানে তাঁর শরীরে কি ঘটছে তা তাঁর খেয়াল রইল না। আমরা অন্তরে এই রকম জ্যোতি জ্বেলে দিলে সেই আলো জ্বলার পরে শরীরে কি ঘটছে তা কিছুই জানতে পারি না। যা ঘটার তা ঘটে। এই জাগৃতির ক্ষণ আমাদের জীবনে এসে গেলে আমরা আর মূর্চ্ছিত হই না। মৃত্যুবিজয়ের এ এক বড় সাধনা। যে লোক মৃত্যুর মুহূর্তে মূর্চ্ছিত হয় না, যে জেগে জেগে মৃত্যুকে বরণ করে, সে সত্যিসত্যিই কিছু পেয়ে যায়।

আমাদের সঙ্ঘের একটি ঘটনার কথা বলছি। এক মুনি ছিলেন। তিনি একজন মস্ত বড় তপস্বী ছিলেন। তিনি ছাব্বিশ বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। প্রতি বছর তিনি মাসখমন করতেন। তিনি তেরাপন্থের চতুর্থ গণী শ্রীমজ্জয়াচার্যের বড় ভাই মুনি ভীমরাজের সঙ্গে থাকতেন। ভীমরাজজীর দেহাবসান হল। দাহসংস্কারের জন্য লোকে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য এল। তপস্বী মুনি অন্যান্য মুনিদের ডেকে বললেন, 'দেখ, আমি এত দিন যাঁর সাথে রইলাম তিনি আজ চলে গেলেন। তিনি যখন চলে গেলেন তখন আমার আর এখানে থাকার কি প্রয়োজন? সাধুগণ, তোমরা এই সব পুথিপত্র রক্ষা করবে। আমি চলে যাচ্ছি।' এই কথা বলে তিনি স্বর্গে গেলেন। তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। লোকে আগের দাহসংস্কার করে ফিরতে না ফিরতে আর এক মুনি চলে গেলেন। একে বলে ইচ্ছামৃত্যু, সঙ্কল্পমৃত্যু। যে সব লোক জাগ্রত অবস্থায় মারা যান তাঁদের এই রকম মরণ হয়, তাঁরা সম্পূর্ণ জাগরূক অবস্থায় মারা যান।

এক মস্ত বড় সাধক ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'লোকে বেহুঁশ হয়ে মরে। আমি বেহুঁশ হয়ে মরব না। আমি চলতে চলতে মরব।' এক দিন তিনি দেখলেন মরণ আগতপ্রায়। সেই ক্ষণ যখন নিকটে এল

তখন তিনি ঘুমোতে আবম্ভ কবলেন। নিদ্রিত অবস্থায তিনি মবলেন। অনেক লোক বেহুঁশ অবস্থায মাবা যায, কেউ ঘুমোতে ঘুমোতে মাবা যায। বসে বসে, দাঁডিযে, চলতে চলতে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায মাবা যায এমন লোকেব সংখ্যা কম। আচার্য ভিক্ষুব পদ্মাসনাবস্থায মবণ হযেছিল। তিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন। প্রমাদগ্রস্ত অবস্থায মবেন নি। তিনি 'সুত্তেসু যাবি পডিবুদ্ধজীবী' অর্থাৎ সুপ্ত লোকদেব মধ্যে জাগ্রত অবস্থায ছিলেন। সুপ্ত অবস্থাতেও জাগ্রত লোক ছিলেন। যে লোক জাগৃতি ও সুষুপ্তিব বিন্দু ধবতে পাবে সেই শুধু মবাব সমযে জাগ্রত থাকতে পাবে।

আমাদেব সাধনাব অভ্যাস চলছে। এই সাধনাব অভ্যাসকালে আমবা দেখাব এবং জাগ্রত থাকাব সঙ্কল্প কবেছি। আমবা দেখি আব জেগে থাকি। দেখাব এবং জেগে থাকাব সঙ্কল্প কবি। এই দেখাব এবং জাগাব সঙ্কল্প একদিন সেই জ্যোতিকে জাগিযে দেবে যাকে কোন ব্যাধি বা মবণেব আগমন নিভিযে দিতে পাবে না। তাবা কখনও বেহুঁশ হবে না, প্রচণ্ড হবে না, তাদেব জাগৃতি কখনও খণ্ডিত হবে না। কিন্তু আপনি সতর্ক থাকবেন, আপনাব অন্তবে জ্যোতি জ্বলে ওঠাব আগে আপনি ঘুমিযে না পডেন। এ একটি সমস্যা। এই সমস্যা সম্বন্ধে যদি আমবা জাগবূক তা থাকি তবে ঐ স্থিতি আমবা লাভ কবতে পাবব না। এব জন্য খুব দৌডঝাঁপ কবাব দবকাব নেই, এলোমেলো ভাবে ঘুবে বেডানোব দবকাব নেই। কাবও কাছে যাওযাব কোন প্রযোজন নেই। এ নিজেকেই কবতে হবে। আমাব নিজেবই আত্মাকে দেখতে হবে। সত্যকে আমাব নিজেবই সন্ধান কবতে হবে। এই হল পথ।

যে নিজেকে আত্মাব কথা বলে সে আপনাকে আত্মা দেখাতে পাবে না। আপনি নিজে চেষ্টা কবলে আত্মাব দেখা পেতে পাবেন। আপনি দুনিযাব কোন কোণে চলে যান, কেউ আপনাকে সত্য দান কবতে পাববে না। সত্যেব সন্ধান আপনাব নিজেকেই কবতে হবে। অন্য

লোক আপনাকে কোন সঙ্কেত বলে দিতে পাবে, ইশাবা কবতে পাবে। বাস্তা দেখিযে দিতে পাবে, কিন্তু তাবপবেব প্রচেষ্টা আপনাকেই কবতে হবে, আপনাকেই পথ চলতে হবে। সমস্তই আপনাব চেষ্টার ওপবে নির্ভব কবে, আপনাব নিষ্ঠাব ওপবে নির্ভব কবে, আপনাব একাগ্রতা এবং তন্ময়তাব ওপবে নির্ভব কবে। আপনি মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে কতখানি সমর্থ হযেছেন, জাগৃতিব আলো কতখানি প্রজ্জ্বলিত কবতে পেবেছেন, আলোকে সেই বিন্দুব ওপবে কতটা নিযে যেতে পেবেছেন, যেখানে সে আলো নিবন্তব জ্বলে, কখনও নেভে না—এই সমস্ত কিছুব ওপবে নির্ভব কবে। পবিস্থিতিতেই সেই কথা সার্থক হবে—'ভাকণ্ড পক্ষী উহ্ চবপ্পমত্তো' অর্থাৎ ভাকণ্ড পাখিব মত সদা জাগৃত থাক। যদি আত্মাকে বক্ষা কবতে চান, নিজেকে বাঁচাতে চান তো জাগ্রত থাকুন।

ভগবান মহাবীবেব বাণীব সন্দর্ভ থেকে যে সত্য বুঝতে পেবেছি, অনুশীলন কবেছি, অভ্যাস কবেছি সেই সত্য মনে বাখতে হবে। আব এই অভ্যাসেব ধাবাকে সর্বদা প্রবহমান বাখতে হবে। আমাব বিশ্বাস, আমবা একদিন সেই জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত কবতে পাবব যে জ্যোতিকে বোগেব ধাক্কা নেভাতে পাববে না, মৃত্যুব ভযঙ্কর ঝঞ্ঝা নেভাতে পাববে না।

১০

অনুপ্রেক্ষা

আমরা এতক্ষণ প্রেক্ষা ধ্যানের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। এই প্রেক্ষাধ্যানের পদ্ধতিতে আমরা তিনটি তত্ত্বকে অবলম্বন করে থাকি। সে তিনটি তত্ত্ব—শ্বাস, ধ্বনি ও শরীর। আমাদের শ্বাস সহজ এবং স্বাভাবিক, ধ্বনি স্বকৃত এবং কাল্পনিক, আর শরীর সহজ এবং স্বাভাবিক। আমরা স্বাভাবিককে অবলম্বন করি না, স্বকৃত এবং কল্পনাকে অবলম্বন করে থাকি। আমি মনে করি তার প্রয়োজন আছে, তাকে আমি অনাবশ্যক বলতে পারি না। আমরা মাঝে মাঝে এই তিন অবলম্বনের আলোচনা করে থাকি, আর আমরা যা করে থাকি তা বোঝার জন্য চেষ্টা করি। আজ আমরা ধ্বনির বিষয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনা আমি ছোট একটি গল্প দিয়ে আরম্ভ করতে চাই।

কোন লোক পুকুরের ধারে বেড়াতে যেত। ওটা ছিল তার প্রতিদিনের নিত্যকর্ম। পুকুরের জলে তার প্রতিবিম্ব পড়ত। পুকুরে অনেক মাছ ছিল। একটি মাছ পুকুরের জলে মানুষটির প্রতিবিম্ব দেখত। সে দেখত—মাথা নিচে, পা ওপরে। একদিন দেখল, দু দিন দেখল, দশ দিন দেখল। তার ধারণা দৃঢ় হল। সে জানল যার

মাথা নিচে, পা ওপরে, সে মানুষ। একদিন লোকটি পুকুরের কিনারায় বেড়াচ্ছিল। মাছটি সেই সময়ে জলের ওপরে ভেসে উঠল। তখন সে দেখল লোকটার সব উল্টো, তার মাথা ওপরে আর পা নিচে। মাছটি ভাবল—সম্ভবত লোকটি শীর্ষাসন করেছে। তা না হলে মানুষ ও রকম হতে পারে না। যার মাথা নিচে, পা ওপরে সেই মানুষ। আজ আমি দেখছি এর মাথা ওপরে, পা নিচে। এ নিশ্চয়ই উল্টো বা বিপরীত ক্রিয়া করছে, শীর্ষাসন করছে। তার ধারণা দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল।

ঐ মাছটিরই কেবল ঐ অবস্থা হয়েছিল তাই নয়। আমাদের সকলেরই ঐ অবস্থা। মাথা ওপরে, কিন্তু আমরা দেখি মাথা নিচে। পা নিচে, কিন্তু আমরা দেখি পা ওপরে। আমরা ধারণা করে থাকি যার পা ওপরে মাথা নিচে সে-ই মানুষ, আর যার মাথা ওপরে পা নিচে সে মানুষ নয়। এ আমাদের কল্পনার রচনা। এ রকম কত ধারণা আমরা উদ্ভাবন করি তা আমি বলতে পারব না। ঐ সবই মিথ্যা ধারণা। মিথ্যা ধারণা বিলোপ করার জন্য প্রেক্ষাধ্যান পদ্ধতিতে অনুপ্রেক্ষার অভ্যাস করা হয়। দুটি কথা আছে—প্রেক্ষা এবং অনুপ্রেক্ষা। আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি, প্রেক্ষা কথাটির আগে 'অনু' কেন প্রয়োগ করা হয়েছে? এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে আমি একটা কথা বুঝতে পেরেছি—যা সত্য, তাকে দেখাই অনুপ্রেক্ষা। সত্যকে দেখ। নিজের ধারণার বশবর্তী হয়ে তাকে দেখ না। মাছের ধারণা হয়েছিল যার মাথা নিচে পা ওপরে সে-ই মানুষ। এই ধারণা অনুসারে সে মানুষকে দেখত। এই রকম স্বীয় ধারণা অনুযায়ী বস্তুকে দেখা অনুপ্রেক্ষা নয়। নিজের ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু দেখ না। সংস্কারের দৃষ্টিতে দেখ না। কাল্পনিক বুদ্ধিতে দেখ না। কেবল সত্যের দৃষ্টিতে সব কিছু দেখ। বাস্তবকে দেখ, যথার্থকে দেখ। যা সত্য, যে ঘটনা বাস্তবে ঘটছে তাকে দেখ। অনুপ্রেক্ষার অর্থ—সত্যের প্রতি অনুপ্রেক্ষা। অর্থাৎ সত্যের প্রতি, যথার্থের প্রতি অনুপ্রেক্ষা, বাস্তবের প্রতি অনুপ্রেক্ষা। ধার করা ধারণার অনুবর্তী হয়ে কোনও কাজ করো না,

যা ঘটনা, যা বাস্তব, যা সত্য, তাকে দেখ। এই বকম অনুপ্রেক্ষাব তাৎপর্য, আমবা আমাদেব মনগড়া ধাবণাকে মন থেকে বহিষ্কৃত কবে দিই। আপনি পূর্বেব ধাবণা ত্যাগ করুন এবং যা সত্য ও যথার্থ তাকে দেখুন। প্রেক্ষা ধ্যান পদ্ধতিতে এই অনুপ্রেক্ষাব অভ্যাস কবা যায়। অনুপ্রেক্ষা অভ্যাস কবাব কাবণ, তদ্বাবা আমবা সংস্কাবকে, ধাবণাকে ভঙ্গ কবে যা বাস্তব সত্য তাকে দেখতে শিখি। এটা সবচেযে কঠিন সত্য। সবচেযে দুঃখেব বিষয যে, মানুষ সত্যকে দেখে না। সে সবাব আগে স্বকীয ধাবণাব চশমা মনেব চোখে লাগিযে নেয, তাব পবে দেখা শুরু কবে। যা দেখে তা যদি স্বীয ধাবণাব অনুযাযী হয নি তবে তাকে দুমড়ে মুচড়ে নিজেব মনেব মত কবে নেয।

অনুপ্রেক্ষাব সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে সত্যকে দর্শন কবাব সিদ্ধান্ত। সত্যেব কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ কব। নিজেব কোন ধাবণাতে কোনও গুরুত্ব আবোপ কবো না। যা সত্য তাকে গ্রহণ কব, স্বীকাব কব। তাব নাম অনুপ্রেক্ষা।

সমস্ত সংসাব প্রকম্পনেব সংসাব, অর্থাৎ অত্যন্ত চাঞ্চল্যপূর্ণ। এটাই পবম সত্য। কেবল কম্পন, কেবল চঞ্চলতা, কেবল অস্থিবতা। প্রকৃতিতে এত আন্দোলন, এত চঞ্চলতা যে, তাব কথা ভাবলে বিস্মযে চমকিত হতে হয। এতই প্রচণ্ড আন্দোলন যে যদি তা দেখতে থাকি, শুনতে থাকি তা হলে আমাব শাবীবিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যযিত হবে। আমাদেব পক্ষে এটা মঙ্গল যে আমাদেব কানেব পর্দা এ ভাবে তৈবি যে সে সব প্রকম্পনেব শব্দ গ্রহণ কবতে পাবে না। যদি মানুষ তাবৎ প্রকম্পন গ্রহণ কবতে পাবে তবে এক দিনেই সে খতম হযে যাবে। সে বেঁচে থাকতেই পাববে না। এই সংসাবে এত ভযঙ্কব শব্দ হচ্ছে, এত ভীষণ ধ্বনি হচ্ছে যে তা শোনাব ক্ষমতা আমাদেব নেই। আমবা ঐ শব্দ শুনতে বা সহ্য কবতে পাবব না। আমরা অনেক কষ্টে কিছু ডেসিমেল পর্যন্ত শব্দ গ্রহণ কবতে পারি, শুনতে পাবি। এই দুনিযায় অনেক অনেক ধ্বনি হচ্ছে। আমবা ঐ সমুদয ধ্বনি সহ্য

করতে অসমর্থ। আমরা যখন চিন্তা করি তখন এক প্রকম্পনের ধারা প্রবাহিত করি। আমরা কথা বললে এক প্রকম্পনের তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়। আমরা চললে প্রকম্পন সৃষ্ট হয়। আজ যারা জীবলোকে বর্তমান আজ তারাই যে শুধু প্রকম্পনের বিস্তার করেছে তাই নয়। এই দুনিয়ায় যত লোক ছিল, হাজার হাজার বছর আগে যারা জীবিত ছিল, তারা এই দুনিয়ার ওপরে এমন এক বিশাল প্রকম্পনের জাল বিছিয়ে রেখেছে, আমাদের গুরুত্বাকর্ষণমণ্ডলের উপরিভাগে সেই প্রাচীন লোকেরা এমন বিপুল প্রকম্পনের জাল বিস্তার করে রেখেছে যে, আজ তার কোনও লেখাজোখা করা যায় না। তার হিসাব করাও কঠিন। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানে লেখাজোখা করতে পারে না এমন কোন জিনিসই নেই। বিজ্ঞান সব গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় নিযুক্ত আছে।

আজকাল কোন কোন বৈজ্ঞানিক ঐ প্রকম্পনের পরিমাণ নিরূপণের জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানেন যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণমণ্ডলের উপরিভাগে হাজার হাজার বছর আগেকার লোকের চিন্তাসমূহের প্রকম্পন জমা হয়ে আছে, তারা যা বলেছিল তার প্রকম্পনও পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ঐ বৈজ্ঞানিকরা এমন এক উপায় অন্বেষণ করছেন, এমন যন্ত্র নির্মাণ করার চেষ্টা করছেন যার মাধ্যমে ঐ সমুদয় প্রকম্পনের পরিমাপ করতে সক্ষম হতে পারেন, প্রাচীন কালের সমস্ত চিন্তা ও বিচার বুঝতে পারেন, পড়তে পারেন। এই এই যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা জানতে চান যে আজ মহাবীর, বুদ্ধ, যীশুখৃস্টের যে সব বাণী জগতে প্রচলিত আছে সেগুলি যথার্থ কিনা, তাঁদের বাণী লোকে যে রকম উপলব্ধি করেছে সেটাই শুদ্ধ সত্য কিনা। তাঁরা জানতে চান মহাবীর, বুদ্ধ এবং খৃস্টের যে বাণী সাধুরা প্রচার করেছেন তাঁরা কি সেই সব কথাই বলেছিলেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁদের ভক্তরা তাঁদের বাণীতে কোন কোন্ কথা জুড়ে দিয়েছেন, কোন্ কোন্ কথাই বা ছেড়ে দিয়েছেন, বৈজ্ঞানিকরা এই উপায়ে সে সমস্ত জানতে সমর্থ হতে পারেন। তাঁরা পরীক্ষা করে, যাচাই করে

ভালভাবে দেখতে চান কোন্ কথাই বা আসল বা মূল, আর কোন্ কথাই বা মিশ্রিত বা প্রক্ষিপ্ত। এই চেষ্টা চলছে। এ শুধু কল্পনার ফানুস আকাশে ওড়ানো নয়। এসব যথার্থ তথ্য। আজ বিজ্ঞান এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে তাদের পক্ষে কিছুই কল্পনাবিলাস মাত্র নয়। বিজ্ঞান আজ আমাদের কল্পনাকে সাকার করতে চলেছে। তার কাছে সূক্ষ্মতম উপকরণ, সাধনের যন্ত্র আছে।

আমি শুধু প্রকম্পন সৃষ্টি করি তাই নয়। সারা দুনিয়ার বায়ু-মণ্ডলকে শুধু আমি প্রকম্পিত করি না। অনাদি কাল থেকে বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, প্রকম্পিত হচ্ছে। আমার দ্বারা সৃষ্ট প্রকম্পন তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলে জমা হচ্ছে।

এ অনেক পুরনো কথা। আমি 'বিশেষাবশ্যক ভাষ্য' নামে এক প্রাচীন গ্রন্থ পড়েছিলাম। ঐ পুস্তকে এক জায়গায় পড়েছিলাম যে, আমরা যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পাশে পুকুর থাকলে ঐ নিঃশ্বাস-বায়ু পুকুরের জলে ছড়িয়ে পড়ে আর জলচর জীবদের পীড়া দেয়, তাদের ব্যাকুল করে। যখন আমরা কাপড় ছিঁড়ি তখন সূক্ষ্ম রোম হাওয়ায় সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং চারদিকে জীবকে আঘাত করে। এ রকম লেখা আছে যে, সজীব বনস্পতির ওপরে অনিমেষ ধ্যান করা উচিত নয়, কারণ অনিমেষ ধ্যানের সাথে সাথে আমাদের দেহ থেকে যে চুম্বকীয় বিদ্যুৎ নিঃসৃত হয় তা সজীব চারা গাছের জীবনকে ক্লেশ দেয়, তার শরীরে পীড়া সৃষ্টি করে। এই কারণে সেই পুস্তকে সজীব বস্তুর ওপরে ধ্যান করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষ্প্রাণ বস্তুর ওপরে ধ্যান করা উচিত। জৈন আগম গ্রন্থে বলা হয়েছে মুনিদের শুধু মাটির ওপরে বসা উচিত নয়, কারণ শরীরের গরমে মাটিতে জীবনের পীড়া হয়। সেইজন্য সাধুদের কখনও অনাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় উপবেশন করা উচিত নয়। কত সূক্ষ্ম নীতিবোধ বা বিবেচনার কথা। কাপড় ছেঁড়ার সময়ে যে সূক্ষ্ম রোম হাওয়াতে উড়ে যায় তাতে প্রাণীরা আঘাত পেতে পারে, এই কথার অর্থ বুঝতে পারে এমন

লোক তখন ছিল না। কিন্তু যখন দেখি বিজ্ঞানেব উপলব্ধি, গবেষণা ও অন্বেষণমূলক প্রবন্ধে এ কথা বোঝানোব চেষ্টা হয়েছে তখন আমাদেব মনে হয় যে. আমাদেব আচার্যগণ যা লিখেছেন তাঁবা নিঃসন্দেহে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানেব ক্ষমতায় লিখেছেন। তাঁবা দেখেছিলেন, তাঁবা প্রত্যক্ষ কবেছিলেন. তাঁবা অনুভব কবেছিলেন, এবং তাঁদের দৃষ্ট ও অনুভূত তথ্য নিজেদেব আচাবেব মধ্যে গ্রহণ কবেছিলেন। কিন্তু সাধাবণ মানুষেব কাছে ঐ তত্ত্ব কঠিন এবং দুর্বোধ্য থেকে গিয়েছে। বাড়িব তেতলায দাঁড়িযে এক ব্যক্তি নিচে দাঁড়ানো একজনকে বলল, 'ওহে, বাস আসছে, গাড়ি আসছে, অমুক লোক আসছে।' নিচেব লোকটি বলল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কোথায বাস? কোথায গাড়ি? অমুক লোকই বা কোথায়? কোন কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। তুমি মিথ্যা কথা বলছ।' ওপবেব লোক যা বলেছে তাও যথার্থ, আবাব নিচেব লোকটি যা বলেছে তাও ঠিক। এ-ও মিথ্যা কথা বলছে না, অপবজনও মিথ্যা কথা বলছে না। উভযেব দর্শনেব মধ্যে যে ভিন্নতা তা হল, শুধু পৃষ্ঠভূমির প্রভেদবশত। তেতলায় দণ্ডাযমান লোকেব দৃষ্টি বহু দূব পর্যন্ত যায, তাব ফলে সে বাস দেখেছে, গাড়ি দেখেছে এবং লোককে আসতে দেখেছে। নিচে মাটিব ওপবে দণ্ডাযমান লোকেব দৃষ্টি দূবে যায না, তাব ফলে সে বাসও দেখতে পায় না, গাড়িও দেখতে পায না, মানুষও দেখতে পায় না। দুজনেব জানাই ঠিক। কেবল দুজনেব দেখাব মধ্যে পৃষ্ঠভূমিব ভেদ। যে বলছে, 'আমি দেখেছি', সে-ও সত্য কথা বলছে। আবাব যে বলছে, 'আমি কিছুই দেখি নি', সে-ও সত্য কথা বলছে। দুজনেব একজনও মিথ্যা কথা বলছে না। কেবল পৃষ্ঠভূমিব প্রভেদ।

আমাদেব পশ্চাৎভূমিব তফাৎ হয। যাঁবা অতীন্দ্রিয জ্ঞানেব গভীবতায় প্রবেশ কবে চেতনাব অন্তঃস্থলে গিয়েছেন তাঁবা যে সত্য উদ্‌ঘোষিত কবেছেন, যে তথ্যেব অভিব্যক্তি দিয়েছেন, যে বহস্য উদ্‌ঘাটিত কবেছেন, যে সত্যেব আববণ উন্মোচন কবেছেন, সবই আমবা

অস্বীকার করতে পারি, বলতে পারি ঐ রকম হয় না। কেননা যে পটভূমিকায় অবস্থিত থেকে তাঁরা ঐ সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘোষিত করেছেন, ঐ সমস্ত সত্য প্রকাশিত করেছেন সেই ভূমিতে আমি পৌছতে পারি না। ঐ ভূমিকা অনেক উঁচু। আমরা নিচে ধরাতলে দাঁড়িয়ে আছি। ধরাতলে দণ্ডায়মান লোক ঐ সব সত্যকে অস্বীকার করতে পারে। বস্তুত তারা অস্বীকার করেও থাকে। ঐরূপ করাতে তার কোন ত্রুটি হয়েছে এ কথা বলা যায় না। কারণ সে যে পটভূমিতে অবস্থিত, যে ধরাতলপরে যে দাঁড়িয়ে আছে, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে দেখছে, তাতে তার ঐ রকম বিচার হওয়াই সম্ভব, তা থেকে ভিন্ন কিছু দর্শন হতে পারে না। তার বিচার অন্য রকম কিছু হওয়া সম্ভব নয়। যদি আমার সামনে জানলা খোলা থাকে, আর আমি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকি তবে আমি বাইরের সমস্ত দৃশ্য দেখতে পাব, বলতে পারব, আমি পাহাড় দেখেছি, গাছ দেখেছি, মন্দিরের ধ্বজা দেখেছি, বালুর টিলা দেখেছি। আমার ও কথা যথার্থ হবে, বাস্তবিক হবে। কিন্তু যে লোক জানলা থেকে নিচে বসে আছে, সে পাহাড় দেখতে পাবে না, গাছ দেখতে পাবে না, মন্দিরের ধ্বজা বা বালুর টিলা কিছুই দেখতে পাবে না। সে বলবে, ওসব কিছুই নেই। কোন কিছুই সে স্বীকার করবে না। তার এই অস্বীকৃতিতে তার কোন দোষ নেই।

আমরা যদি এই ভূমিকাভেদ বুঝে চলি তবে এ কথা আমাদের বোধগম্য হবে যে, সূক্ষ্ম জগৎ এবং স্থূল জগতের যে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃতি এবং ধারণা তা অকারণ নয়। তার পেছনে কারণের দীর্ঘ শৃঙ্খল আছে। আমরা সেই কারণ উপলব্ধি করে অনুপ্রেক্ষার কাছে যেন নিজেকে সমর্পণ করে দিই। আমরা প্রেক্ষা ধ্যান প্রয়োগ দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা এমন এক সংস্কার তৈরি করে নেব যে আমরা সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব। ধারণার মধ্যে আমরা যাব না। তাকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। যে জিনিস যেমন, যে ঘটনা যেমনভাবে ঘটছে, যে জিনিস যেমন রূপে আমাদের সামনে আসছে, তাকে যদি তেমনি রূপে আমরা

স্বীকাব কবে নিই, তবে আমাদেব সাধনামার্গ প্রশস্ত হবে, স্পষ্ট হবে। সাধনাতে বড বাধা আসে অসত্য থেকে, মিথ্যা ধাবণা থেকে, মিথ্যা কল্পনা থেকে। ঐ সবকে একেবাবে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সব পুবনো ধাবণাকে ভেদ কবাব জন্য নতুন ধাবণা তৈবি কবতে হবে, পুবনো সংস্কাবকে দুব কবাব জন্য নূতন সংস্কাব তৈবি কবতে হবে। পুবনো কল্পনাকে দূবীভূত কবাব জন্য নতুন কল্পনা নির্মাণ কবতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, পুবনো সব কিছু ভেঙ্গে ফেললে তাদেব জাযগায নতুন সব কিছু নির্মাণ কবা কেন। এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। আমবা যেন এই কথা মেনে চলি যে আমাদেব অন্তত সব পুবনো ধাবণা, সংস্কাব ও কল্পনা বর্জন কবতে হবে। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলাব প্রক্রিযা এত সহজ এবং সবল নয। এব চাবধাবে এক বিশাল ব্যূহ ঘিবে আছে, তাব সাথে আমাদেব মোকাবিলা কবতে হবে। এক সংস্কাব ভাঙ্গাব জন্য অন্য আব একটি নতুন সংস্কাব বচনা কবতে হবে। ক্রোধেব সংস্কাব ভাঙ্গতে হলে ক্ষমাব সংস্কাব গডতে হবে। লোভেব সংস্কাব ত্যাগ কবতে হলে সন্তোষেব সংস্কাব নির্মাণ কবতে হবে। একটি সংস্কাব ভাঙ্গতে হলে অন্য আব একটি সংস্কাবে গডা প্রবোজন।

যাতে আমবা এক সংস্কাব বর্জন কবে অন্য আব একটি সংস্কাব গডতে পাবি তাব জন্য অনুপ্রেক্ষায ধ্বনিব প্রযোগ কবা হয। এই পবিস্থিতিতে আমাদেব ধ্বনিব মহত্ত্ব নির্ণয কবা প্রযোজন। ধ্বনি প্রকম্পন বটে। যেই আমবা কথা বলতে থাকি অমনি ধ্বনিব তবঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। ঐ তবঙ্গ বাযুমণ্ডলে ছডিযে পডে। উপবে ও নিচে, ডাইনে-বামে চাবদিকে ধ্বনিব প্রকম্পন ছডিযে পডে। ঐ প্রকম্পন অন্য বস্তুসমূহকে আঘাত কবে, তাদেব প্রভাবিত কবে। আপনাব প্রভাব বিস্তাব কবে। আমবাও ঐ ভাবে প্রভাবিত হই।

এটা সংক্রমণেব জগৎ। এই দুনিযায কেউ নিজেকে সংক্রমণ থেকে বক্ষা কবতে পাবে না। বাশিযায ক্রান্তি বা বিপ্লব হযেছিল। লোকে বলে এ লেনিনেব বিপ্লব, তাঁব সাথীদেব বিপ্লব। কিন্তু বাশিযাব

বৈজ্ঞানিকবা একটি নতুন কথা বলেন। তাঁবা বলেন, এ বিপ্লব লেনিনেবও নয়, তাঁব সঙ্গীদেবও নয়। সূর্যে বিস্ফোবণ হযেছিল এবং তাবই ফলে বাশিযায এই বিপ্লব ঘটেছিল। এই বিপ্লবেব মূল কাবণ সূর্যমণ্ডলে বিস্ফোবণ, কোনও মানুষ এব কাবণ নয। মানুষ ক্রান্তিব কাবণ নয। সূর্যে যখন যখন বিস্ফোবণ ঘটে তখন মানুষেব মস্তিষ্ক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয। যে বছব সূর্যে ভযঙ্কব বিস্ফোবণ হয সে বছব সাবা পৃথিবীতে ভযঙ্কব মহামাবী, ভীষণ ঝডঝঞ্ঝা, ভযানক ভূমিকম্প হয। জাতিসমূহেব মধ্যে ভযঙ্কব যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয। এইভাবে সূর্যেব বিস্ফোবণই এই সমস্ত যুদ্ধ, তুফান, মহামাবী, বিপ্লব প্রভৃতি সংঘটিত কবে, মানুষ কবে না। আমবা অনেক বস্তুব দ্বাবা প্রভাবিত হই। যা কিছু সংঘটিত হয আমবা তাব দ্বাবা প্রভাবিত হই। আমবা অন্যকে প্রভাবিত কবি এবং নিজে অন্যেব দ্বাবা প্রভাবিত হই।

এই সংক্রমণেব জগতে কেউ সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পাবে না। কোথাও এমন কোন বক্ষাকবচ নেই যাব বলে মানুষ ঐ সংক্রমণ থেকে নিজেকে বক্ষা কবতে পাবে।

ধ্বনি এক বকম কবচেব কাজই কবে। যাতে আমবা অন্যেব দ্বাবা কম প্রভাবিত হই সেজন্য আমবা ধ্বনিব কবচ তৈবি কবে নিতে পাবি। বোজ পশ্চিমে বাত্রিব সময আসে আব আমাদেব অনিত্য অনুপ্রেক্ষাব ক্রম আবম্ভ হযে যায। সব লোক তখন বসে এবং সঙ্কল্প কবে যে, অনিত্য অনুপ্রেক্ষা কবতে হবে। সব শান্ত এবং জাগ্রত। সব শান্ত এবং সচেতন। অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আবম্ভ হয।

আমাদেব প্রথম সূত্র—ইমং শবীবং অণিচ্চ। এই শবীব অনিত্য। এই সূত্রেব ধ্বনিব সঙ্গে আমবা অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আবম্ভ কবি।

আমাদেব দ্বিতীয সূত্র—ইমং শবীবং চযাবচযধম্ম্যম্। এই শবীব চযাবচযধর্মা। তাব চয বা সঞ্চয হয, অপচয বা ব্যয হয। তা পুষ্ট হয, ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয।

আমাদের তৃতীয সূত্র—ইমং শবীবং বিপবিণামধম্ম্যম্। এই শবীব

বিপরিণামধর্মা। এতে বিবিধ পরিণাম সংঘটিত হয়ে থাকে, নানাপ্রকার দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। কখনও শীতলতা দ্বারা পরিবর্তন ঘটে, কখনও বা উত্তাপের দ্বারা, কখনও ভোজনের দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। কখনও বা অন্য কোনও পুদ্গলের সন্তাপে হয়। কখনও রোগ থেকে পরিবর্তন ঘটে, কখনও বা আমার নিজের ভাবনা থেকে পরিবর্তন আসে। আমরা ধ্বনির মাধ্যমে এই বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের অনুপ্রেক্ষা করতে পারি, দেখতে পারি, প্রত্যক্ষ করতে পারি। ধ্বনির সাথে সাথে সঙ্কল্পেরও বিকাশ হওয়া আবশ্যক।

আপনারা শুনে থাকবেন হিমালয় পর্বতের বরফের ওপরে নগ্ন সাধক উপবিষ্ট থাকেন। তাঁর চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। তিনি উত্তাপের প্রয়োগ শুরু করেন। এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়, তারপরে সাধকের দেহ থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করে। বরফের ভেতরে ঘাম ঝরতে থাকে। এ প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। যদি প্রাকৃতিক ঘটনা হতো তাহলে শুধু একজনের শরীর থেকে ঘাম চোযাতো না, সকলের শরীর থেকেই চোযাতো। কিন্তু একজনের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে, আর সকলেই শীতে কাঁপতে থাকে। এ প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এ হল ধ্বনির প্রয়োগ, সঙ্কল্পের প্রয়োগ, সাধনার প্রয়োগ। এ হল ভাবনাত্মক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক পরিবর্তন নয়।

গরমের দিন, ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে, লু বইছে। সাধক শীতলতার ভাবনা করেন, শীতের সঙ্কল্প করেন। তাঁর শরীরে শীতলতা ব্যাপ্ত হয়ে যায়, তিনি শীতে কাঁপতে থাকেন। তিনি কম্বল গায়ে দেন, কিন্তু তবুও কাঁপুনি থামে না। এ পরিবর্তন প্রাকৃতিক নয়, ভাবনাত্মক।

অদ্যাপি জীবিত এক ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার কল্পনায় ক্রুশবিদ্ধ হতো। তখন তার দু হাতে ক্ষত হতো, তা থেকে রক্ত ঝরত। বুক থেকেও রক্ত ঝরতে থাকত। শুধু শুক্রবারেরই এ রকম হতো। এ পরিবর্তন ভাবনাত্মক। সে লোকটি ত্রাণকর্তা খৃস্টের সঙ্কল্প করত, তার ফলে ঐ রকম ঘটনা ঘটত।

পা কাটে, পীড়া হয়। এখন পা কাটার সময় নয়, তবু আপনি

ভাবনাত্মক প্রয়োগ করে দেখুন। পা কাটুক বা না কাটুক, পায়ে ব্যথা হবেই। যদি ভাবনার ফলে ব্যথা হতে পারে, তবে ভাবনার ফলে ব্যথা সেরেও যেতে পারে। দু রকম ঘটনাই ঘটা সম্ভব।

শরীর বিপরিণামধর্মা বা পরিবর্তনশীল। তার নানা প্রকার অবস্থান্তর ঘটে। আমাদের দেখতে হবে কি কি কারণে এবং কি কি ভাবে শরীরের অবস্থান্তর ঘটে।

আমাদের চতুর্থ সূত্র—ইমং শরীরং জরামরণধর্ম্যাম্। এই শরীর জরা-মরণধর্মা বটে। দেহের জরা হয়, মরণ হয়। আমরা তাকে অনুভব করি। আমরা যদি শরীরকে এত শিথিল করে দিই যে আমাদের মনে হয় আমরা মরণকে অনুভব করছি, তাহলে ঐ রকম অনুভূতি হয়। ঐ অনুভূতি হতে আরম্ভ করবে। তা প্রাকৃতিক পরিবর্তন নয়। মরণ সত্যিই ঘটছে না। ঐ পরিবর্তন ভাবনাত্মক। যে অবস্থা বহুদিন পরে ঘটার কথা, ভাবনাত্মক পরিবর্তন দ্বারা, ভাবনার অতিশয় তীব্রতা এবং সঘনতা দ্বারা আমরা সেই অবস্থা অনুভব করতে পারি।

এই অনিত্যের অনুপ্রেক্ষা বটে। যা ঘটছে, যা সংঘটিত করা হচ্ছে, আমরা তাই দেখি। এতে ধ্বনির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ আছে। এই জন্য আমি ধ্বনির আলম্বন তথা কল্পনার আলম্বন মেনে নিয়েছি। আমরা একটি সীমা পর্যন্ত ধ্বনি এবং কল্পনার আলম্বন উপেক্ষা করতে পারি না। ঐ সীমা পর্যন্ত আমাদের মেনে নিতেই হয়।

অর্হের জপে লোকে ধ্বনির সঙ্গে অর্হের ভাবনা করে থাকে, আবার সূক্ষ্ম ধ্বনির সাথে অর্হের ভাবনা করে, অধিকন্তু অর্হের মানসিক ভাবনাও করে। প্রত্যেক স্তরে আলাদা আলাদা অনুভূতি হতে থাকে।

আমি একবার বলেছিলাম এই তীব্র ধ্বনি করে দেওয়া যাক। একবার ঐ প্রয়োগ স্থগিত করে দিই। কিছু লোক বলেছিল, ঐ প্রয়োগ চলাই প্রয়োজন, কারণ এটা ভাল লাগে, এতে একাগ্রতা সাধিত হয়, আর এটা স্বাভাবিক কথা। আমরা যেন মানুষের এই স্বভাব ভুলে না যাই এবং বহুকাল-প্রচলিত স্থূল আলম্বন ত্যাগ করে সূক্ষ্ম আলম্বন

গ্রহণ না কবি, কাবণ সহসা পবিবর্তন কবলে বেশিব ভাগ লোক সেটা গ্রহণ কবতে পাববে না। প্রেক্ষা ধ্যানেব পদ্ধতিতে এই বাস্তবিকতাব ধ্যান বাখা হয়েছে যাতে সাধক স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে যায়। যে স্থূল দেখছে সূক্ষ্ম সম্বন্ধে কথা তাব বোধগম্য হবে না। অনেকে অভিযোগ কবছে সহজ শ্বাস আয়ত্তে আসছে না, প্রকম্পনেব নাগাল পাচ্ছে না। এটা ঠিক কথা। শুরুতে ও বকম হবে না। আমাদেব সতর্ক থাকতে হবে যে, যে লোককে আমবা সাধনাব প্রেবণা দিই সে যেন সাধনাকালে ক্লান্তি বা বিবক্তি বোধ না কবে, বা নিবাশও না হয। যদি তাব মনে নিবাশা এসে যায তবে সে সাধনা কবতে পাববে না। যদি সে ক্লান্ত বা বিবক্ত বোধ কবে তবে সাধনায ছেদ পডবে এবং সে আব কখনও সাধনায প্রবেশেব নামও মুখে আনবে না। এইজন্য সাধকেব যাতে ক্লান্তি বা বিবক্তি না আসে, যাতে সাধনাব প্রতি সে আকৃষ্ট হয, যাতে সাধনাব প্রতি তাব অনুবাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায সে বিষযে দৃষ্টি বাখা আবশ্যক। এই জন্য শুরুতে স্থূল আবম্বনেব আবশ্যকতা আমি মেনে নিযেছি, যদিও আমাদেব দেখতে হবে যে স্থূলেতেই আমাদেব গতি রুদ্ধ হযে না যায। তাকে সূক্ষ্ম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। কিন্তু সাধাবণ মানুষ সহসা স্থূলকে অতিক্রম কবে সূক্ষ্মে পৌঁছে যাবে এ কথা আপনাবা কল্পনা কবতে পাবেন না। আবম্ভেই সোজাসুজি সূক্ষ্মে পৌঁছে যায এবকম লোক বিবল।

এক সাধক তাব গুরুব কাছে গিযে বলল, 'আমি সাধনা কবতে চাই। আপনি আমাকে পথ দেখান। আমি কি কবব তাব নির্দেশ দিন।' গুরু শুনলেন। তিবস্কাবেব সুবে বললেন, 'তুমি কি কববে তা জিজ্ঞাসা কবতে এসেছ? কেন দেখিযে দিচ্ছি না? তোমাব কি চোখ নেই? কেন শুনতে পাচ্ছ না? তোমাব কি কান নেই?' সাধক বলল, 'আমাব চোখ আছে। আমি দেখতে পাই। কান আছে। আমি শুনতে পাই।' গুরু বললেন, 'আমাকে আবাব কি জিজ্ঞাসা কবছ? তোমাব সামনে কি দেখতে পাচ্ছ?' 'পাহাড় দেখতে পাচ্ছি।'

'কি শুনতে পাচ্ছ?' 'ঝবণাব শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' 'তাহলে চলে যাও। পাহাড দেখ, আব নির্ঝবেব ধবনি শোন। এই হল সাধনা।'

সাধক চলে গেল। সে পাহাড দেখতে থাকল। ধ্বনি শুনতে থাকল। এইভাবে দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে সে অন্তিম বিন্দুতে পৌঁছে গেল।

মূল কথা—দেখা। ইচ্ছা কবলে আমবা শবীবকে দেখতে পাবি, পাহাড দেখতে-পাবি, কোন ছবি দেখতে পাবি। মূল মন্ত্র হল—দেখাব অভ্যাস কবা। দেখ এবং জান। আব কিছুই কোবো না। কেবল দেখ। দেখাব সাথে আব কিছু জুডে দিও না। কেবল জান। জানাব সঙ্গে অন্য কিছু জুডে দিও না। মূল কথা—জানা আব দেখা। ইচ্ছা কবলে আমবা শবীব দেখতে পাবি, শ্বাস দেখতে পাবি। আবাব প্রাচীবও দেখতে পাবি। যাই দেখি তাতে কোন প্রভেদ হবে না। কিছুই যাবে আসবে না। দেখাই একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যাপাব।

জৈন আগমে বলা হযেছে মুনি যেন ভূমি দেখতে দেখতে চলেন। এটা পুবোপুবি ধ্যানেব প্রক্রিযা। তাকে গমন-যোগও বলা হয। আমবা এ কথাব অর্থ বুঝতে পাবছি, কিন্তু এব পেছনে একটি মহৎ সত্য গোপন আছে। কোন লোক যদি অন্য কোন প্রকাব সাধনা না কবে, কেবল চলাব সমযে যদি দেখতে দেখতে চলতে থাকে, তবে ধ্যানেব এক মহৎ সাধনা হযে যায। ঐ সাধনা তাকে অনেক দূব এগিযে নিযে যাবে। উত্তবাধ্যযন সূত্রে বলা হযেছে সাধক পথ চলতে চলতে যেন গমনময হযে যায। তাব সমস্ত শবীব-তন্ত্র তাতে চলন্ত হযে যেন গতিতে পবিণত হয। যে লোক গমন-যোগ অভ্যাস কবে, দেখতে দেখতে চলতে থাকে মানুষ না বলে গতি বলা উচিত। তাকে গমন বলা উচিত। কেবল গমন। সে কোন মানুষ নয়, সে শুধু গমন। এবংভূত ন্যাযেব দৃষ্টিতে, শুদ্ধ ন্যাযেব দৃষ্টিতে যদি জিজ্ঞাসা কবা যায, ঐ লোককে তুমি কি বলবে? মানুষ বলবে? না, একেবাবেই না। ও মানুষ কোথায? ও তো গতি মাত্র, শুদ্ধ গতি। আব অন্য কিছুই

নয। তাব না থাকে ইন্দ্রিযেব প্রযোগ, না থাকে মনেব প্রযোগ। তাতে পাঁচ প্রকাব ইন্দ্রিযেব বিষযও নেই, পাঁচ প্রকাব স্বাধ্যাযও নেই। কোন কথা নেই, জিজ্ঞাসা নেই, প্রশ্ন নেই, পুনবাবৃত্তি নেই। কোন অনুপ্রেক্ষাও নেই, ধর্মকথাও নেই। চোখেবও প্রযোগ নেই, কানেবও প্রযোগ নেই। দেখাও নেই, শোনাও নেই। যে ব্যক্তিব কোনও ইন্দ্রিযেব প্রযোগ নেই, মন এবং মস্তিষ্কেবও প্রযোগ নেই, ভাবাবও প্রযোগ নেই, সে তো কেবল গতি মাত্র। শেষ পর্যন্ত আব কিছুই থাকে না, থাকে শুধু গতি। ভাবা সমাপ্ত, মন সমাপ্ত, ইন্দ্রিযেব বিষয সমাপ্ত। শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু গতি, কেবল গতি। সে লোক আব কিছুই দেখে না। কেবল ভূমি আব ভূমি দেখে। এই হল গমনযোগ।

আমি বলছি, আমবা যেন একটি মাত্র আলম্বন গ্রহণ কবি। আপনাবা যেন ধাবণা না কবেন কেবল শ্বাসই আলম্বন হতে পাবে। ঐ বকম ধাবণা কবলে অনুপ্রেক্ষা হবে না। যথার্থ বা সত্য ঘটনা সম্ভব হবে না। শ্বাসও এক আলম্বন। আপনি যদি কেবল গমনকেই আলম্বন বানিযে নেন তবে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলম্বন হতে পাবে। হবিভদ্র সুবী বলেছেন, 'সব্বোহবি ধম্মবাবাবো মোক্খেণ জীযণাযো জীযো'—মুক্তিদাতা, দুঃখ থেকে মুক্তিদাতা, এ সবই ধর্মেব ব্যাপার যোগ। এ অনেক গভীব তত্ত্বেব কথা। এই সব মুক্তিদাতা মহৎ সত্যেব উদ্ঘাটন কবেছেন। আমবা কোন কিছুকে যদি আলম্বন বানিযে নিই, শেষ পর্যন্ত তাই আমাদেব চবম আলম্বন হবে।

আমি অন্য এক আলম্বনেব কথা বলছি। কোন লোক ধ্যান কবে না, স্বাধ্যায কবে না, বা অন্য কিছু কবে না। সে যদি কেবল একটি কথা আঁকডে ধবে থাকে, 'আমি কেবল রুটিই খাব, আব কিছু কবব না', তবে আমাব মনে হয় তাব একটা ধ্যানেব ফল মিলে যাবে যে, আমবা তাব কল্পনাও কবতে পাবব না। সে চিন্তা কবে, 'আমি কেবল খাব, আব কিছুই কবব না।' কেবল খাওযাও খুব বড সাধনা হতে পাবে।

১১

রূপান্তরণের প্রক্রিয়া

এক গ্রামীণ শহরে এসে এক হোটেলে উঠল। রাত এল। তার ঘরে বাতি জ্বলছিল। শোবার সময় হল। সে ভাবল, বাতি নিভিয়ে দিই। সে বাল্‌বের কাছে গিয়ে ফুঁ দিল। আলো নিভল না। দু মিনিট পরে আরও জোরে ফুঁ দিল। তবুও দীপ নিভল না। আরও দু চার-বার ফুঁ দিল। কিন্তু আলো জ্বলতেই থাকল। হয়রাণ হয়ে আলো জ্বেলে রেখেই সে শুয়ে পড়ল। সকাল হল। হোটেলের বেয়ারা এল। গ্রামীণ তাকে বলল, 'ওহে, তোমাদের এ কি রকম দীপ? ফুঁ দিলেও নেভে না। এ দীপ অকেজো। আমার সারা রাত আলোতে কাটাতে হয়েছে।' বেয়ারা বলল, 'মহাশয়। ও প্রদীপ নয়, বিদ্যুৎ। ফুঁ দিয়ে ও আলো নেভান যায় না।' সে সুইচের কাছে গেল, বোতাম টিপল, অমনি বিজলি বাতি নিভে গেল।

গ্রাম্য লোকটি জানত না বিজলি বাতি কিসে নেভে, বা কিসে জ্বলে। সে জানত যাই আলো তাই প্রদীপ, আর ফুঁ দিলেই তা নিভে যাবে। যতক্ষণ আমরা না জানি ততক্ষণ আমরা দীপ জ্বালাতেও পারি না, নেভাতেও পারি না। না জানলে কিছুই করা সম্ভব হয় না।

অনুরূপভাবে না জানলে আমরা কি করেই বা রূপান্তরিত হতে

পাবি? আমাদেব পবিবর্তিত বা রূপান্তবিত হবাব এ ছাড়া অন্য কোন উপায নেই।

দ্বিতীয কথা—জানাব পবে অভ্যাস কবা প্রযোজন। আমবা এই নিযম জানি যে আমবা নাসাবন্ধ্র দিযে শ্বাস নিই, আব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেব মধ্যে সঙ্কল্প চলতে থাকে, ভেতব পর্যন্ত পৌছয। আমবা এও জানি আমাদেব দ্বিতীয নাসাবন্ধ্র দিযে শ্বাস বেবিযে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনেব সঙ্কল্প চলতে থাকে, মনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। সাধনপদ্ধতিব পৌর্বাপর্ব আমবা জেনেছি এবং বুঝেছি। কিন্তু কার্যকালে আমাদেব মন প্রমাদে আচ্ছন্ন হয। সক্রিয়তা থাকে না। অপ্রমাদ থাকে না। জাগরূকতা থাকে না। কর্মণ্যতা থাকে না। শুধু জানলে কিছু হবে না, অভ্যাস কবতে হবে। আমবা যেমন জেনেছি পূর্ণ জাগরূকতাব সঙ্গে তা আমাদেব পুনঃপুনঃ অভ্যাস কবতে হবে। বাব বাব অভ্যাস কবলে আমাদেব কার্য সম্পন্ন হবে, আমাদেব অভ্যাস সফল হবে। সেই কাবণে ভগবান বলেছেন—'বিজ্জা চবণং পমোক্খো।' জ্ঞান ও আচবণ মিলিত হলে মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয। জ্ঞান ছাড়া দুঃখ থেকে মুক্তি হয না, আব ক্রিযা ছাড়াও দুঃখ থেকে মুক্তি হতে পাবে না। যদি জ্ঞান অবশ্য প্রযোজন হয, তবে আচবণও অবশ্য প্রযোজন। আমবা অপ্রমাদেব জন্য কর্ম কবি, পূর্ণ জাগরূকতাব সাথে অভ্যাসেব পুনঃপুনঃ আবৃত্তি কবি। এই জন্য অপ্রমাদ অবশ্য প্রযোজন। আমবা যাতে বিজলি বাতিব সামনে গিযে ফুঁ না দিই সেজন্য আমাদেব জানা দবকাব। যেখানে ফুঁ দেওযাব কথা সেখানে যেন ফুঁ দিই, যেখানে বোতাম টেপাব কথা সেখানে যেন বোতাম টিপি। যে কাজ যেমন ভাবে কবাব কথা, সে কাজ তেমনি ভাবেই কবি। এ দুটি কাজ ঠিকমত হলেই আলো জ্বলবে, দবজা খুলে যাবে, জানলা খুলে যাবে। তা না হলে কোন কিছুই হবে না। আলোও জ্বলবে না, দবজাও খুলবে না, জানালাও খুলবে না।

যখন আমাদেব মনেব গভীবে আকাঙ্ক্ষা জাগে তখনই এ বকম হতে

পাবে। এ বকম গভীব আকাঙ্ক্ষা হবে যে আমাব ঐ কাজ কবা নিতান্ত আবশ্যক, ঐ বকম কবলে আমি নিজে ধন্য হব, উপকৃত হব, লাভবান হব। ওই বকম গভীব আকাঙ্ক্ষা বা অভীপ্সা উৎপন্ন হলে তাবই এ বকম হতে পাবে। গভীব আকাঙ্ক্ষা হলে আত্মাব নিবীক্ষণ হয।

আমবা প্রথম দিন থেকেই আবৃত্তি কবে যাচ্ছি, আত্মা দ্বাবা আত্মাকে দেখ। এব অর্থ—স্ব-দর্শনেব ভাবনা, নিজেকে নিজে দেখাব ভাবনা উৎপন্ন হোক। নিজে নিজেকে দেখলেই গভীব আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হবে। আত্মাকে দর্শন, নিজেব অস্তিত্বকে দর্শন আব গভীব আকাঙ্ক্ষা—এগুলি যখন ঘটে তখন আমাদেব দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন হয। জীবন বদলে যায, তাব আগে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায। দৃষ্টিব পবিবর্তন হলে জীবনেবও পবিবর্তন হয। দুনিযাতে যা আছে তাই আছে। ভাল হলে ভাল, মন্দ হলে মন্দ। যা আছে তাব আমবা কোন বকম অদলবদল কবতে পাবি না। দুনিযাতে এ সবই চলতে থাকবে। আজ পর্যন্ত তাব কেউ পবিবর্তন কবতে সমর্থ হয নি, ধ্বংস কবতে সক্ষম হয নি, নতুন কিছু নির্মাণ কবতেও সমর্থ হয নি। যা আছে তা চলছে, চলতে থাকবে। যে লোক নিজেব দৃষ্টি বদলাতে পাবে তাব জন্য দুনিযা বদলাতে পাবে। যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলায না, দুনিযাও তাব জন্য কখনও বদলায না।

এক গুরু ছিলেন। তাঁব দুটি শিষ্য ছিল। তিনি তাদেব পবীক্ষা কবতে ইচ্ছা কবলেন। এক শিষ্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'বল, জগৎ কেমন? তোমাব জগৎ কেমন লাগছে?' সে বলল, 'জগৎ খুবই মন্দ জাযগা। সব জাযগায অন্ধকাব আব অন্ধকাব। আপনিই দেখুন। একটি দিন হলে দুবাব বাত হয। দুই বাত্রিব মাঝখানে একটি দিন। শুরুতে বাত ছিল। শুধু আঁধাব আব আঁধাব। তাব পবে দিন এল। আলো হল, প্রকাশ হল। আবাব রাত এসে গেল, আঁধাবে সব ছেযে গেল। এক বাব আলো তো দুবাব আঁধাব। আঁধার বেশি, আলো কম। এই তো দুনিযা।'

আচার্য দ্বিতীয় শিষ্যকেও একই প্রশ্ন কবলেন। সে বলল, 'গুরুদেব! জগৎ খুব ভাল জাযগা। কেবল আলো আব আলো। বাত গেল। আলোব প্রকাশ হল। সূর্যেব আলো সর্বত্র ছডিযে পডল। আলোব আবির্ভাব হলে অন্ধকাব চূর্ণবিচূর্ণ হযে যায। আলো সবাব বন্ধ চোখ খুলে দেয, যা সত্য তাকে প্রকটিত কবে। যা অন্ধকাবে আবৃত ছিল তাকে এক মুহূর্তে অভিব্যক্ত কবে, অনাবৃত কবে দেয। যে জগতে এই বকম আলোব খেলা সে জগৎ কত সুন্দব আব লোভনীয। আমি দেখেছি দিন এসে চলে যায়, বাত আসে, চলে যায, আবাব দিন আসে। এই ভাবে দুই দিনেব মাঝখানে এক বাত। আলো বেশি, অন্ধকাব কম। দু বাব আলোব প্রকাশ, একবাব আঁধাব।'

প্রশ্ন একটি ছিল, উত্তবদাতা ছিল দু জন। তাবা দু বকম উত্তব দিযেছিল। এক জন বলেছিল, দুই বাতেব মাঝখানে একটি দিন হয। অপব জন বলেছিল, দুই দিনেব মাঝখানে একটি বাত। বাত দুজনেব পক্ষেই সমান ছিল, দিনও দুজনেব পক্ষেই সমান ছিল। দিনেবও প্রভেদ ছিল না, বাতেবও প্রভেদ ছিল না। ছিল দৃষ্টিকোণেব পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গিব প্রভেদ। একজন অধিক পবিমাণে আলোব খেলা দেখেছিল, সেই অনুসাবে মূল্যাঙ্কন কবেছিল। সে তাব জালে আবদ্ধ হযেছিল। তাব মনে হযেছিল, দুনিযায অন্ধকাবেব চেযে বড আব কিছুই নেই। সে আলোব চমক দেখতে পায নি, তাব মূল্য বুঝতে পাবে নি।

এ হল সম্পূর্ণ দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন। যদি আমবা চোখ বিশ্বেব সৌন্দর্য এবং সত্যকে দেখতে আবম্ভ কবি তবে সর্বত্র সত্য আমাদেব দেখা দেবে, সৌন্দর্য দেখা দেবে। যদি আমাদেব চোখ শুধু দুঃখ আব দুঃখ দেখতে থাকে তবে আমাদেব আশেপাশে দুঃখ নাচতে থাকবে। সব কিছু দুঃখময হযে যাবে।

আমরা পশ্চিম বাত্রিতেঅ নুপ্রেক্ষাব অভ্যাস কবি, অনুভব কবি। শবীব অনিত্য, এই সত্য থেকেও আনন্দ অনুভব কবি। শবীব চযাপচয-শীল। কখনও তাব চয অর্থাৎ বৃদ্ধি হয, কখনও বা অপচয অর্থাৎ ক্ষয

হয়। কখনও তা পুষ্ট হয, কখনও বা ক্ষীণ হয়। শবীব ক্ষীণ হলেও সত্যেব বোধ হতে পাবে। এই শবীব বিপবীতধর্মা, বিবিধ পবিবর্তনেব মধ্য দিযে তার গতি। কখনও তাব ওপবে শীতেব প্রভাব হয, কখনও গ্রীষ্মেব, কখনও বা ঝড তুফানেব। কখনও সে বোগ-যন্ত্রণা সহ্য কবে, কখনও বা পবিস্থিতি দ্বাবা পীডিত হয। কখনও এটা, কখনও ওটা ঘটিত হয। এই দেহ অনেক, অনেক পবিবর্তনেব মধ্য দিযে যায। বোগ আমাদেব প্রিয বস্তু নয, কিন্তু বোগেব সত্যতাব অনুভূতি আমাদেব প্রিয। প্রকৃতপক্ষে বোগ আছে—এই সত্য আমাদেবকে সত্যেব দিকে, যথার্থের দিকে নিযে যায়।

এই শবীবেব মৃত্যু ঘটে। শবীবেব বার্ধক্য হয, মানুষ মাবা যায। মবণেব অনুভব কবাও অনেক বড আনন্দ। আমবা অনিত্যেব অনুপ্রেক্ষা দ্বাবা জীবদ্দশায মবণেব অভিজ্ঞতা লাভ কবি। আব যে লোক মবণেব শিক্ষা পেযেছে সে সমস্ত কঠিন সমস্যা উত্তীর্ণ হতে পাবে। মবণ-ভয ছুনিযাব সবচেযে বড় ভয। মবণই হল অন্তিম ঘটনা।

আজ পর্যন্ত ছুনিযাব শাসককুল নানা ভাবে দণ্ডদানেব উপায উদ্ভাবন কবেছেন। তাঁবা বহু বিচিত্র দণ্ডদানেব কৌশলেব আশ্রয নিয়েছেন। বাঁধা, জেলে দেওয়া, হাতে হাতকডা লাগান, পাযে বেডি লাগান, মাবা, পেটানো। তাঁদেব হাতে চবম দণ্ড—ফাঁসি দেওযা। এটিই অন্তিম দণ্ড।

যে লোক জীবিত অবস্থায মবণ শিক্ষা কবে, তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে, তাকে অনুভব কবে, নিজেব শবীব শিথিল কবে সকল অবযব মৃতেব অবয়বেব মত কবতে শিক্ষা কবে—সত্যই সে লোক সকল সমস্যা, সকল প্রকাব ভয, সকল প্রকাব বিঘ্নকে অবশ্যই অতিক্রম কবতে পাবে।

আমবা অনিত্যেব অনুপ্রেক্ষা কবে থাকি। ঐ অনুপ্রেক্ষাতে আমবা সত্যকে দেখি, আনন্দ নির্গলিত কবি, আমাদেব অন্তবেব অন্তঃস্থলে যেতে প্রযত্ন কবি এবং তাব সাধনা কবি। এ সবই দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন। তাছাডা যদি আমবা কাউকে বলি, মবণ অনুভব কব, তবে সে ভাববে, কি বকম মূর্খেব মত কথা বলছে। বেঁচে থাকাব কথা

বললে ভাল লাগতে পাবে, কিন্তু ও তো মবণেব কথা বলছে। বডই খাবাপ কথা। বাঁচাব কথা বেশ ভাল লাগে। কিন্তু মবাব কথা বড় মন্দ মনে হয। আমবা তাকে অলক্ষুণে কথা মনে কবি। অশুভ কথা বলে মনে কবি। কিন্তু সাধকবা এ বকম মনে কবেন না। তাঁবা মবাব কথা ভাল কথা মনে কবেন। এজন্য মবণকে তাঁবা নিজেদেব অভ্যাসেব অঙ্গীভূত কবে সাধনা কবেন। বস্তুত এই হল দৃষ্টিব পবিবর্তন।

দৃষ্টি বদলালে সব কিছুই বদলে যায। সাধনাব প্রথম সূত্র—দৃষ্টিব পবিবর্তন। রূপান্তবণেব প্রথম সূত্র—দৃষ্টিব পবিবর্তন। আমাদের সমস্ত রূপান্তব দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন দ্বাবা সাধিত হয। দৃষ্টিব পবিবর্তন হলে আভ্যন্তবীণ সমস্ত তত্ত্বেব পবিবর্তন শুরু হযে যায। রূপান্তবণেব প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তখন দুনিযাব দৃষ্টিতে অনেক উল্টো কথা আমাদেব কাছে ঠিক বলে মনে হতে শুরু কবে। দুনিযাব যে সব কথা ঠিক বলে মনে হয সেগুলি সাধকেব কাছে উল্টো লাগতে পাবে।

এক সাধক কনফুসিযসকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—আমি কি কবে মনেব ওপবে সংযম প্রযোগ কবতে পাবব? কনফুসিযস মস্ত বড সাধক ছিলেন। তিনি মহান যোগী, দার্শনিক ও তত্ত্ববেত্তা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমি এ বিষযে সহজ সবল উপায, ছোট একটি সূত্র বলছি। তুমি কি কান দিযে শোন। সাধক উত্তব দিল—হ্যাঁ। কনফুসিযাস বললেন—তুমি যে কান দিযে শোন এ কথা মানতে পাবি না। তুমি মন দিযে শোন। একটা কাজ কব। আজ থেকে শুধু কান দিযে শুনতে শুরু কব। মন দিযে শোনা বন্ধ কবে দাও। তুমি জিহ্বা দিযে স্বাদ নাও এ কথা আমি মানতে পাবি না। তুমি মন দিযে স্বাদ নাও। আজ থেকে কেবল জিহ্বা দ্বাবা স্বাদ নেওযা আবম্ভ কব। মনেব দ্বাবা আস্বাদন কবা বন্ধ কব। তুমি চোখ দিযে কি দেখ, তুমি মন দিযে দেখ। আজ থেকে শুধু চোখ দিযে দেখা শুরু কব। আপনা আপনি মনেব ওপবে সংযম ক্ষমতা এসে যাবে।

কেবল কান দিযে শোনা, জিভ দিযে চাখা, চোখ দিযে দেখা—

ৰূপান্তবেব একটি ছোট সূত্র। কিন্তু আমবা কেবল কান দিযে শুনি না, জিভ দিযে চাখি না, চোখ দিযে দেখি না। মন দিযে শুনি, চাখি, দেখি। যদি আমাকে প্রশ্ন কবা হতো তবে আমি উত্তবেব সঙ্গে আব একটু কথা জুড়ে দিতাম—আমবা সংস্কাব দ্বাবা শুনি, স্বাদ গ্রহণ কবি, দেখি। আমবা পূর্ব ধাবণাসমূহেব বশবর্তী হযে এই সব কবে থাকি।

মা ছেলেকে বলে—কিছু বোঝ না, তুমি নিবেট মূর্খ। ছেলে কান দিযে শোনে, মন দিযে শোনে, সংস্কাব এবং ধাবণা দিযে শোনে। কোন বিবোধী বা শত্রু ছেলেকে বলল—বুঝতে পাবছ না? তুমি আকাট মূর্খ। এ কথাও সে কান দিযে শুনল, মন দিযে শুনল, সংস্কাব দিযে শুনল, ধাবণা দিযে শুনল। কানে দুটো আওযাজই সমান লাগল। চাই মা বলুক, তুমি মূর্খ, চাই শত্রু বলুক, তুমি মূর্খ—দুটো কথাব আওযাজই সমান। কানেব কাছে দুজনেব দ্বাবা ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদেব ধ্বনিব কোন প্রভেদ নেই। শোনাতেও কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু মনেব দিক থেকে ধাবণাব এত পার্থক্য হবে যে মাযেব কথা প্রিয লাগতে পাবে, কিন্তু দুশমনেব কথা আগুনেব মত গাযে জ্বালা ধবাতে পাবে। বিবোধীব কথায ছেলেটি এত কুপিত হযে যাবে যে তাতে কখনও কখনও বিবাট অনর্থকাবী ঘটনাও ঘটে যেতে পাবে।

এই প্রভেদ কেন হয? যদি শুধু কান দিযে শোনা হতো তবে দুজনেব কথাব কোন তফাৎ হতো না, কাবণ দুজনেব কথাব ধ্বনি এবং শব্দাবলী সমান। দুজনেব কথাব প্রভেদ এই জন্য হযেছে যে শ্রোতা শুধু কান দিযে শোনে নি, সে সংস্কাব দিযে, মন দিযে, তথা পূর্ব ধাবণা দিযে শুনেছে।

কনফুসিযস ঠিকই বলেছেন, কান দিযে শোন, মন দিযে শোনা বন্ধ কব। কেবল জিভ দিযে চাখ, মন দিযে চাখা বন্ধ কব। কেবল চোখ দিযে দেখ, মন দিযে দেখা বন্ধ কব। আপনা আপনি সংযম এসে যাবে।

এটি ৰূপান্তবণেব মস্ত বড সূত্র। সাধাবণ মানুষেব কাছে এ কথা

ছলনাপূর্ণ ও দুর্বোধ্য মনে হতে পারে কিন্তু সাধকের পক্ষে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যেন ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের কাজ করতে দিই এবং মনকে তার আপন কাজ করতে দিই, সংস্কার এবং পূর্ব ধারণাসমূহকে আপন আপন কাজ করতে দিই। তাদের কাজের সঙ্গে আমরা যেন কিছু জুড়ে বা মিলিত করে না দিই।

কেন অসংযম হয়? কান, মন, সংস্কার এবং ধারণা এক ধারায় মিলিত হয়। তাদের এক ধারায় মিলিত হওয়ার ফলে অসংযম উৎপন্ন হয়। অসংযম কানে নয়, চোখে নয়, জিভেতে নয়। তারা যে যেমন আছে সেই ভাবেই আমাদের দেখা দেয়। তাতে কোন প্রিয়তাও নেই, অপ্রিয়তাও নেই। কোন রাগও নেই, কোন দ্বেষও নেই। যে যেমন সে ঠিক তেমনি আকৃতি এবং বর্ণ নিয়ে আমাদের চোখের সামনে আসে, আর চোখ তাকে তেমনি ভাবেই গ্রহণ করে। যদি মনে কারও ওপরে প্রিয়তা বা কারও ওপরে অপ্রিয়তার ভাব আসে তাতে বেচারি চোখের কি দোষ? তার কোন দোষ নেই। ও তো প্রণালী মাত্র। তা দিয়ে নোংরা জল প্রবাহিত কর, নির্মল জল ওর ভেতর দিয়ে নিয়ে যাও। যা কিছু প্রবাহিত কর। সে তো মাধ্যম মাত্র। তার কোনও দোষ নেই। প্রিয়তা বা অপ্রিয়তার ভাব, রাগ বা দ্বেষ—এ সবই আসে মনের পথ দিয়ে, সংস্কারের তথা ধারণার পথ দিয়ে। আমাদের মনে যে লোকের সম্বন্ধে যে ধারণা জমে আছে, যে চোখে আমরা তাকে দেখেছি তদনুসারে আমাদের দেখার সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে ধারণার তরঙ্গ তথা আমাদের মনের তরঙ্গ এসে মিলিত হয়। তার পরে আর চোখের কোন কাজ থাকে না। তার পরে আমরা চোখ দিয়ে দেখি না। দেখি সংস্কার দিয়ে, ধারণা দিয়ে, তথা মন দিয়ে।

প্রতিসংলীনতা তথা সংযমের এই হল অতিশয় মহত্ত্বপূর্ণ সূত্র—ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে ইন্দ্রিয়ের কাজ নাও, অন্য কোন কাজ নিও না। এই হল সংযমের সূত্র।

আমি রূপান্তরণের সূত্রের আলোচনা করছি। আমরা অবশ্যই

বদলাতে চাই। প্রত্যেক মানুষই যে বদলাতে চায সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই। যে ক্রোধপ্রবণ, সে চায তাব স্বভাব বদলাতে। যে পবনিন্দাপবাযণ, সে চায তাব স্বভাবেব পবিবর্তন কবতে। যে খাদ্য-লোলুপ, সে-ও চায আপন স্বভাবেব পবিবর্তন। তাবা মন থেকে ইচ্ছা করুক বা বাধ্য হযে করুক, তাবা সবাই পবিবর্তন চায।

কিন্তু বাস্তবে কাবও অভ্যাস বা স্বভাব বদলায না। খুব কম লোকেই নিজে নিজেব স্বভাব পবিবর্তিত কবতে পাবে। তাবা জানে ঐ সব কাজ খাবাপ। তাবা ঐ সব কাজ খাবাপ বলে মানে। তাবা ঐ সব অভ্যাস ছাড়তে বা বদলাতে চেষ্টা কবে। কিন্তু তাবা সেগুলি ছাড়তে বা বদলাতে সক্ষম হয না। কেন? ঐ বকম হয কেন? এ একটি মস্ত বড প্রশ্ন। এব উত্তব দিতে অন্তবেব গভীবতায নামতে হবে। আমি এ কথা স্বীকাব কবি যে সাধনাব অন্যান্য সফলতাব মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সফলতা যে, আমবা এ প্রশ্নেব উত্তব পেতে সক্ষম হই। লোকে পবিবর্তিত হতে চায অথচ তাবা বদলাতে পাবে না কেন? এই প্রশ্নেব উত্তব সাধনাব ভূমিকা ছাডা অন্য কোথাও পাওযা সম্ভব নয। একমাত্র সাধনাব ভূমিকাতেই আমবা এই প্রশ্নেব সমাধান কবতে পাবি।

আমবা শ্বাসেব প্রযোগ কবে থাকি। শ্বাসকে ভেতবে নিযে যাবাব চেষ্টাব সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতবে নিযে যাবাব চেষ্টা কবি। কেন এ বকম কবি? আমবা কেন একাগ্রতাব অভ্যাস কবে থাকি? এ কথা আমাদেব বুঝতে হবে। আমবা কাজ কবে চলি, কিন্তু কেন কবি?

আমাদেব দুই শবীব আছে—স্থূল শবীব আব সূক্ষ্ম শবীব। আমাদেব চেতনাব অনেক স্তব। এক হল মনেব চেতনা, অর্থাৎ চেতনাব মানসিক স্তব। আব একটি অধ্যবসাযেব স্তব। মন এক, অধ্যবসায অনেক। অধ্যবসাযেব অর্থ, সূক্ষ্ম চেতনা। সূক্ষ্ম চেতনাব স্তব অসংখ্য। তা অতিশয গভীবতায প্রতিষ্ঠিত। আমাদেব স্থূল মনেব কাছে তা প্রীতিকব নয, আমাদেব জাগ্রত মনেব পক্ষে তা

প্রীতিকব নয। তৎক্ষণাৎ আমবা প্রভাবিত হযে পডি আব চিন্তা কবি যে, এসব ত্যাগ কবতে হবে। মনে মনে ত্যাগেব সঙ্কল্প কবি। মনে করুন, আমবা চা পান কবাব অভ্যাস ত্যাগ করাব সঙ্কল্প কবলাম। যখনই সকাল হল, জলখাবাবেব সময এল, চা মাথায চডে বসল। মাথায় চেপে বসে চলতে আবম্ভ কবে। চা পানেব জন্য আকুলতা বাড়তে থাকে। চা পানেব অভ্যাস ত্যাগ কবাব ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু চা আমাদেব সামনে এলে আমবা ভাবি, যাক গে, আজ তো খাই। কাল থেকে ছাডব। একদিনে কি যাবে আসবে? পবেব দিন চা এলে একই প্রশ্ন ওঠে এবং মন একই ভাবে সমাধান কবে। এই বকম দিনেব পব দিন চলতে থাকে।

বাজা ভ্রমণে বেবিযেছেন। তিনি এক বাগানে এলেন। মন্ত্রী তাঁকে সাবধান কববাব জন্য বললেন, 'মহাবাজ। আপনি আম গাছেব তলায বসবেন না। আপনাব আম খাওযা নিষেধ, এমন কি আম গাছেব তলায় বসাও নিষেধ। বৈদ্য বলেছেন আপনি আম খেলে বাঁচবেন না, মবে যাবেন। আপনি যদি আম হাতে নেন তবে মনে কববেন যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে হাতে নিযেছেন। আপনাব পক্ষে আমেব অর্থ মৃত্যু।'

বাজা মনে মনে চিন্তা কবলেন—এ কি বকম বৈদ্য? এত কডা? এত নিষেধ। আম গাছেব ছাযা বেশ ঘন। আম গাছেব নিচে বসতে কি দোষ আছে? আম খাওযাতে দোষ হওযাব সম্ভাবনা থাকতে পাবে, আম গাছেব ছাযাতে কোন দোষ থাকতে পাবে না। বাজা আম গাছেব ছাযায বসলেন। পাকা আমেব গন্ধে তাঁব মন ভবে গেল। তাঁব জিভে জল এসে গেল। এই সমযে দমকা হাওযাব স্রোত এল। গাছ থেকে একটি আম বাজাব কোলে পডল। বাজা সেটা ছুঁলেন, হাতে তুলে নিলেন। শুঁকলেন। তাব মনমাতানো বঙ আব মিষ্ট গন্ধ। মন্ত্রী বললেন—মহাবাজ। ও আপনি কি কবছেন? আপনি কি নিজেব মৃত্যু ডেকে আনছেন? আমটি দূবে ছুঁডে ফেলে দিন। বাজা

হাসতে হাসতে বললেন—তুমি তো বড়ই অবিশ্বাসী। দেখাতে আর শোঁকাতে বিপদ কোথায়? আমি এটি খাব না। রাজা আমটি বার বার শুঁকতে লাগলেন। মন মিষ্ট গন্ধে ভরে গেল। শুঁকতে শুঁকতে তিনি আমটিকে চুষতে লাগলেন। বড়ই মিষ্ট রস। মন্ত্রী তাঁর হাত চেপে ধরলেন। রাজা বললেন—মন্ত্রী, বৈদ্যরা অনেক ভয় দেখায়। একটি ভাল আম চুষলে মানুষ কি করে মরে যেতে পারে? আমি তো শুধু শুঁকছি, খাচ্ছি না। তুমি চিন্তা করো না। মন্ত্রী নিষেধ করতে লাগলেন, আর রাজা গোটা আমটি চুষলেন। কিছু দিন পরে রাজা রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেলেন।

লোকে জেনেশুনেও ছাড়তে পারে না কেন? হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাঁচের গ্লাসের মত তোমাদের সঙ্কল্প ভেঙ্গে যায়, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তার কারণ ঐ সমস্ত সঙ্কল্প আমাদের স্থূল চেতনার স্তরে, আমাদের জাগ্রত মনের স্তরে ঘটে। সঙ্কল্প করে জাগ্রত মন, আর বিঘ্ন আসে অন্য কোন জায়গা থেকে। ব্যাধি কোন এক জায়গায়, আর আমরা চিকিৎসা করি অন্য কোন জায়গায়।

এক জনের চোখে ব্যথা শুরু হল। সে বৈদ্যর কাছে গেল। বৈদ্য বললেন—এই বড়ি নাও। এটিকে ঘসে চোখে কাজলের মত লাগিয়ে দিও। দুদিন পরে বৈদ্য রোগীর বাড়িতে এলেন। তিনি দেখলেন রোগী বড়িটি ঘসছে পিঠের ওপরে। বৈদ্য জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করছ? ঐ ওষুধ তো চোখের জন্য। তুমি ওটা পিঠে লাগাচ্ছ কেন? সে উত্তর দিল—কি করব? প্রথম দিন চোখে কাজলের মত লাগিয়েছিলাম, কিন্তু খুবই জ্বালা করল। তখন আমি ভাবলাম, যাক গে। চোখে যদি না সয়, তবে পিঠে ঘসে দিই। কি আর তফাৎ হবে।

আমরাও ঠিক এই রকম করে থাকি। কোথায় রোগ হয়, আর কোথায় আমরা ওষুধ লাগাই। ব্যাধি সূক্ষ্ম চেতনায়, কর্ম শরীরে তথা বাসনা শরীরে, আর আমরা চিকিৎসা করি স্থূল মনের, জাগ্রত মনের, তথা স্থূল শরীরের। এই মনের ঐ কাজ নয়। যেখানে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা

এবং বাসনাব বাস, যেখানে তাদেব স্রোত বযে যাচ্ছে, তাব নাম অধ্যবসায। অধ্যবসায মলিন হতে পাবে, আবাব নির্মলও হতে পাবে। অধ্যবসাযেব মলিনতা বা নির্মলতাব আধাবে ভেতবেব সব কিছু কাজ চলে। আমবা কেবল স্থূল মনেব পবিচর্যা কবতে থাকি, জাগ্রত মনেব সেবা কবতে থাকি। সাবা জীবন আমবা পবিচর্যা কবে চলি। কিন্তু বোগ কখনও নিবাময হয় না। আমবা ভাবি, এত চেষ্টা কবাব পবেও বোগেব শেষ হল না। যে গ্রামীণ ফুঁ দিযে বিজলি বাতি নেভাতে চেযেছিল আমবা ঠিক তাব মত। ফুঁ দিলে বিজলি বাতি নিভবে না। বোগ সাববে না।

আমবা যেন শ্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতবে নিযে যাই, যাতে অবচেতন মনেব দুযাব খোলা সম্ভব হয, স্থূল শবীব এবং সূক্ষ্ম শবীবেব মধ্যে যে প্রাচীব আছে তা ভাঙ্গতে পাবি, তাদেব মাঝখানে এমন এক দুযাব বানাতে পাবি যা দিযে সোজাসুজি স্থূল মন থেকে সূক্ষ্ম মনে, স্থূল শবীব থেকে সূক্ষ্ম শবীবে চলে যেতে পাবি। আমবা যদি মধ্যবর্তী প্রাচীব ভাঙ্গতে পাবি, মধ্যবর্তী দুযাব খুলতে পাবি তবে তা সাধনাব এক বিবাট বড উপলব্ধি হবে।

এই দবজা খোলাব যে সাধনা তাব নাম একাগ্রতা। দূবত্বকে অতিক্রম কবাব সাধনাব নাম একাগ্রতা। আমবা যত বেশি একাগ্রতাব অভ্যাস কবতে পাবব তত বেশি পরিমাণে আমবা এই ব্যবধান দূব কবতে সমর্থ হব। যেমন যেমন আমাদেব একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে তেমন তেমন আমাদেব স্থূল মন নিষ্ক্রিয হযে যাবে আব সূক্ষ্ম মনেব কাজ কবাব সুযোগ মিলবে। সূক্ষ্ম মন সক্রিয হবে। দবজা খুলে যাবে। যেমন আমাব বিচাবশূন্যতা বৃদ্ধি পাবে তেমন এত জোবে ধাক্কা লাগবে যে সূক্ষ্ম মনেব দবজা খুলে যাবে। যখন আমবা শ্বাসেব গতি বুঝতে পাবব, শ্বাসেব গতি মৃদু কবতে পাবব, তখন ঐ মৃদু শ্বাস এত শক্তিশালী হযে যাবে যে তাব ধাক্কায সেই দবজা খুলে যাবে। আমাদেব স্থূল জগতেব বিশ্বাস, যা স্থূল তা অতিশয-শক্তিশালী। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতেব

বিশ্বাস এর একেবারে বিপরীত। যা সূক্ষ্ম তাতেই শক্তি। আধুনিক আণবিক তত্ত্ব এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। আজকাল এই বিশ্বাস হয়েছে যে, স্থূলে কোন শক্তি নেই, শক্তি সূক্ষ্মতায়। এক প্রাচীন শ্লোকে এই তথ্যের সুন্দর অভিব্যক্তি রয়েছে—

হস্তী স্থূলবপুঃ স চাঙ্কুশবশঃ কিং হস্তিমাত্রঙ্কুশঃ ?
দীপে প্রজ্বলিতে, বিনশ্যতি তমঃ কিং দীপমাত্রং তমঃ ?
বজ্রেনাপি হতাঃ পতন্তি গিরয়ঃ কিং বজ্রমাত্রো গিরিঃ ?
তেজো যস্য বিরাজতে স-বলবান্ স্থূলেষু কঃ প্রত্যয়ঃ ?

[হাতি বিশালদেহ, কিন্তু অঙ্কুশের বশ। তবে কি হাতি অঙ্কুশ-মাত্রিক, অর্থাৎ হাতির শক্তির মাপ কি অঙ্কুশের দ্বারা হবে ? দীপ জ্বললে অন্ধকার দূরীভূত হয়, তবে কি অন্ধকার দীপমাত্রিক ? বজ্রের দ্বারা আহত হয়ে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে, তবে কি পাহাড় বজ্রমাত্রিক ? যাতে তেজ নিহিত আছে সেই বলবান, স্থূলে কোনও প্রত্যয় নেই।]

হাতি মস্ত বড়, কিন্তু সে ছোট্ট জিনিস অঙ্কুশের অধীন। দীপ জ্বললে অন্ধকারের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু দীপ থেকে অন্ধকার কত বিশাল। দীপ ছোট জিনিস, অন্ধকার মস্ত বড় জিনিস। কিন্তু অন্ধকার বেশি শক্তিশালী নয়, দীপ বেশি শক্তিশালী। পর্বত অতিশয় উচ্চ, বিরাট জিনিস। বজ্র ছোট জিনিস। কিন্তু বজ্র পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে পারে। শক্তি স্থূল আধারে থাকে না, সূক্ষ্ম আধারে থাকে। শক্তি বড় জিনিসে থাকে না, ছোট জিনিসে থাকে। যার তেজ আছে সে বলবান। আকারে ছোট হলে কি আসে যায় ?

স্থূল হওয়া, বিরাট বড় আয়তনের হওয়া, কোন বিশেষ মহত্ত্বের সূচক নয়। আজকাল সূক্ষ্মের শক্তিতে প্রত্যয় বেড়ে চলেছে।

কাজেই আমাদের স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীরের দিকে যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করতে হবে। আমরা যেন স্থূল চেতনা থেকে সূক্ষ্ম চেতনার দিকে যাই। সূক্ষ্ম শরীরকে, সূক্ষ্ম চেতনাকে জাগিয়ে তুলি। এই জন্যই আমাদের সমস্ত প্রক্রিয়া তথা অভ্যাসের প্রয়োজন।

আমরা আজকের দিনে যে প্রযত্ন করছি সে শুধু অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। আমরা জেনে এবং বুঝে চেষ্টা করব। আমাদের পক্ষে তার নিশ্চিত প্রয়োজন আছে। আমরা জানি কেন আমরা ঐ রকম প্রযত্ন করি। তার পেছনে আছে আমাদের এক গভীর প্রয়োজন, সেটি হল—আমরা যেন শ্বাসের আলম্বন, তথা এক স্থূল আলম্বন নিয়ে চলি। স্থূল আলম্বনের সাহায্যে, শ্বাসের সাহায্যে মনকে এমনভাবে তৈরি করে নিই যাতে মন ভেতরে যায়, গভীরে অবতরণ করে। মনের এই গভীরতায় অবতরণ করার অভ্যাস আমাদের হারিয়ে গিয়েছে। আমরা এই শ্বাসের আলম্বন দ্বারা আবার মনের সেই স্বভাব তৈরি করছি, মনের সংস্কার উৎপন্ন করছি। তার পরিণাম এই হবে যে ভেতরে যেতে থাকলে, দেখতে থাকলে এবং গভীরে অবতরণ করলে এমন এক ধাক্কা লাগবে যে, স্থূল চেতনা এবং সূক্ষ্ম চেতনার মধ্যবর্তী সেই দুয়ার খুলে যাবে। তখন আমরা জানতে পারব অভ্যাস বদলানো যায়, স্বভাব বদলানো যায়, দোষের যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাকে রোধ করা যায়। দোষের জড় উজাড় হয়ে গেলে দোষের সমাপ্তি ঘটে। স্থূল মনে বার বার সঙ্কল্প আবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন হয় না।

১২

স্থূল থেকে সূক্ষ্মে

সত্যেব সন্ধান। কথাটি বড প্রিয। 'সত্য' কথাটি নিজেই বড প্রীতিকব। কিন্তু সত্যেব সন্ধান বিশেষ জটিল ব্যাপাব। সত্য যখন এত বড, এত বিবাট তখন তাব সন্ধান নিশ্চযই সামান্য ছোটখাটো ব্যাপাব নয। আমবা সত্যেব অন্বেষণ কবাব সঙ্কল্প কবেছি। আমাদেব মনে সত্যান্বেষণেব ভাবনা জেগেছে। আমবা সঙ্কল্প গ্রহণ কবেছি। কাবণ সত্যেব সন্ধান না কবলে, যথার্থকে না বুঝলে, কোন লোক ঠিক কাজ কবতে পাবে না। পৃথিবীতে যত উচিত কাজ হযেছে সে সবই সত্যেব সন্ধানেব পবে হযেছে। যেখানে সত্যেব চর্চা হয না সেখানে সব কাজই ভ্রান্তিপূর্ণ হযে থাকে। আমবা অল্প সমযেব মধ্যে সত্যেব স্বৰূপ উপলব্ধি কবব, এ কি সম্ভব? সত্য অত্যন্ত মহৎ বস্তু এবং তাব সন্ধান পেতে হলে বিশেষ প্রযত্ন কবা প্রযোজন। যদি আমাদেব অভ্যাস ভ্রান্তিহীন হয, আমবা যা কিছু কবি তা যদি প্রমাদমুক্ত হয, যদি তাব প্রতি আমাদেব নিষ্ঠা থাকে, যদি আমবা সত্যেব সাথে সাথে চলি, তবে আমবা সত্যেব স্বৰূপ অবশ্যই সন্ধান কবতে পাবব।

শুরুতেই আমবা বৃহৎ এবং বিবাট সত্যেব সন্ধান কবতে যাব না। কিন্তু আমবা সেই পবিমাণ সত্যেব অবশ্য সন্ধান কবব যে পবিমাণ

আমাদেব সাধনাব সহযোগী হতে পাবে এবং যাব আধাবে আমবা বিনা নৈবাশ্যে, বিনা বাধায়, সাধনাব পথে এগিযে যেতে পাবব। এই পবিমাণ সত্য আমাদেব জানতে হবে, খোঁজ কবতে হবে। এই পবিমাণ সত্যও যদি খোঁজ কবা না যায তবে সাধনাব পথে এগিযে যাওযা যাবে না। পদে পদে বাধা আসবে—সন্দেহেব বাধা, অবিশ্বাসেব বাধা, মুর্খতাব বাধা। আমবা না ভেবেচিন্তে, না বুঝেসুঝে কাজ কবে চলি, ফলে কিছুই মেলে না। এই সমস্ত বাধা পদে পদে আসতে থাকে, তাব কাবণ যে সত্যেব অনুভূতি, যে পবমার্থেব সাধনা আপনাব হওযা উচিত তা হয নি। তাব জন্য আপনাব মনে ঐ বকম তীব্র প্রেবণা আসা সম্ভব নয।

একশ' ডিগ্রি উত্তাপে জল বাষ্পে পবিণত হয। তাব কম উত্তাপে জল বাষ্পে পবিণত হয না। জলকে বাষ্পে পবিণত কবতে হলে তাকে একশ' ডিগ্রি উত্তাপ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। ঐ তাপমাত্রায না পৌঁছনো পর্যন্ত ঐ পবিবর্তন ঘটবে না। সেই বকম সত্যেব যতটা উত্তাপ, যতটা তাপমাত্রা প্রযোজন, সেই পবিমাণ তাপমাত্রা আমাদেব মিললে তবেই আমাদেব পবিবর্তন সম্ভব হয। তখনই শুধু ঐ পবিবর্তন সম্ভব হয। তা না হলে সম্ভব হয না।

সাধনাব পথে বহু বাধা আসে। সে সমস্ত বাধা আসে আমাদেব শবীব থেকে। শুধু স্থূল শবীব থেকে বাধা আসে তাই নয, সূক্ষ্ম শবীব থেকে বাধা আসে। সাধনাব পথে কিছু দূব অগ্রসব হওযাব পবে সবাব থেকে বড বাধা আসে আমাদেব বিদ্যুৎ শবীব থেকে, তৈজস শবীব থেকে।

তৈজস শবীবেব, তথা বিদ্যুৎ শবীবেব চমকপ্রদ শক্তি আছে। তাব নানা বকম বাহাদুবি দেখানোর ক্ষমতা আছে।

আমবা কলকাতায গিযেছিলাম। সেখানে এক বিজ্ঞানকক্ষেব সামনে গেলাম। বন্ধ দবজা আপনা আপনি খুলে গেল। ভেতবে গেলাম, বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। পাখা চলতে লাগল। কিন্তু

ভেতরে কেউ ছিল না। কোন লোক ঐগুলিকে সঞ্চালিত করে নি। ঐ সবই আপনা আপনি চলেছে। এই হল বিদ্যুতের বাহাদুরি, বিজলির কেরামতি। আমাদের তৈজস শরীরের ঐ রকম বহু কেরামতি আছে। লোকে বলে—ইনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক, কারণ এঁর চেহারায় জ্যোতি আছে। এত জ্যোতি যে মনে হয় তেজ যেন ঠিকরে পড়ছে। এত বড় সাধক যে তিনি মাটি থেকে ওপরে উঠে যান। এত বড় সাধক যে হাত থেকে বিভূতি ঝরে পড়ছে। এত বড় সাধক যে হাত বাড়ালেই মিষ্টি, আতর, ফল সব এসে যায়। মিষ্টি খাও, আতর লাগাও, ফল খাও। এ সবই আমাদের তৈজস তথা বিদ্যুৎ শরীরের কেরামতি। এ সবই আমাদের প্রাণশক্তির চমৎকারিতা, আমাদের বিদ্যুৎ এবং তৈজস শরীরের খেল। সাধক এই সবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমি এ কথা বলতে চাই না যে এগুলি বিস্ময়কর নয়। আমি বলতে চাই যে এগুলি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কেননা এগুলি স্থূল শরীরের দ্বারা সংঘটিত নয়। কিন্তু এগুলি আশ্চর্যজনক নয়।

আমাদের সাধনার সূত্র—রাগস্স দোসস্স য সংখএণং এগন্ত মোক্খং সমুবেই মোক্খং—রাগ এবং দ্বেষ ক্ষীণ হলে মোক্ষ মিলে যায়। আমরা যে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনা করি, যে বীতরাগতার সাধনা করি, তাতে রাগ এবং দ্বেষ ক্ষীণ হলে তবে মুক্তি হওয়া সম্ভব। আমাদের রাগ ও দ্বেষ ক্ষীণ হওয়া প্রয়োজন। এর নাম আধ্যাত্মিকতা। একেই চেতনার জাগরণ, তথা আত্মার উৎক্রমণ বা উৎক্রান্তি বলে। এতে আত্মার সমস্ত মলিনতা দূর হয়। চেতনা নির্মল হয়, আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। এরই নাম অধ্যাত্মের সাধনা। একেই বলে নির্বাণ বা মোক্ষের সাধনা।

এই সাধনার মাঝখানে বহু জটিলতাপূর্ণ তথা কুটিলতাপূর্ণ বাধা আসে। তাতে সাধকের পথ বদলে যায়। তারা বাহাদুরির খেলায় নেমে পড়ে। তাঁর প্রতি সহসা লোকের আকর্ষণও হয়। কিন্তু লোকের আকর্ষণ থেকে বোঝা যায় না সাধকের রাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হয়েছে কিংবা হয় নি। সাধকের রাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জনতার

কোন মাথাব্যথা নেই। তাতে তাদেব কোন লাভ নেই। জনতা দেখে. সাধক ভূমি থেকে ওপবে উঠতে পাবেন কিনা, সন্তান দিতে পাবেন কিনা, ধন দিতে পাবেন কিনা, অদৃশ্য হতে পাবেন কিনা, আকাশে উড়তে পাবেন কিনা, হাতেব ইশাবায বাঞ্ছিত বস্তু নিয়ে আসতে পাবেন কিনা, লোহাকে সোনায পবিণত কবতে পাবেন কিনা। যদি সাধক এই সব কাজে নিপুণ হন তবে হাজাব লোক তাঁব প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাঁব প্রতি লোকেব আকর্ষণ বাডতে থাকবে। সমস্ত আকর্ষণ হল ভেল্কিবাজিতে। বাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হওযা বা কমে যাওযা সম্বন্ধে কাবও কোন আকর্ষণ নেই।

বিজলিতে চমৎকাবিত্ব আছে। লোকেব তাব ওপবে আকর্ষণ আছে। তা থেকে আলো পাওয়া যায, গবম ও ঠাণ্ডা হাওযা পাওযা যায। আবও নানা কাজ বিদ্যুতেব দ্বাবা হয। তাব প্রতি লোকেব প্রচণ্ড আকর্ষণ।

আমাদেব শবীবও একটি বিজলি ঘব। তা সম্পূর্ণভাবে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। আমবা চিন্তা কবলে আমাদেব মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয। আমবা শান্ত অবস্থায থাকলেও বিদ্যুৎ তৈবি হয। ধ্যানেব সমযে পর্যন্ত বিদ্যুৎ জন্মায। প্রবৃত্তি কম কবলেও আমাদেব মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ জন্মায, আলফা কিবণ উদ্ভূত হয। চিন্তা কবাব সমযে আলফা কিবণ উৎপন্ন হয না, শান্ত অবস্থায তাব উদ্ভব হয। ধ্যানেব অবস্থায আমাদেব মস্তিষ্কে বিজলি তৈবি হয, কিংবা আমবা যখন সহজ শান্ত অবস্থায থাকি তখন আমাদেব দেহে বিদ্যুতেব তবঙ্গ জন্মায, এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয। ঐ সবই বিদ্যুৎ। অনেক লোকে বলে, 'আজ বিশেষ শান্তিব অনুভূতি হচ্ছে।' আমি বুঝতে পাবি, ঐ অনুভূতিও কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয। শান্তিব অনুভূতি হযেছে—তাব অর্থ, আপনাব মস্তিষ্কে আলফা কিবণেব তবঙ্গ প্রবাহিত হযেছে এবং তাব ফলে আপনাব শান্তি মিলেছে।

এক বৈজ্ঞানিক একটি গবেষণামূলক প্রযোগ কবলেন। তিনি

মাটিব ওপবে তামাব জাল বিছালেন এবং তাব ওপবে একটি লোককে বসিযে দিলেন। ঐ লোকটিব শবীবে তিনি তামাব তাব লাগিযে দিলেন এবং তাঁব শবীবেব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতেব সংযোগ কবে দিলেন। লোকটি শান্ত হযে গেল। তাব অপূর্ব শান্তিব অনুভূতি হল। সম্ভবত সে তখন চিন্তা কবে, নিবন্তব ধ্যানমগ্ন লোক কত দীর্ঘকাল ধ্যান কবলে তবে এই শান্তিব স্থিতিতে পৌঁছতে পাবে। আপনি জিজ্ঞাসা কবতে পাবেন, যখন তামাব তাব থেকে এত শান্তি মেলে তখন আমবা তাবেব প্রযোগই কবব। একেবাবে শান্ত হযে যাব।

সান্টাব নামে এক আমেবিকান বৈজ্ঞানিক এই বিষযে অনেক প্রযোগ কবেছেন। তাঁব মনে এক বিকল্প চিন্তা এল। মানুষ ধ্যান কবলে শান্ত হযে যায। তবে কি মানুষেব মস্তিষ্কে আলফা কিবণেব তবঙ্গ উদ্ভূত হয, পশুব মস্তিষ্কে হয না? জানোযাবেব মাথায কি আলফা তবঙ্গ তৈবি হয না? এই বিকল্প চিন্তা মনে আসতেই তিনি প্রযোগ শুরু কবে দিলেন। একথা স্বীকাব কবতে হয যে, সহজ শান্ত ভাব থেকে আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হয। কিন্তু ঐ তবঙ্গ অন্য ভাবে তৈবি কবা যায না। কিন্তু যখন কোন যোগী বা ধ্যানী ধ্যানেব প্রযোগ দ্বাবা আলফা কিবণেব তবঙ্গ সৃষ্টি কবেন তখন বৈজ্ঞানিকবা এবং চিকিৎসকবা আশ্চর্য হযে যান। দিল্লি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটেব একদল ডাক্তাব পবীক্ষা কবে দেখেছেন, ধ্যানী নিজেব ইচ্ছায আলফা তবঙ্গ সৃষ্টি কবেন বা তাকে বোধ কবেন। আবাব উৎপাদন কবেন, আবাব বোধ কবেন। সেই সব বিজ্ঞানীদেব জানা ছিল না, প্রযত্ন দ্বাবা আলফা তবঙ্গ সৃষ্টি কবা সম্ভব হয। প্রথমে তাঁবা স্বীকাব কবেন নি। শুরুতে তাঁবা মনে কবেছিলেন যে, মস্তিষ্কে আলফা তবঙ্গ সহজভাবে উৎপন্ন হয। সান্টাবেব মনে প্রশ্ন জেগেছিল, জানোযাবও কি ধ্যান কবতে পাবে? তাদেব মস্তিষ্কেও কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হতে পাবে? তাদেব মস্তিষ্কে কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন কবা যেতে পাবে? তিনি একটি বিডালেব ওপবে পবীক্ষা কবলেন। একটি বিডালকে অনাহাবে বেখে

তাকে বিদ্যুতের শক বা ধাক্কা দেন। যেমন যেমন বিড়ালের ওপরে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করা হল তেমন তেমন সে শান্ত হয়ে গেল, আর তার মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হল। আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়ার পরে বিড়ালটিকে দুধ এবং মিষ্টি খেতে দেওয়া হল। বিড়ালটি দুধ এবং মিষ্টি খেল। এই পালা চলতে থাকল। প্রতিদিন আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়ার পরে বিড়ালটির দুধ ও মিষ্টি মিলতে লাগল। কিছুদিন পরে বিড়াল এই কথা বুঝে গেল যে, শান্ত এবং স্থির হয়ে গেলে দুধ এবং মিষ্টি মেলে। সে শান্ত থাকতে আরম্ভ করল, ধ্যান শুরু করল। যখন তার খাওয়ার ইচ্ছা হয় তখন সে একেবারে শান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। তার মিষ্টি আর দুধ মিলে যায়। ঐ বিড়াল ধ্যান করতে, শান্ত হতে শিখে গেল।

এ থেকে এই তথ্য নির্গলিত হয় যে, শান্ত বৃত্তি দ্বারা আপনার মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তা বিদ্যুতেরই চমক, কোনও আধ্যাত্মিক বিষয় নয়। এ এক পরিণাম। যখন আমরা শান্ত থাকি, শরীর শিথিল হয়, উত্তেজনা থাকে না এবং মৌন থাকি, তখন ঐ শান্ত অবস্থায় আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। আমাদের শরীরের ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ এবং মস্তিষ্কের ধারাবাহিক বিদ্যুৎ—এই দুই প্রকার বিদ্যুৎ নিরন্তর সঞ্চরমান এবং তারা এত রকম ক্রিয়া করতে থাকে যে, সাধনার পথে চলতে চলতে তার মাঝে বিড়ালের জগতের অবস্থা এসে যায়। ঐ রকম অবস্থায় আমরা ভেবে বসি যে আমরা অনেক শান্তি প্রাপ্ত হয়েছি। লোকে পাঁচ-দশ দিন শিবিরে থাকে। আমি তাদের বলতে শুনেছি—'আহা, আমরা কত আনন্দে আছি। আমরা কত শান্তি পাচ্ছি।' শিবির শেষ হলে তারা যখন আবার আপন আপন ব্যক্তিগত জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এসে পড়ে, তখন তাদের আবার ক্রোধ করতে দেখা যায়, লড়াই করতে দেখা যায়, গালাগালি দিতে দেখা যায়। তাদের শান্তির অনুভূতি কোথায় যায়, কোথায় অদৃশ্য হয়ে

যায়, তার পাত্তাও পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতি থেকে এই কথাই সুস্পষ্ট হয় যে ঐ আনন্দের তথা শান্তির অনুভূতি ভ্রম মাত্র ছিল। তা কেবল উপরিগত ভাসা ভাসা অনুভূতি ছিল। ঐ রকম অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের সাবধান থাকা প্রয়োজন, কারণ তা কেবল ওপরের ব্যাপার।

প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে আপনাকে বহু পরিশ্রম করতে হয়। আপনার শরীর ক্লান্ত হয়। আপনি বিশ্রাম করেন এবং ক্লান্তির স্থিতি-কালে গভীর নিদ্রায় গভীর মগ্ন হয়ে থাকেন। এক বা দু ঘণ্টা বাদে আপনি যখন জাগেন তখন আপনি অনুভব করেন আপনার শরীর সতেজ হয়েছে এবং আপনি অনেক শান্তি পেয়েছেন। এ স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষ যখন প্রবৃত্তির ক্ষণে পৌঁছয়, বিশ্রামের ক্ষণে পৌঁছয়, তখন সে শান্তি অনুভব করে। এ কোনও মৌলিক কথা নয়। মূল কথা হল, যেখান থেকে শান্তির ওঠা উচিত, সেখান থেকেই যেন ওঠে। এর জন্য অন্য প্রযত্নের প্রয়োজন আছে, কিছু করার প্রয়োজন আছে। শান্তির তত্ত্ব, বিদ্যুতের তত্ত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। শান্তির অনুভূতি হয়, আরও অনেক বিচিত্র অনুভূতি হয়। এ সব কিছু ব্যর্থ নয়। আমি এ সব বিষয়কে নিরর্থক বলি না। মধ্য মার্গ রূপে, মধ্য বিশ্রাম রূপে এরও উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমরা যেন এ রকম ভুল না করি যে এই অবস্থা আমাদের অন্তিম লক্ষ্য, আমাদের অন্তিম গন্তব্যস্থল, আমাদের সাধনার অন্তিম সাধ্য। আমাদের দৃষ্টি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

লোকে শক্তিপাতের কথা জানে। শক্তিপাত কি? তা বিদ্যুতেরই কেরামতি। যে লোক আপনার শক্তি বা আপনার বিদ্যুতের বিকাশ করতে সমর্থ হয়েছে সে-ই শুধু অন্যের দেহে শক্তিপাত করতে পারে। তিনি অপর লোকের মাথায় হাত রাখেন এবং নিজের ঊর্জা বা বিদ্যুৎ-শক্তি তার মধ্যে সংক্রমিত করেন।

কোন কিছু দেওয়ার জন্য আমাদের দুটি উপায় বা সাধনযন্ত্র আছে, হাত আর পা। গ্রহণ করার মহৎ সাধন মাথা। মাথাই সংগ্রহ করে।

হাতেব আঙ্গুল আব পা দেয়, মস্তিষ্ক গ্রহণ কবে। পুবনো পদ্ধতি অনুসাবে শিষ্য গুরুব নিকটে এসে তাঁব পাযে মাথা ঠেকায। সে বিদ্যুৎ নিতে চায। গুরুব চবণ বিদ্যুৎ দিতে থাকে এবং তিনি যদি শিষ্যেব মাথায হাত বাখেন, তবে দু দিক দিযে তিনি শিষ্যকে বিদ্যুৎ দিতে থাকেন—হাত থেকে এবং পা থেকে। হাত থেকে শিষ্যেব মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে, পা থেকেও তাব মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ সঞ্চাবিত হতে থাকে। দু দিক থেকেই শিষ্যেব বিদ্যুৎপ্রাপ্তি হতে থাকে। মাথা বিদ্যুৎ গ্রহণ কবাব সবচেযে মহৎ সাধন। তা দু দিক থেকে প্রবাহিত বিদ্যুৎ গ্রহণ কবতে থাকে। আমবা আচার্যেব বন্দনা কবি, আব তাঁব পাযে আমাদেব মাথা বাখি। আচার্য নিজেব হাত শিষ্যেব মাথায বাখেন। এদিকে পা থেকে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন, ওদিকে হাত থেকে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন। মাথা দুদিক থেকে আগত বিদ্যুৎ গ্রহণ কবতে থাকে। এই বিদ্যুতে চমৎকাবিতা আছে, শক্তি আছে। তাব উপযোগিতাও আছে। এ কথা বলা চলে না যে তা সব বকমেই উপযোগবিহীন। কিন্তু এই শক্তিপাত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নয। এই ব্যাপাবেব মূল তত্ত্ব উপলব্ধি কবতে হবে যে বাগ ও দ্বেষ ক্ষীণ না হলে, আধ্যাত্মিকতাব বিকাশ না হলে, চেতনা নির্মলতা লাভ না কবলে, বিকাবেব শেষ হবে না এবং বৃত্তিসমূহেব পবিবর্তন হবে না। যা থেকে পবিবর্তন আসাব কথা, তা ঘটবে না। এ থেকে শুধু মধ্য পথে স্থিত কতকগুলি তত্ত্বেব সন্ধান পাওযা যেতে পাবে।

সাধনাব প্রাবম্ভেই আমাদেব এই সত্য বুঝতে হবে, যাতে আমবা তৈজস শবীবেব তথা বিদ্যুৎ শবীবেব চোখ ঝলসানো দীপ্তিতে, তাব চমৎকাবিত্বে বিভ্রান্ত হযে তাকেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বলে মনে না কবে বসি, তাকে সাধনাব উপলব্ধি বলে না মনে কবি। তা মানসিক সাধনাব উপলব্ধি মাত্র। একে যেন আমবা বাগদ্বেষেব ক্ষীণতা থেকে, বীতবাগতা থেকে উদ্ভূত উপলব্ধি বলে মনে না কবি।

আমবা কোন বস্তুব পবিবর্তন চাই। সে বিষযে আমবা যেন বাব বাব

সুষ্ঠু ভাবে ভেবে দেখি। 'অপ্পনা সচ্চমে সেজ্জা মেত্তি ভুত্রসু কপুঁত্র'— আমাদেব সত্যকে জানতে হবে, নিজেকে এমনভাবে পবিবর্তিত কবতে হবে যাতে শত্রুতাব ভাব একেবাবে নষ্ট হযে যায। এই লোককে আমি শত্রু মনে কবি। নিজেব ভুল, নিজেব দোষ অন্যেব ঘাড়ে চাপিযে দিযে মনে করি সে আমাব অনিষ্ট কবেছে, সে আমাব এই বকম ক্ষতি কবেছে। এই বকম শত্রুতাব ভাব যেন আমাদেব মনে বাসা না বাঁধে। সে নিজেও কিছু অনিষ্ট কবেছে, কিছু দোষ কবেছে, এ কথা কেউ মানতে চায না। সমস্ত কিছু দোষ আমবা অন্যেব ঘাড়ে চাপিযে দিই। পাথব কি বকম এবড়ো খেবড়ো, আমাব ঠোকব লেগে গেল। আমাব ভুলেব জন্য আমাব ঠোকব লেগেছে, এ কথা আমবা কখনও স্বীকাব কবব না। আমবা বলব পাথব ঠিক জাযগায ছিল না, সেই জন্য আমাব ঠোকব লেগেছে। দবজা ছোট, সেই জন্য আমাব মাথায চোট লেগেছে। কিন্তু দবজা ছোট জেনেও আমি নিচু হই নি বা মাথা নোযাই নি, সেই জন্য আমাব মাথায আঘাত লেগেছে—এ বকম ভাবে কেউ চিন্তা কবে না। ও আমাব সঙ্গে এই বকম ব্যবহাব কবেছে, ঐ বকম ব্যবহাব কবেছে, আমাব বন্ধুকে বিগড়ে দিযেছে, তাকে ভুল বুঝিযেছে—এই বকম ভাবে আমবা সমস্ত দোষ অন্যেব ঘাড়ে চাপাই। আমবা অন্যেব দোষ দেখি, আব অন্যকে দোষী সাব্যস্ত কবে নিজেকে দোষেব ভাগী হওযা থেকে বাঁচাই। কিন্তু যারা সত্যেব সন্ধান কবেছে বা এখনও কবছে, তাবা অন্যেব ওপবে দোষাবোপ কবে না। তাবা এ কথা স্বীকাব কবে যে তাদেব নিজেদেব মধ্যে ভ্রান্তি নানা প্রকাব বিকৃতি উৎপাদন কবছে। সেই জন্য তাবা যাতে অপ্রমত্ত থাকতে পাবে, জাগ্রত থাকতে পাবে, সর্বদা সজাগ থাকতে পাবে, তাব জন্য প্রযত্ন কবতে থাকে।

আমাব বিবেচনায শত্রুতাব অর্থ শুধু এই নয যে অন্য কোন লোকেব ওপবে বিদ্বেষ থাকবে, আব মিত্রতাব অর্থও এই নয যে শুধু অন্য কোন লোকেব প্রতি আমাব প্রেম থাকবে। শত্রুতাব অর্থ, নিজেব কর্তব্যপালনে ভুল কবে অন্যেব কর্তব্যে অবহেলা লক্ষ্য কবা। এ এক

রকমেব শত্রুতা। পাথবেব সঙ্গেও আমাদেব শত্রুতা হযে যায। আমবা পাথবকেও গাল দিতে আবম্ভ কবি। পাত্রটি জলে পবিপূর্ণ ছিল। তাকে এক হাতে ওঠালাম। পাত্রটি ফেটে গেল। কিন্তু জলে ভর্তি পাত্র এক হাত দিযে ওঠালে সেটি ফেটে যাবে, এ সত্য আমবা খুঁজে পাই না। এ কথা আমবা চিন্তাই কবব না। আমবা বলব পাত্রটি এত কাঁচা ছিল যে সেটি ফেটে যাবে না তো কি হবে? এ তো ঐ বকম পাত্রেব অবশ্যম্ভাবী পবিণাম। নিজেকে কর্তব্যপালনে ক্রটিব দোষ থেকে বাঁচানোব জন্য এই বকম কথাবার্তাও এক বকম অন্যেব প্রতি শত্রুতা। অপব বস্তু সজীব বা নির্জীব যাই হোক না কেন, মিত্রতাব অর্থ শুধু তাব প্রতি প্রেম বা প্রীতি নয। প্রেমও মিত্রতা বটে। কিন্তু বাস্তবে মিত্রতাব অর্থ, সবাব অস্তিত্ব স্বীকাব কবা, যে যেমন তাকে সেই ভাবে স্বীকাব কবা, কাবও ওপবে কিছু আবোপ না কবা। এর নাম মিত্রতা। একেই 'অনাশাতনা' বলে। জৈন সাহিত্যেব একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ—আশাতনা। জীবেব আশাতনা হয, অজীবেবও আশাতনা হয। বাডিঘবেব আশাতনা হতে পাবে, কাপডচোপডেও আশাতনা হতে পাবে। সব কিছু জিনিসেবই আশাতনা হতে পাবে। আমাদেব পক্ষেব ব্যাপক মনোভাব হল, আমবা সত্যেব সন্ধান কবব, সবাব সাথে মিত্রতা করব। অর্থাৎ যে যেখানে যেমন আছে আমবা তাকে তাব সেই সহজ ভাবেই স্বীকাব কবে নেব এবং কাবও ওপবে কিছু আবোপ কবব না। এই হল সত্য। এই সত্য আমাদেব উপলব্ধি কবতে হবে। এই সত্য গ্রহণ না কবতে পাবলে কোন বকম সাধনা কবা সম্ভব নয।

এক সাধক আছেন। যদি তিনি দু ঘণ্টা ধবে ধ্যান কবেন, মৌন থাকেন, কিন্তু অন্যেব মধ্যে নানা দোষ দেখতে পান, তবে আমাব বিবেচনায তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায নিবত নন। তিনি প্রকৃতই ধ্যান এবং মৌন সাধনায ব্যাপৃত নন। তাঁব দৃষ্টি অন্যেব ওপবে। এ থেকে তিনি কি পেযেছেন? নিজেব ভেতবে তিনি কিসেব সন্ধান কবেন? তাঁর ভেতবে এতে কি পবিবর্তন হয? সাধনাব দ্বাবা কিছু বদলানো

উচিত, পবিবর্তন হওযা উচিত। কিন্তু পবিবর্তন কেন হয না ?

তাব একটি কাবণ, আমাদেব সমস্ত শবীব প্রকম্পিত। আমবা অনেকবাব অনুপ্রেক্ষা কবি, এই কথা বাবে বাবে আবৃত্তি কবি—'প্রকম্পনকে, শবীবে নিবন্তব ঘটিত প্রকম্পনকে, দেখ।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদেব শবীব প্রকম্পনেব পুলিন্দা। প্রকম্পন আব প্রকম্পন, কেবল প্রকম্পন। আমাদেব ভাগ্য ভাল যে আমবা সব প্রকম্পন দেখতে পাই না। সমস্ত কিছু প্রকম্পিত হচ্ছে, কোন কিছুই শক্ত নয। হাডগুলি এত ফাঁপা যে তাব ভেতব দিযে যে কোন কিছুই বেবিযে যেতে পাবে।

গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, 'ভন্তে! কে বদলায ?'

ভগবান বলেছিলেন, 'যা অস্থিব তাই বদলায। যা স্থিব তা বদলায না। যখন জীব যৌবন প্রাপ্ত হয তখন তাব সমস্ত অবযব বদলায।' হাত বদলে যায, পা বদলে যায, সব কিছু বদলে যায। এই পবিবর্তন কেন হয ? এব উত্তব : দেহ অস্থিব, কম্পনেব অধীন। শুধু কম্পন ছিল বলে পবিবর্তন হযেছে। কম্পন যদি না হতো তবে পবিবর্তন হতো না। সমস্ত কিছু কম্পনেব ব্যাপাব। বোগ কেন হল ? কম্পন ছিল, সেই জন্য বোগ হল। কম্পন না থাকলে বোগ হতো না। স্থিব বস্তুব কখনও কোন ব্যাধি হতে পাবে না। অস্থিব বস্তুতেই ব্যাধি হয। কম্পন থেকে বোগ হয, কাবণ কম্পন থেকে বদলানোব ক্ষমতা আসে। সব কিছু বদলায, বদলাতে পাবে, আব যা বদলায তাব পক্ষে সে পবিবর্তন ভালও হতে পাবে, মন্দও হতে পাবে। সুন্দবও হতে পাবে, অসুন্দবও হতে পাবে, মিষ্টও হতে পাবে, কটুও হতে পাবে। যা বদলায তাব নানা প্রকাব পবিবর্তন হতে পাবে।

আমাদেব গোটা শবীব প্রকম্পনেব পুলিন্দা। যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিগোচব হয এবং যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিব বহির্ভূত সব কিছু প্রকম্পন। আমি কথা বলছি, কথাব সাথে সাথে শব্দেব তবঙ্গ এত বেগে ছুটে

যায় যে মনে হয় দশটি সাপ এক সাথে বেগে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু বিনা মাধ্যমে, খালি চোখে আমরা ঐ সব তরঙ্গ দেখতে পাই না। ব্যাঙ্গালোরে ডঃ বিশ্বেশ্বরায়া সায়েন্স ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমি এক যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলি। ঐ যন্ত্রের ওপরে ঐ শব্দের তরঙ্গ এত বেগে ছুটতে লাগল যে মনে হল পঞ্চাশটি সাপ দৌড়চ্ছে। সবই প্রকম্পন আর প্রকম্পন। আমাদের শরীর প্রকম্পনময়, এই সত্য যেন আমরা ঠিক মত উপলব্ধি করি। আমাদের শরীরের যত কিছু পরিণাম, যত কিছু পরিবর্তন হয় সে সব কিছুই প্রকম্পনের দ্বারা ঘটে থাকে।

আমি এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছি যে প্রকম্পনের পরিবর্তন করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিরোধ থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হতে পারে। যেমন, বিচারের তরঙ্গ এক প্রকারের প্রকম্পন। এক রকম বিচার চলতে থাকে আর প্রকম্পন চলতে থাকে, তার তরঙ্গ চলতে থাকে। আমরা ভাবনা করি, বিরোধী তরঙ্গ উৎপাদন করি। আগেকার তরঙ্গের সঙ্গে তার সংঘাত হয়। সে তরঙ্গ এত শক্তিশালী যে আগেকার তরঙ্গের সমাপ্তি ঘটায়। এ সবই আমরা প্রকম্পনের ফলে করি।

'ইমং শরীরং অনিচ্চ'—এ শরীর অনিত্য, এ কথা আমি বার বার বলে চলেছি। লোকে জিজ্ঞাসা করে, এ দিয়ে কি হবে? আমরাও এ কথা দশ-বিশ মিনিট বার বার আবৃত্তি করি, কিন্তু তাতে কি হবে? এর মর্ম আপনারা এখনও বুঝতে পারবেন না। আপাতত এই কথাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে বার বার আবৃত্তি করতে থাকুন। সঙ্কল্প করুন যে এই কাজ করতেই হবে এবং এই রকম করা ভাল, হিতকর, কল্যাণকর। ঐ রকম করে কি হবে সে কথা ধীরে ধীরে আপনাদের বোধগম্য হবে। আপনারা শুরু থেকে স্বীকার করে বসে আছেন, শরীর স্থির, নিত্য। এই ধারণা আমাদের সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তার নিজের প্রকম্পন এবং তরঙ্গ আছে। ঐ প্রকম্পন-তরঙ্গকে প্রতিহত করতে হলে বিরোধী তরঙ্গের প্রয়োজন। আপনি 'ইমং শরীরং অনিচ্চ'—এই বাক্যটি আবৃত্তি করতে থাকুন। দশ-বিশ মিনিট ধরে আবৃত্তি করে যান।

এ থেকে বাচিক বা বচন থেকে উদ্ভূত তবঙ্গ সৃষ্ট হয। সঙ্গে সঙ্গে আপনি ভাবনা কবতে থাকেন। ভাবনা থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হয। যেমন যেমন 'ইমং শবীবং অনিচ্চ' এই ধ্বনি এবং ভাবনা শক্তিশালী হযে যাবে এবং তাব তবঙ্গ প্রবল হবে তেমন তেমন তা পূর্বগত সংস্কাবেব তবঙ্গকে সমাপ্ত কবে দেবে, বিনষ্ট কবে দেবে। যদি এই কথা আমাদেব বোধগম্য হয তবে 'ইমং শবীবং অনিচ্চ'—এই কথা বাবে বাবে আবৃত্তি কবতে কবতে আমাদেব বিবক্ত হওযাব বা নিবাশ হওযাব কোন কাবণ থাকবে না। আমবা কথা বলে প্রকম্পন সৃষ্টি কবি। কিন্তু ঐ প্রকম্পন ততটা কার্যকবী হয না। সেই জন্য বাব বাব বলা হযেছে, মনকে একাগ্র কব, মনকে সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে বাখ, তন্ময়তা অভ্যাস কব। তাব অর্থ, নিছক কথাব প্রকম্পন ততটা কার্যকবী হয না। যখন তাব সাথে ভাবনাব প্রকম্পন সংযুক্ত হয তখন তা অত্যন্ত শক্তিশালী হয। ঐ শক্তিশালী প্রকম্পন আগেকাব প্রকম্পনকে বাতিল কবে দেয।

প্রকম্পনকে বোধ কবা সম্ভব। আমি নির্বিচাব ধ্যানেব কথা বলছি। শবীবকে স্থিব কব, কাযোৎসর্গ কব, শবীবকে ঢিলে কব, মৌন থাক, আব মনকে শান্ত কব। কুম্ভক কবে মনকে নির্বিকল্প কব। কোন কল্পনাবিলাস কববে না। এই বকম কবলে প্রকম্পনকে বোধ কবতে পাবা যায। প্রকম্পন বোধ কবা অত্যন্ত প্রযোজন, আব তাকে বোধ কবলে তা যত ক্ষীণ হয, তাব যত ধাক্কা লাগে, তা আমবা কল্পনাও কবতে পাবব না। চলতে চলতে যে গতি সহসা রুদ্ধ হয তাকে সামলানো বড মুশকিল। যে লোক দ্রুত বেগে চলছে সে হঠাৎ একেবাবে থামতে পাবে না। তাকে প্রথমে তাব গতিবেগ কমিযে দিতে হবে, পবে এক সময আসবে যখন সে থামতে পাববে। সেই বকম তেজী গাডি থামানোব জন্য হঠাৎ পুবো ব্রেক কষলে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমে গতি মন্থব কব, তাব পবে ব্রেক কব। চলতে চলতে আমবা যদি বিচাবেব ওপব পুবো ব্রেক লাগাই, শ্বাসেব ওপবে হঠাৎ ব্রেক লাগাই,

তাকে একবারে থামতে যাই, তবে এমন বিস্ফোরণ হবে যে তাতে পুঞ্জীভূত সংস্কার ধ্বংস হবে। প্রকম্পনের বোধ এক সত্য। প্রকম্পন বোধ সম্ভব।

আমি ছোট ছোট কথার উল্লেখ করছি। এগুলি ছোট ছোট সত্য। সেগুলি বুঝতে পারলে সাধনার ওপরে আমাদের নিষ্ঠা বেড়ে যাবে। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাগরূকতা বৃদ্ধি পাবে।

আপনাকে বলেছি, শ্বাসের মোড়ের ওপরে লক্ষ্য রাখুন। আমরা যখন পুরো শ্বাসের সাথে মনকে নিয়ে চলেছি তখন শ্বাসের মোড়ের ওপরে ধ্যান কেন্দ্রিত করার কথা কেন? এই কথা আপনি বুঝবেন যাতে আপনার মন এত সংবেদনশীল হয় বহু ছোট তত্ত্বেরও অবধান তা করতে পারে।

সাধারণ ক্যামেরা আপনার ফোটো বা প্রতিচ্ছবি তুলতে পারে। কিন্তু ধরুন আপনি কোন জায়গায় দু ঘণ্টা বা দশ মিনিট বসে রইলেন, তারপরে উঠে চলে গেলেন। তখন আপনার ছবি তুলতে হবে। ঐ সাধারণ ক্যামেরায় সে ছবি তোলা যাবে না। তার জন্য সংবেদনশীল বা অনুভূতিসম্পন্ন ক্যামেরা প্রয়োজন, এমন ক্যামেরা যাতে মানুষ কোথাও অবস্থান করার পরে সেখান থেকে চলে গেলেও তার ছবি উঠতে পারে। তার কারণ মানুষটির আকৃতির পরমাণু সেই জায়গায় সঞ্চিত থাকে। ঐ রকম ক্যামেরা দ্বারা চোর ধরা যেতে পারে, আরও অনেক রকম জিনিসের সন্ধান করা যেতে পারে, অনেক কিছু কথার পাত্তা পাওয়া যেতে পারে। ঐ সব কাজ করার জন্য ক্যামেরায় বিশেষ সূক্ষ্ম ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আমাদের মন সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য। আমাদের মনের সংবেদনশীলতা যত বৃদ্ধি পাবে তত আমরা সূক্ষ্ম কথা ধরতে পারব।

যে সমস্ত প্রয়োগ দ্বারা মনকে ছোট বিন্দুকে গ্রহণ করতে সক্ষম করা যায় সে সমস্তই হল মনকে সংবেদনশীল করার প্রক্রিয়া। আপনি সম্পূর্ণ নাসাগ্রে আপনার শ্বাসের প্রকম্পন দেখুন। এই প্রক্রিয়া চলতে

চলতে আপনি এক সময নির্দেশ পাবেন। নাসাগ্রেব নিচে নাসাগ্রেব এক আঙ্গুল পবিমিত স্থানে মনকে কেন্দ্রিত করুন এবং সেখানে প্রকম্পন লক্ষ্য করুন। আপনি হযতো ভাবছেন, যখন সম্পূর্ণ নাসাগ্রেব প্রকম্পন দেখছি তখন এক বিন্দুতে ঘটিত প্রকম্পন দেখাতে কি প্রভেদ হবে? এক আঙ্গুল পবিমিত স্থান কেন দেখব? এব উত্তব সুস্পষ্ট। যে মন সম্পূর্ণ নাসাগ্রেব প্রকম্পন দেখছে তাকে এক বিন্দুতে এক আঙ্গুল পবিমিত স্থানে কেন্দ্রিত কবাব অর্থ, সেই মনেব সংবেদনশীলতা বেড়ে গিযেছে, তাব ক্ষমতা বেড়ে গিযেছে।

এই সব ছোট ছোট জিনিস কিভাবে আমাদেব মনে পবিবর্তন নিযে আসে, কিভাবে আমাদেব শাবীবিক ক্রিযাকলাপে পবিবর্তন ঘটায, কি কবে আমাদেব ধাবণা ও সংস্কাবসমূহেব উদ্ভব কবে এবং কি কবে আমাদেব ভেতবকাব পুঞ্জীভূত সংস্কাবকে উন্মূলিত কবে, আপনাবা যদি বুঝতে পাবেন তবে সাধনাব দ্বাবা আপনাদের যা পাওযা উচিত, যা আপনাদেব অভীষ্ট, তাই পাবেন।

বাজা একটি লোকেব ওপবে প্রসন্ন হযে বললেন, 'কিছু চাও। তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেব।' লোকটি একটু অদ্ভুত ধবনেব ছিল। সে ধন বা প্রভুত্ব চাইল না। সে বলল—'বাজন। আপনি যখন দান কবতে চান তখন আমাকে শান্তি দান করুন। আমি শান্তি চাই, অন্য কিছু চাই না।' বাজা চিন্তা কবলেন, 'আমি একে শান্তি দেব কোথা থেকে? আমি নিজেই অশান্ত, আমি কোথা থেকে একে শান্তি এনে দেব?' তিনি এক সন্ন্যাসীব কাছে গিযে বললেন, 'গুরুদেব। কৃপা করুন। আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচান। আমি একটি লোকেব প্রার্থনা পূবণ কবাব কথা দিতে সে বলল, 'আমাকে শান্তি দিন।' আমাব কাছে তো শান্তি নেই, আমি তাকে কোথা থেকে শান্তি দেব। এখন আপনি আমাকে দযা করুন।'

সন্ন্যাসীব নিজেব শান্তি ছিল, কাজেই তিনি বাজাকে শান্তি দিতে পেবেছিলেন। বাজা সেই লোকটিকে ডেকে তাকে শান্তিব উপায বলে

দিলেন। সে শান্তি পেল।

সাধনা থেকে যে ক্ষমতা, যে পুবস্কাব পাওযা যায তা অন্য কিছু থেকে পাওযা যায না। স্থূল শবীব ও স্থূল চেতনা থেকে পাওযা যায না, স্থূল কর্ম থেকে পাওযা যায না। সূক্ষ্ম চেতনা এবং সূক্ষ্ম জগতেব স্তবে পৌঁছতে পাবলে তবে তাকে পাওযা সম্ভব হয। কথা হচ্ছে' সেখানে পৌঁছতে হবে। আমবা যদি কোন স্থূল স্তবে থেকে যাই তবে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হব না। সেই জন্য আমবা সাধনাব মাধ্যমে স্থূল শবীব এবং স্থূল চেতনাকে অতিক্রম কবে সূক্ষ্ম শবীব ও সূক্ষ্ম চেতনা পর্যন্ত পৌঁছনোব চেষ্টা কবি। সেখানে পৌঁছলে আমাদেব অভীষ্ট পূবণ হবে।

১৩

অধ্যাত্মের রহস্যের সন্ধান

আমরা কোন লোকের সঙ্গে বিশ বছর বাস করেও তাকে সম্পূর্ণ জানতে এবং চিনতে না-ও পারি। দূরের মানুষকে জানা কিছুটা সহজ। কিন্তু যে লোকের সঙ্গে বাস করি তার পরিচয় পাওয়া বেশ কঠিন।

অধ্যাত্ম বিষয় আমাদের এত নিকট, এত অন্তরঙ্গ, তাই এত রহস্যাবৃত। কিন্তু ঐ রহস্য উদঘাটন ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে যত বিকাশ হয়েছে সে সবই অধ্যাত্মের রহস্য উদঘাটন দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ভৌতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা রহস্য উদঘাটন করছেন, আর এখন তাঁরা আণবিক বিস্ফোরণের ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছেছেন। মানসিক জগতে মনোবিজ্ঞানীরা অনেক অনেক রহস্য উদঘাটন করে অবচেতন মনের ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। অন্য অনেক ক্ষেত্রে যখনই রহস্যের আবরণ উন্মোচন সম্ভব হয়েছে তখনই নতুন শক্তির প্রবাহ মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আর, শক্তিস্রোতের উপলব্ধি রহস্যের উদঘাটন ছাড়া সম্ভব নয় এবং শক্তিস্রোতের উপলব্ধি না হলে এই সংসারে বিকাশ হতে পারে না। আজকালকার ভৌতিক জগতের সমস্ত বিকাশ বিদ্যুৎ এবং ইন্ধনের ওপরে নির্ভরশীল। পেট্রোলের কোন সমস্যা হলে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র

টলমল করে, লাক্ষ দুর্ভাবনায় পড়ে। তাদের সমস্ত শক্তিস্রোত শুকোতে আরম্ভ করে। আপনি কল্পনা করুন সারা দুনিয়াতে পেট্রোল নেই, বিদ্যুৎ নেই, আণবিক ইন্ধন নেই। তা হলে কি এই ভৌতিক বিকাশ টিঁকে থাকতে পারবে? কখনই তা সম্ভব নয়। এই সবই বিদ্যুতের আধারে সংঘটনশীল। আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের শক্তির বিকাশের একটি উৎস হল বিদ্যুৎ। যেমন আধুনিক সমস্ত ভৌতিক বিকাশ বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল তেমনি অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। এই হল অধ্যাত্মের রহস্য।

আমাদের শরীর বিদ্যুতের শরীর। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। জৈন দর্শনবিদ ভালভাবেই জানেন যে, আমাদের সমস্ত অভিব্যক্তি তৈজস শরীরের মাধ্যমেই হয়। তৈজস শরীর ছাড়া শরীরের সঞ্চালন সম্ভব নয়। তৈজস শরীর বিনা কেউ কথা বলতে পারত না, অঙ্গুলিহেলন করতে পারত না, শ্বাস নিতে পারত না, খেতে পারত না, খাদ্য পরিপাক করতে পারত না। আমাদের সমস্ত উর্জা বা শক্তি তৈজস শরীরের মাধ্যমে প্রকট হয়। এই বিদ্যুৎমণ্ডল, বিদ্যুৎ শরীর এবং তৈজস শরীর—এ সবই মনুষ্যদেহে শক্তির অবতরণের এবং অধ্যাত্মের কাছে পৌঁছবার জন্য একটি দুয়ার। তৈজস শরীর দ্বারা আমরা যে শক্তি আয়ত্ত করি তা আজকালকার জগতে বিস্ময়কর বটে। প্রাচীন সাহিত্যে এই সমস্ত শক্তিকে 'লব্ধি' বলা হয়েছে। এগুলিকে 'যোগজ বিভূতি' ও বলা হয়েছে। এই সমস্ত লব্ধি, ঋদ্ধি, যোগজ বিভূতি তৈজস শরীরের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

জৈন আগম প্রজ্ঞাপনার দু রকম মানুষের বর্ণনা পাওয়া যায়—ঋদ্ধিপ্রাপ্ত আর ঋদ্ধিবিহীন মানুষ। যে মানুষ ঋদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ শক্তি উপলব্ধি করেছে, সে ঋদ্ধিপ্রাপ্ত মানুষ। তার শক্তিসমূহ যথার্থই বিস্ময়কর।

অধ্যাত্মের আলোচনার প্রারম্ভে বাহ্য বস্তু এবং অধ্যাত্মের মধ্যে আমাদের একটি ভেদরেখা অঙ্কিত করতে হবে। প্রাচীন আচার্যগণ

একটি ভেদবেখা নির্দিষ্ট কবেছেন। ভগবান মহাবীব বলেছেন—যে মানুষ অধ্যাত্মকে জানে আব যে বাহ্যকে জানে, সে অধ্যাত্মকে জানে। এর তাৎপর্য এই যে, আমাদেব দুই স্থিতি প্রকট—এক বাহ্য জগতেব এবং অপবটি অধ্যাত্ম জগতেব। একটি আমাদেব বাইবেব সংসাব। অপবটি আমাদেব ভেতবেব সংসাব। বাইবেব সংসাবেব নাম সমাজ, ভেতবেব সমাজেব নাম ব্যক্তি। সময সময আমবা বাহ্য জগতেব সঙ্গে সংযুক্ত হই। তাব অর্থ, অন্য লোকেব সঙ্গে আমাদেব সংযোগ হয। ঐ লোকেব সঙ্গে আমাদেব সম্বন্ধ স্থাপিত হয। আমবা সমাজ হযে যাই। ব্যক্তি সমাজে পবিণত হয। যখন আমবা একলা থাকি, কাবও সঙ্গে আমাদেব সংস্রব থাকে না, আমাদেব একাকীত্ব সুবক্ষিত থাকে তখন সমাজ হযে যাই না, তখন আমবা ব্যক্তি থাকি। আমাদেব সামাজিক জীবনও আছে, আবাব ব্যক্তিজীবনও আছে। ব্যক্তি জীবনে সংঘটনশীল ব্যাপাবগুলি ভিন্ন প্রকাবেব হয।

আমবা দু বকম জীবন যাপন কবে থাকি—বৈযক্তিক বা ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবন। আমাদেব জীবন দু বকম মান-বিশিষ্ট। আমাদেব বৈযক্তিক জীবন আধ্যাত্মিক বা আন্তবিক জীবন। আব সামাজিক জীবন আমাদেব বাইবেব জীবন। এ জীবন আমবা সাধাবণত বাইবেব জগতে যাপন কবি। আমবা দু বকম জীবন যাপন কবি এবং দুযেবই বহস্যেব সন্ধান কবি। বাহ্য জগতেব বা সমাজজীবনেব, তথা আন্তবিক জগতেব বা ব্যক্তিগত জীবনেব ঘটনাবলীব ব্যাখ্যা কবি।

অন্তর্জগৎ চেতনাব জগৎ, কেবল চেতনাব জগৎ। সেখানে শুধু চেতনা থাকে, আব কিছুই থাকে না। তাকে আমবা শক্তি, জ্ঞান বা অন্য যে নামই দিই না কেন, তা বিশুদ্ধ চেতনা মাত্র। ঐ চেতনায যা আছে তা আনন্দও বটে, শক্তিও বটে, জ্ঞানও বটে। কিন্তু মোটেব ওপব তা বিশুদ্ধ চেতনা, তা ছাড়া আব কিছুই নব।

বাইবেব জগৎ বৈচিত্র্যেব জগৎ। সেখানে অনেক পদার্থ, অনেক

জিনিস। সেগুলি অণু-পরমাণুর দ্বারা সংঘটিত। অন্তর্জগতে আছে শুধু চেতনা, আর কোন কিছুই নয়।

একটি চেতনার জগৎ, অপরটি পদার্থের জগৎ। যখন আমরা চেতনার জগতের দিকে অগ্রসর হই তখন আমরা যেখানে পৌঁছতে হবে বলে বিচার করি, সে-ই আমাদের অভ্যাস। চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা যা কিছু করি সেই আমাদের ভৌতিক বা বস্তু জগৎ।

রহস্যের সন্ধানের জন্য আমাদের কিছুটা গভীরতার মধ্যে যেতে হবে। কখনও কখনও কোন কিছু ঘটে আর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। কখনও কখনও কোন নিমিত্ত থাকে না, কিন্তু অনায়াসে অতল গভীরতায় ডুব দেওয়ার সুযোগ ঘটে যায়, আর রহস্য প্রকাশিত হয়।

আপনারা রহস্য উদ্‌ঘাটনের সিদ্ধান্ত জানেন এবং অনেক ঘটনার কথাও শুনেছেন।

একটি লোক পাহাড়ের পাশে বসেছিল। সেখানে একটি ঝরণা বয়ে যাচ্ছিল। সেখানে এক হরিণী এল। সে অনেকক্ষণ তার একটি পা জলে ডুবিয়ে রাখল। আর এক দিন এল। তার পরে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনও এল। চারদিন সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, পঞ্চম দিনে সে পা সোজা করে চলতে লাগল। সেই লোকটি ভাবল—হরিণীটি কেন রোজ আসে? সে বিচার করল। হরিণীর পা দেখল। তার পা জখম ছিল। হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। দু-চারদিন জলের উপচার প্রয়োগের ফলে তার পা ঠিক হয়েছিল।

লোকটি এই উপচার আয়ত্ত করল। প্রাকৃতিক চিকিৎসা আরম্ভ হল। জলের এবং মাটির উপচার শুরু হল।

একটি লোক বসে ছিল। সে দেখল একটি বাচ্চা শুয়ে আছে। তার শ্বাস ফুলে উঠছিল। তার গভীর শ্বাস পড়ছিল। পেট ফুলে ছিল, আর শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সে লা-লা-লা করে এক অব্যক্ত শব্দ করছিল। লোকটি চিন্তা করল। সে ভাবল যে ঐ ধ্বনির সাথে

সাথে একটা কিছু হচ্ছে। সে তার প্রয়োগ করল। ধ্বনি-চিকিৎসার বিকাশ হল। লোকটি শব্দের উচ্চারণ দ্বারা ধ্বনি-চিকিৎসার বিকাশ ঘটাল। এই পদ্ধতি দ্বারা রোগ নিরাময় হল।

একটি লোকের মাথায় অত্যন্ত ব্যথা হয়েছিল। সে বৈদ্যের কাছে গেল। অনেক চিকিৎসা করাল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। সে জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হল। তার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। একবার কোন একটি মানুষের সঙ্গে তার লড়াই হল। তার শত্রু রেগে এসে তাকে বাণ মারল। তার পায়ে লাগল। বাণটি পায়ে বিদ্ধ হওয়া মাত্র তার মাথার ব্যথা একেবারে সেরে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে চিন্তা করল—এত উপচার প্রয়োগেও আমার ব্যথা সারে নি, আর একটি তীর লাগতেই তা একেবারে সেরে গেল। মনে হচ্ছে আমার মাথায় কোন কালেই কোন ব্যথা ছিল না। এ রহস্য বুঝতে পারলাম না। সে বৈদ্যের কাছে গেল। নিজের দীর্ঘ কাহিনী তাকে শোনাল। বৈদ্যও বিস্মিত হয়ে গেল। সে ঐ রকম প্রয়োগ শুরু করল। আর একটি লোকের মাথায় ব্যথা হল, তাকে সে তীর মারল। তার ব্যথা সেরে গেল। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম লোকের ওপরে একই প্রয়োগ করল এবং তাদের মাথা ব্যথা সেরে গেল। তখন এই তথ্য স্থাপিত হল যে, মাথার ব্যথা হলে পায়ের বিশেষ স্থানে বাণ বিদ্ধ করলে মাথার ব্যথা সেরে যাবে। এই প্রয়োগের নাম আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি।

আমাদের শরীর বিদ্যুতের শরীর। তাতে বিদ্যুতের প্রাধান্য। আমরা মানি বা না মানি বিদ্যুতের ভারসাম্যের অভাবে যে শরীরে অনেক রোগ হয় এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তথ্য। তৈজস শরীর অস্থির হলে তাতে নানা প্রকার বিকৃতি সঞ্জাত হয়। যদি আমরা তৈজস শরীরের সমুচিত ব্যবস্থা করি, বিদ্যুতের ভারসাম্য স্থাপন করি, তার সমতা আনি, তবে আমরা নিজে নিজে অনেক কিছুরই সমাপ্তি ঘটাতে পারি, অনেক পরিস্থিতির মীমাংসা আমরা নিজেরাই করতে পারি।

আমি এই সমস্ত আলোচনা এইজন্য করছি যে রহস্যের সন্ধান না

করলে. রহস্য উদ্‌ঘাটন না করলে এই দুনিয়ায় বিকাশ সম্ভব হবে না, শক্তির উপলব্ধি হবে না। প্রাচীন আচার্যগণ অনেক রহস্যের সন্ধান করতেন। আজ আমরা যদি কোন সিদ্ধান্ত বুঝতে পারি কিছুকাল পরেই আমরা তা বিস্মৃত হই। সব কিছু ভুলে যাই। ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা ঐ সমস্ত রহস্যের ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারি না, এবং তাদের প্রয়োগ করতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনার আলোচনা করব। আমি সত্য একটি কথা পড়েছি—উত্তর দিকে মাথা দিয়ে বা দক্ষিণ মুখে পা রেখে শোয়া উচিত নয়। এই বচন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। কেউ কেউ এ বচন অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে করে। তারা বলে—শয়নকালে আমরা পা দক্ষিণ. উত্তর, পশ্চিম বা পূর্ব যে দিকেই রাখি না কেন, তাতে কি পার্থক্য হয়? কোন না কোন দিকে মাথা তো রাখতে হবে। কিন্তু আজকাল প্রত্যেক জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরে ব্যাপার এই রকম দাঁড়িয়েছে যে, কোন লোক যদি কোন বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলে তবে সে নিতান্ত দুঃসাহসী। আগেকার দিনে এ রকম বলা চলত, আজকাল আর চলে না। সম্প্রতি আমি এই বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা পড়ে বিস্মিত হয়েছি।

আমাদের শরীরে দু রকম বিদ্যুৎ আছে—পজিটিভ ও নেগেটিভ। এক হল ধনাত্মক, অপরটি ঋণাত্মক। চোখ, কান, নাক, মাথা, মুখ প্রভৃতি শরীরে ওপরের অংশে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ। আর পা, জঙ্ঘা প্রভৃতি শরীরের নিচের অংশে আছে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ। ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ড থেকে, জগৎ থেকে পৃথক নয়। যখন জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন সে সমাজে পরিণত হয়। আমরা বাতাবরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ জগতে বাস করি। পরিস্থিতিরও প্রভাব আছে। আমরা এই সব কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হই।

পৃথিবীর দুটি দিককে ধ্রুব বলে মানা হয়—উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তরে

যে ধ্রুব সেখানে অফুরন্ত বিদ্যুৎভাণ্ডার আছে। সেখানে এতই বিজলির প্রকাশ যে সেখানে গেলে মনে হয় শত শত সূর্যের উদয় হয়েছে। এমন চোখ-ধাঁধানো আলো। অন্ধকারের কোন পাত্তাই নেই। দক্ষিণী ধ্রুবতে সম-পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। উত্তরের ধ্রুবতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ, দক্ষিণের ধ্রুবতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ। যখন লোকে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয় তখন দক্ষিণের দিকে তার পা থাকে। দক্ষিণের দিকে থেকে যে বিদ্যুতের প্রবাহ আসে সেটি ঋণাত্মক। মানুষের পায়ের বিদ্যুৎও ঋণাত্মক। দুই ঋণাত্মক বিদ্যুৎ যেখানে মিলিত হয় সেখানে প্রতিরোধ ঘটে, সংঘর্ষ হয়। একই ভাবে যখন ধন বিদ্যুতের সঙ্গে ধন বিদ্যুৎ মিলিত হয় তখন প্রতিরোধ ঘটে। ফলে একে অন্যের সহায়ক না হয়ে পরস্পরকে পরাস্ত করতে প্রয়াস করে। সেই জন্য যে লোক দক্ষিণদিকে পা রেখে শোয় তার ঋণাত্মক বিদ্যুতের সঙ্গে দক্ষিণী ধ্রুব থেকে আগত ঋণাত্মক বিদ্যুতের সংঘর্ষ লাগে। ঐ রকম পরিস্থিতিতে লোকের মনে নানা রকম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, সে খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তার শরীরে নানা রকম রোগ ও বিকৃতি উৎপন্ন হয়। সেই কারণে বৈজ্ঞানিকরা প্রতিপন্ন করেছেন, দক্ষিণ দিকে পা রেখে ঘুমোনো উচিত নয়। তা থেকে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার রোগ হতে পারে।

আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরে যে তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারি এবং সত্য বলে দেখতে পাই এবং যার ওপরে আমাদের যথার্থ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তা শুধু মেনে নেওয়া থেকেই হয় না।

এখন আপনাদের অধ্যাত্ম-রহস্য বোঝানোর জন্য এই সন্দর্ভের অল্প আলোচনা করতে চাই।

ধর্মের মূল সূত্র—পাপ কোরো না, পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কিন্তু কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারবে, সেই হল প্রশ্ন। মন কত চঞ্চল, শরীর কত চঞ্চল। বাণী কত চঞ্চল। তা ঐ সব থেকে কিছু না কিছু পাপ হয়ে যায়। আমি পাপ থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করব? পাপ থেকে বাঁচার কি উপায় আছে? অধ্যাত্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন ছাড়া অন্য

কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়. ঐ প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। মানুষ পাপের হাত থেকে বাঁচতে পারে এ কথা অনেকে মানতে পারে না। তাদের প্রশ্ন—যে দুনিয়াতে পাপ করার জন্য অনবরত হাজার হাজার প্রেরণা আসছে. সেই দুনিয়াতে বাস করে লোক কি করে পাপের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

ভগবান মহাবীর এ বিষয়ে উপায় নির্ধারণ করার প্রসঙ্গে বলেছেন—এক কচ্ছপ ছিল। যখন কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হতো—পাখিতে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে গেল. শিয়াল প্রভৃতি পশু তাকে খেতে চেষ্টা করল. কোন রকম নিরাপত্তার অভাব বা ভয় উপস্থিত হলে—সে তৎক্ষণাৎ নিজের খোলের মধ্যে চলে যেত প্রকৃতি তাকে এমন একটি খোল দিয়েছিল যা তার ঢালের মত কাজ করত। প্রাচীনকালে যখন তলোয়ার আর ঢাল নিয়ে যুদ্ধ হত তখন যোদ্ধা নিজের হাতে ঢাল রাখত। খোলটি কচ্ছপের পক্ষে সেই ঢাল হয়েছিল। কচ্ছপ নিজের খোলের মধ্যে চলে গেলে সব রকমে সুরক্ষিত হতো। আমাদের কি এমন কোন খোল আছে যেখানে পৌঁছলে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পাব? আমাদের মনে বাসনা ফুলে ফেঁপে উঠছে। আমাদের ওপরে বাসনা. ক্রোধ তথা আবেগের আক্রমণ হচ্ছে। এমন কোন উপায় আছে কি যার দ্বারা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়? হ্যাঁ. উপায় আছে। ভগবান বলেছেন—কচ্ছপ যেমন বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নিজের খোলের ভেতরে চলে যায় তুমিও তেমনি অধ্যাত্মের ভেতরে চলে যাও। সব আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে। অধ্যাত্মের ভেতরে চলে যাও. চেতনার ভেতরে চলে যাও। ভেতরে চলে যাও. অন্তরে প্রবেশ কর. তা হলে সুরক্ষিত হবে। যত দিন মন বাইরে ঘুরে বেড়াবে. তত দিন পর্যন্ত বাসনা ও আবেগ ফুলে ফেঁপে উঠবে। যে সমস্ত পরিস্থিতি চিন্তা. ভয় এবং দুঃখ উৎপন্ন করে সে সবই মনকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেয়। তুমি ভেতরে চলে যাও. চেতনার জগতে চলে যাও. চেতনার নৈকট্য লাভ কর. সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ. সম্পূর্ণভাবে

সুবক্ষিত হবে। কোন বিপদ নেই, কোন ভয় নেই। সে এক জ্বলন্ত শক্তি। এ শক্তি তুমিও অনুভব কবতে পাব।

এক বকম কথা মানতেই হয়। আমাব এক বকম কথা মানাব প্রয়োজন নেই, কিন্তু অনুভব কবা সম্ভব। অধ্যাত্ম-কথা শুধু মেনে নেওয়াব জিনিস নয়। আপনাবা যদি চান তবে আজই এই অবস্থাব নির্ণয় কবতে পাবেন, আজ বাতেই শোবাব পব পবই এ সম্বন্ধে অনুভব কবতে পাবেন। আপনাব মনে কোন বিচাব আসতে পাবে, তাব বিকল্প আসতে পাবে, অনেক খাবাপ চিন্তা মনেব ভেতব থেকে ঠেলে উঠতে পাবে। আপনি তৎক্ষণাৎ নিজেব অন্তবে চলে যান, মনেব ভেতবে প্রবেশ করুন। আপনাব মনে হবে আপনি যেন অন্য এক জগতে এসে পৌঁছেছেন আব সমস্ত বিকাব, বিকল্প ও চিন্তা বাইবেব জগতে থেকে গিয়েছে। আব তাবা আপনাকে আক্রমণ কবতে পাববে না। একেই বলে প্রেক্ষা ধ্যান। এব অর্থ—আপনি নিজেকে দেখতে আবম্ভ করুন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেই নিজেকে দেখতে আবম্ভ কববেন, চেতনাব ক্ষেত্রে চলে যাবেন সেই মুহূর্তে আপনি বাসনা, ক্রোধ ইত্যাদিব আক্রমণ থেকে মুক্ত হবেন। আব কোন কিছুব আক্রমণ হতে পাববে না।

অধ্যাত্মেব সাহায্যে আমবা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাবি। আমবা অধ্যাত্মেব চর্চা কবি তাব কাবণ অধ্যাত্মই আমাদেব এই সব বাইবেব আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পাবে, আব এই সব প্রভাবেব বশবর্তী হওয়া থেকে বক্ষা কবতে পাবে। আজ আমবা অধ্যাত্ম থেকে খানিকটা দূবে চলে গিয়েছি। আজ আমাদেব পথ দেখানোব কেউ নেই। অধ্যাত্মেব বহস্যও আমাদেব অজানা হয়ে গিয়েছে। এব কাবণ কি? যা ঘটেছে তা এই—

একটি লোক পথ চলছে। পায়েব আঘাতে জীব মবে যাচ্ছে। আমবা বলি—জীবহিংসা হল। ঐ লোক অনেক প্রাণী মেবে ফেলল, জীবহিংসা কবল। এই আমাদেব বিচাব, ব্যবহাবেব বিচাব, বাইবেব

দুনিযাব বিচাব। ভগবান মহাবীব এবং কোন কোন মনস্বী আচার্য এ কথা স্বীকাব কবেন না। তাঁবা এই কথা বলেছেন—অধ্যবসায থেকে বন্ধন হয। এক অধ্যবসায, অপব ঘটনা। দুটো দুই জিনিস। অধ্যবসায় অন্তর্জগতেব বিচাব, ঘটনা বাহ্য জগতে ঘটে। আচার্য ভিক্ষু বলেছেন, যে হত্যা কবে সে হিংসক। যে মাবে অর্থাৎ যাব মাবাব জন্য অধ্যবসায আছে সে হিংসক। জীব বেঁচে থাকল কি মাবা গেল তাব সঙ্গে হিংসাব কোন সম্বন্ধ নেই। জীবেব বেঁচে থাকা কোন দযাব ব্যাপাব নয, জীবেব মৃত্যুও কোন হিংসাব ব্যাপাব নয। জীব মরুক বা না মরুক, সেটা গৌণ ব্যাপাব, অন্য ব্যাপাব। হত্যা কবাব যে সঙ্কল্প, অধ্যবসায এবং তাব পবিণাম, সেই হল মুখ্য কথা। হিংসা হল হত্যাব জন্য অধ্যবসায, কোন জীবেব মৃত্যুব ঘটনা নয। অধ্যবসাযেব জগতে পৌঁছে যখন আমবা বহস্যসমূহ দেখি তখন আমাদেব সমস্ত সাধনপদ্ধতি পবিবর্তিত হযে যায। তাবপব আমবা আব ঘটনাকে মুখ্য বস্তু বলে মেনে কাজ কবি না, অন্তবকে প্রধান মনে কবে আচবণ কবতে থাকি।

সামাজিক জীবন একটা দিক। আন্তবিক জীবনই সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নির্ণযেব আধাব। এই কাবণে বলা হয, দিন বা বাত্রি যে কালই হোক, কেউ দেখুক বা না দেখুক, তাতে কোন পার্থক্য হয না। যে স্থিতিতে দেখা বা না দেখাব মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকে না, সে হল আন্তবিক ক্ষেত্রে স্থিতি। ব্যবহাবেব জগতে প্রভেদ আসে। যে ব্যবহাবেব নিযম অনুযাযী চলে সে আচবণ কবাব আগে দেখবে আলো না অন্ধকাব আছে, কেউ দেখছে কিংবা দেখছে না। এই বিচাবেব আধাবে তাব আচবণ ঘটবে, সে পদক্ষেপ করবে।

স্বপ্ন কেন আসে? আমবা কেন ঘুমেব মধ্যে স্বপ্ন দেখি? মনস্তাত্ত্বিকদেব ব্যাখ্যা হল, আমাদেব মনেব দমিত বাসনাদি যখন আমাদেব জাগ্রত অবস্থায প্রকট হবাব সুযোগ পায না তখন তাবা স্বপ্নেব ভেতবে প্রকটিত হয। সেই জন্যই ঘুমেব ভেতবে স্বপ্ন আসে। একটা সীমা পর্যন্ত এ কথা ঠিক বটে। কখনও কখনও এমন হয যে,

শোবাব সময যে কথা মনে থেকে যায স্বপ্নে সেই কথা আমাদেব সামনে দৃশ্যমান হয। অধ্যাত্ম-বহস্যেব এটি একটি বড সত্য। ক্রোধ আসে। সে পর্যন্ত পৌঁছে আপনাব স্থিতি বিনষ্ট হয। তাব কোন ওষুধ নেই। তাকে নিযন্ত্রণ কবা যায না। ব্যবহাবেব দিক দিযে এ কথা তো ঠিকই বটে। আমি আপনাদেব সর্বদা ব্যবহাব থেকে মুক্ত থাকতে বলছি না। আমাদেব নিযন্ত্রণ কবাব শক্তি আছে, আমাদেব বিবেক আছে। আমবা বাহ্য জগতে জীবন ধাবণ কবি, এই জন্য আমাদেব ব্যবহাবকেও মেনে চলতে হয। কিছু নিযন্ত্রণ হয, দমনও হয, ওষুধও দেওযা হয। কিন্তু অধ্যাত্মেব চর্চাব সময এসব কথা বলতে কোন সঙ্কোচ হওযা উচিত নয। কাবণ এ শুধু ব্যবহাবেব কথা, অধ্যাত্মেব কোন কথা নয। অধ্যাত্মেব কথাব মূল পর্যন্ত যেন পৌঁছই।

সমস্ত সমস্যাব মূল—বাগ এবং দ্বেষ। প্রচলিত ভাষায বলা যায—হিংসা। পবিগ্রহই বল, অ-ব্রহ্মচর্যই বল, চুবিই বল আব মিথ্যাভাষণই বল—এসব কিছুকেই আমাদেব আচার্যগণ হিংসা বলে স্বীকাব কবেছেন। উলটো দিক থেকে দেখলে বলা যায অহিংসা ছাডা কোন মহাব্রত হয না। দুটি কথাব মধ্যে দুনিযাব সব কিছু এসে যায—হিংসা এবং অহিংসা। অহিংসা কি? বাগ-দ্বেষ প্রভৃতিকে উৎপন্ন হতে না দেওযাব নাম অহিংসা। আপনি অহিংসাব কথা, অহিংসাব ঘটনা হিংসাব সঙ্গে এক কবে দেখবেন না। ঘটনাব শেষ কবে ফেলাব চেষ্টাও কববেন না। যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হয সেই ক্ষণকে লক্ষ্য করুন। যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হয প্রকৃতপক্ষে সে-ই হল জাগ্রত থাকাব সময।

প্রেক্ষা ধ্যানেব সূত্র হল—অপ্রমাদ ও জাগরূকতা। কি বিষযে জাগরূকতা? অতীতেব সম্বন্ধে জাগরূক থাকাব কোন প্রযোজন নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও জাগরূক থাকাব কোন প্রযোজন নেই। বর্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগ্রত থাক। বর্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগরূক থাকাব তাৎপর্য: যে কোন বীজ পাওযা গেলে তা বর্তমান ক্ষণেই বপন কবতে হবে। পবে ফল আসবে, পবিণাম আসবে, মহীরুহ জেগে উঠবে। সে বৃক্ষকে

আপনি উপড়াতে পারবেন না। আপনি ফলাগম রোধ করতে পারবেন না। আপনি শুধু লক্ষ্য করুন, বীজ বপন করা হয়েছে কিংবা হয় নি। বর্তমান কালের যে ক্ষণে বীজ উপ্ত হয়েছে সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমরা জাগরূক থাকব। সেটি রাগের তথা দ্বেষের ক্ষণ। ঐ রাগের ও দ্বেষের বীজ যে মুহূর্তে বপন করা হয় সেই মুহূর্তে আমি যদি জাগরুক না থাকি তবে পরিণাম-বিষয়ে সজাগ থাকার কোন অর্থ হবে না। অধ্যাত্মের সূত্র থেকে তার যে এক বড় রহস্য প্রতিপন্ন করা হয়েছে সেটা হল—রাগের তথা দ্বেষের ক্ষণ হল হিংসার ক্ষণ। অ-রাগ ও অ-দ্বেষের ক্ষণ অহিংসার ক্ষণ।

বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে থাকে। মনের মধ্যে কোন বিকল্প চিন্তা উঠল, এক বিচার মনে এল। তাকে উপেক্ষা করব। তার পরিণাম এই হবে যে, ঐ বীজ যখন উপ্ত হবে এবং ঐ বীজ যখন বড় হবে, অর্থাৎ বৃক্ষে পরিণত হবে তখন নিশ্চিতভাবে নিজের পরিণাম নিয়ে আসবে। আমরা যেন দুনিয়ার ঘটনাবলী দেখি। পঞ্চাশ-ষাট বছর পর্যন্ত যে যশস্বী থেকেছে, যার জীবনের পূর্ব অংশ তেজস্বিতা ও যশের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে, সে যখন জীবনের উত্তরাংশে পৌঁছয় তখন তার পতন হয়, সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ রকম কেমন করে সম্ভব হয় ভেবে আমরা আশ্চর্য হই। যে লোক পঞ্চাশ-ষাট বৎসর যশস্বী এবং তেজস্বী জীবন যাপন করেছে তার জীবনের পরের দিক কেমন করে পতনের দিকে যেতে পারে? আমরা সাধারণত এর ব্যাখ্যা করতে পারি না। কিন্তু ঐ রকম ঘটনার পেছনে কোন কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা যদি মনের গভীরতায় এ বিষয়ে সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করি তবে এই তথ্য স্পষ্ট হবে, যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নি, এখন তা বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তার ফলে শেষের ঘটনা ঘটেছে।

মনে রাগ এবং দ্বেষের যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলা, পরিবর্তন করা তার প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত করলে আর ঐ সব সংস্কার উপদ্রব করবে না। বীজকে নষ্ট করে দিলে তা

থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হবে না। প্রাযশ্চিত্ত না কবলে বীজ অঙ্কুবিত হওযাব এবং বেড়ে উঠাব সুযোগ পাবে। কালে কালে তা বৃক্ষে পবিণত হবে, তাব শিকড ছডিযে পডবে। তখন তাকে আব বশ কবাব উপায থাকে না। তাব যে কষ্টদাযক ফল তা আমাদেব ভোগ কবতে হয। কিন্তু আমবা ঘটনাকে মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কবি না, পবন্তু অন্তবকে মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কবি।

অধ্যাত্মেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহস্য এই যে, বাগেব এবং দ্বেষেব বীজ যে ক্ষণে উপ্ত হয সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমাদেব জাগৰূক থাকতে হয।

আমবা অহিংস। আমবা অত্যন্ত স্থূলভাবে মেনে নিযেছি যে, কাউকে না মাবাব নাম অহিংসা। কিন্তু বাগ ও দ্বেষেব বীজ যদি মনেব ভেতবে উপ্ত হয তবে কি কবে অহিংসা হবে? ব্যবহাবেব জগতেব কথা তো ঠিকই। কোন লোক যদি কাউকে হত্যা না কবে তবে সে আইনেব কবলে পডবে না। আইন তাকে অভিযুক্ত কববে না, তাকে বিবক্ত কববে না, কেননা সে এমন কোন কাজ কবছে না যাতে সে আইনেব আওতাব মধ্যে আসে। আইনেব সূত্র—কাজ। এমন কাজ যা আইনেব গণ্ডিব মধ্যে আসে। অধ্যাত্মেব সূত্র—অধ্যবসায। কাজ হোক ছাই না হোক অধ্যবসায মাত্র দাযিত্ব হযে যায। এই বকম অধ্যবসায, সঙ্কল্প, বিচাব তথা পবিণাম হিংসাপ্রধান। ঐ বকম ভাব মনে এলে আপনি যদি কিছু না কবেন তবে আপনি হিংসাব বন্ধনে আবদ্ধ হন। আপনি নিজেকে এভাবে প্রস্তুত কবতে পাবেন—আমি তো কোন কিছু কবি নি, তবে আমি ঐ ঘটনাব জন্য দাযী হব কেন? অধ্যাত্ম এ কথা স্বীকাব কবে না আপনি ক্রিযা-ৰূপে কিছু কবেন নি। সে এই নির্ণযে পৌছতে চায যে, আপনি ঐ ৰূপ চিন্তা কবেছেন কিংবা কবেন নি। ঐ বকম চিন্তাৰূপ ক্রিয়া কবেছেন কিংবা কবেন নি। চিন্তাব আধাবে, পবিণাম এবং অধ্যবসাযেব আধাবে অধ্যাত্মেব সমস্ত বিচাব হয, আইনেব সমস্ত বিচাব হয কার্যেব আধাবে। যদি আমবা এই কথা ঠিকমত বুঝতে পাবি তবে জাগৰূকতাব ক্ষেত্র মুক্ত হযে যায,

জাগরূকতার সীমা বেড়ে যায়। আবার আমরা মূল সম্বন্ধে যতটা জাগরূক হই পরিণাম সম্বন্ধে ততটা জাগরূক হই না। যখন আমাদের মন প্রমাদ দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন হয় তখন আমাদের জাগরূকতা পরিস্থিতি তথা পরিণামের ওপরে নিবদ্ধ হয়। আমরা ভাবতে থাকি—ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, ও আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করেছে, ও আমাকে অপমান করেছে। আমাদের সমস্ত চিন্তা বাহ্য জগতের দিকে যায়। আমরা চিন্তা করে দেখি না এতে রাগ ও দ্বেষের মুহূর্ত কি ভাবে উজ্জীবিত হয়। অর্থাৎ আমরা অধ্যাত্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে বাইরের বিচারের দিকে চলে যাই।

ভগবান মহাবীর এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছেন—সমস্ত দায়িত্ব আত্মার। তিনি কখনও বলেন নি যে আত্মা ছাড়া মানুষের কোন শত্রু বা মিত্র আছে। তিনি বলেছেন, আত্মাই মানুষের মিত্র। কিন্তু মিত্রের খোঁজ কেউ করে না। তিনি কখনও বলেন নি, অন্য কেউ তোমাদের বন্ধনদশায় নিয়ে যায়। ঐ বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তির দায়িত্ব, ঐ পুণ্য এবং পাপের দায়িত্ব, ঐ সুখ ও দুঃখের দায়িত্ব—এ সমস্ত দায়িত্ব আত্মার। সব কিছু কর্মের কর্তা আত্মা। সব কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরে ন্যস্ত, অধ্যাত্মের এই গভীর তত্ত্বে কি আমরা পৌঁছনোর চেষ্টা করি? আমরা হামেশাই প্রত্যেক ব্যাপারের দায়িত্ব অন্যের ওপরে আরোপ করি এবং যখন অন্যের ওপরে দায়িত্ব আরোপ করি না তখন আমাদের মন হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আমরা এখানে সেখানে খোঁজ করি অমুক এ রকম করেছে, অমুক ঐ রকম করেছে। ঐ রকম করে আমরা নিজেদের হালকা বোধ করি, আর ভাবি এ রকম কাজই চলছে। কিন্তু অধ্যাত্মের রহস্য এ থেকে ভিন্ন। অধ্যাত্মের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব: কেউ কারও জন্য দায়ী নয়। আপনাদের আত্মার, আপনাদের অধ্যবসায়ের সমস্ত কিছু ঘটনার জন্য চূড়ান্ত দায়িত্ব।

আমি আপনাদের কাছে অধ্যাত্মের রহস্য বিষয়ে দু-তিন রকম আলোচনা উপস্থিত করেছি। ঐ আলোচনার জন্য অনেক বিস্তার

প্রযোজন। কিন্তু আমি তা সংক্ষেপে বিবৃত কবেছি। যদি এই দু-তিন বহস্যের উদঘাটন আমাদেব মনে হওয়া সম্ভবপব হয়, আমাদেব জীবনে হওযা সম্ভব হয, তবে আব কোন বহস্যেব সন্ধানেব প্রযোজন নেই। আজ আমি যে সব আলোচনা কবেছি সেই সব বহস্যেব সন্ধান সকলে কবে। আমাদেব তীর্থঙ্কবগণ, আমাদের আচার্যগণ ঐ সব তত্ত্বেব খোঁজ কবেছেন। তাঁদেব বাণীব সাবাংশ আমি আপনাদেব কাছে বিবৃত কবেছি।

আপনাবা একটু একটু স্মবণ বাখবেন। এই সব বহস্যেব ওপবে আমাদেব ধ্যান কেন্দ্রিত হোক, আব নতুন নতুন বহস্যেব সন্ধানেব জন্য ব্যাকুলতা, ভাবনা এবং শ্রদ্ধা আপনাদেব মনে জেগে উঠুক। আমাব মনে হয আমাদেব পুরুষকাব যদি এই দিকে এগিযে যেতে থাকে, তবে এই সংসাবে ক্লেশভোগকাবী লোক বহু শাবীবিক ব্যাধি এবং মানসিক সংকট থেকে বাঁচতে পাবে এবং কচ্ছপেব রীতি অনুসবণ কবে এ বকম খোল তৈবি কবতে পাবে যে, সমস্ত আক্রমণ থেকে বেঁচে সে নিজেকে সুবক্ষিত মনে কবতে পাবে।

১৪

অধ্যাত্ম ও ব্যবহার

কোন কাজে প্রবৃত্ত হওযাব পূর্বে তাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কবা আবশ্যক। বিনা প্রযোজনে মুর্খ ব্যক্তিও কোন কাজে প্রবৃত্ত হয না। এ জন্য প্রযোজন কি, তা স্পষ্ট কবে প্রকাশ কবতে হয। প্রাচীন কালে গ্রন্থবচনাব প্রাবম্ভে মঙ্গলাচবণ কবা হত এবং উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধ কি তা বলা হতো। এখনও সেবকম কবা আবশ্যক। আমবা যা কবতে যাচ্ছি, তাব উদ্দেশ্য পবিস্ফুট কবতে হবে। যদি আত্ম-সাধনা, ধ্যান বা সমাধিব জন্য প্রচেষ্টা কবতে চাই তবে সেগুলিব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদেব অবহিত হতে হবে। কেন আমবা এই বকম চেষ্টা কবব? এই প্রকাব প্রচেষ্টাব দ্বাবা আমবা কি হতে চাই?

দু বকম স্থিতি আছে। এক স্থিতি হল 'হযেছে', আব অপবটি হল 'হতে যাচ্ছে'। 'কি হযেছে' তা প্রকৃতিবাদী দর্শন, বর্ণন ও নিরূপণ কবে। কিন্তু আচাব শাস্ত্র বা আচাব বিজ্ঞানেব প্রতিপাদ্য হল 'কি হতে চাই?' যেখানে মূলেব প্রশ্ন ওঠে, সেখানে হওযাব ব্যাপাবে জিজ্ঞাসা আসে 'কি হতে চাই?' প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে কি হওয়া উচিত? সমাজেব কি হওয়া উচিত? যেখানে হওযাব কথা আসে, সেখানে মূল্য-বোধেব বিকাশ হয, আচাব শাস্ত্রেব বিকাশ হয। হওযাব কথাব সঙ্গে

'আমাকে কি হতে হবে'—এই প্রশ্ন স্বভাবতই জড়িত থাকে। 'কেন হতে চাই'—এই বিষয়েও ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়।

জৈন আগমে দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—'সংজ্ঞোপযুক্ত' এবং 'নো-সংজ্ঞোপযুক্ত'। চেতনা দুই প্রকারের হয়—সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা, আর নো-সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা। চেতনাতে যখন সংজ্ঞা থাকে তখন তাকে সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা বলে, আর চেতনা যখন সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে তখন তা হয় নো-সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা। বীতরাগ নো-সংজ্ঞোপযুক্ত, তার ক্ষেত্রে বা তার চেতনাতে কোন সংজ্ঞা থাকে না। বীতরাগ সংজ্ঞাতীত চেতনার অর্থ হল—বিশুদ্ধ চেতনা, কেবল চেতনা। যে চেতনার সঙ্গে সংজ্ঞা মিশ্রিত থাকে, যে চেতনা সংজ্ঞার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে চেতনা সংবেদনাত্মক হয়—তাকে সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা বলা যায়। সংজ্ঞা দশ প্রকার, যথা—

১। আহার সংজ্ঞা
২। ভয় সংজ্ঞা
৩। মৈথুন সংজ্ঞা
৪। পরিগ্রহ সংজ্ঞা
৫। ক্রোধ সংজ্ঞা
৬। মান সংজ্ঞা
৭। মায়া সংজ্ঞা
৮। লোভ সংজ্ঞা
৯। লোক সংজ্ঞা
১০। ওঘ সংজ্ঞা

আমাদের সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চেতনা থেকে এইসব সংজ্ঞাকে বহিষ্কৃত করা, অর্থাৎ বীতরাগ হয়ে যাওয়া। এই আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার উদ্দেশ্য। চেতনার সাথে যে সংবেদন যুক্ত আছে, যে সংজ্ঞা জড়িত আছে, তাদের নির্মূল করা—এই আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য। এই কাজের দ্বারা কোন চমকপ্রদ শক্তি অর্জন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য কেবল নিজের চেতনাকে সংশোধন ও পরিমার্জন করা—পরিষ্কার করা। যখন ব্যক্তির চরিত্র পরিমার্জিত ও পরিষ্কৃত হয়, তখন তার বিকাশ আরম্ভ হয়ে যায়। তবে কি আমরা আহার করব না? আহার-সংজ্ঞাকে সমাপ্ত করার অর্থ কি এই? নিশ্চয়ই নয়। শরীর থাকতে এটা সম্ভবই নয় যে আমরা আহার করব না। আহার না করলে

সাধনাব সামর্থ্যও থাকবে না। সাধনাব জন্য শবীব যদি প্রযোজনীয হয, তবে শবীবেব জন্য আহাবও প্রযোজনীয। আহাব ত্যাগ কবা সম্ভব নয, কিন্তু আহাবেব প্রতি আসক্তি বা বাসনা ত্যাগ কবা সম্ভব।

এই সব সংজ্ঞাব মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে নির্মল জলে খানিক কাদা মিশে যায। জল স্বভাবতই নির্মল, কিন্তু তাতে ধুলো পডলে, আবর্জনা জমলে, তা মযলা হযে যায। চেতনা স্বভাবতই শুদ্ধ, কিন্তু তাতে বিভিন্ন সংজ্ঞা এসে যুক্ত হয, ফলে তা বিকৃত হযে যায।

মযলা জল পবিষ্কাব কবা যায। পবিষ্কাব কবাব অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে ঐ বকম অনেক পদ্ধতি ছিল। মযলা জল নির্মল হতে পাবে। জল স্বভাবত স্বচ্ছ ও নির্মল। তাব নির্মলতা একেবাবে নষ্ট কবা যায না। যে আবর্জনা জলে মিশেছে তা দূব কবা যায। আবর্জনা দূব কবে দিলেই জল আগেব মত নির্মল হযে যায।

আমাদের চেতনা নির্মল। তাব নির্মলতাব সমাপ্তি বা বিনাশ নেই। তবে চেতনাব এই অবস্থান্তব ঘটতে পাবে যে, যখন তাতে সংজ্ঞাব আবর্জনা এসে জোটে, সংবেদনেব মালিন্য এসে লাগে, তখন তা মলিন ও অপবিচ্ছন্ন হযে যায। তখন চেতনা আবৃত হযে যায, তাব স্বচ্ছতা আব থাকে না। যেমন মযলায আবৃত হলে দর্পণ অন্ধ হযে যায। তখন তাব প্রতিবিম্ব গ্রহণ কবাব ক্ষমতা কমে যায বা একেবাবে লোপ পায। কিন্তু ঐ দর্পণকে পবিষ্কাব কবলেই তাব ক্ষমতা আবাব প্রকট হয, তা প্রতিবিম্ব গ্রহণ কবতে সক্ষম হয।

সংজ্ঞাব সংস্পর্শে চেতনা ধোঁযাটে ও অস্পষ্ট হযে যায, মলিন হযে যায। চেতনাকে নির্মল কবা, তাকে তাব প্রকৃত অবস্থায এনে কেবল চেতনারূপে প্রতিষ্ঠা কবা—এই হল আমাদেব সাধনাব উদ্দেশ্য।

সাধনাব বহস্য হল কেবল জানা। তা এখনও লাভ কবা সম্ভব। কেবলজ্ঞান অর্থাৎ কোবা জ্ঞান শুধু জ্ঞানই, তাব মধ্যে সংবেদনেব সংস্পর্শ নেই। আপনি ইচ্ছা কবলেই এব অভ্যাস কবতে পাবেন। আপনি কেবলজ্ঞানেব অবস্থায এসে কেবলজ্ঞানী হযে যেতে পাবেন।

কেবলজ্ঞানকে সাধনার অন্তিম স্তর, সাধনার চরম লক্ষ্য বলা হয়; আবার কেবলজ্ঞান সাধনার প্রথম চরণও বটে। যতক্ষণ কেবলজ্ঞানের অভ্যাস না হবে ততক্ষণ সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার অধিকার পাওয়া যাবে না। সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা কেবলজ্ঞান অভ্যাস করতে ব্রতী হই। যা আদিতে, অন্তেও তাই। আদিতে যে কেবলজ্ঞান সাধন, অন্তে সেই কেবলজ্ঞান নিজেই সাধ্য।

উপাদান উপাদানই থাকে। উপাদানের মধ্যে প্রথমে যা হয়, অন্তেও তাই থাকে। কোন পার্থক্য হয় না। আমাদের চেতনা যদি কেবল চেতনা না হয় তবে আমরা কখনও কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হব না। কেবলজ্ঞান তখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় যখন আমরা প্রথম ক্ষণেই তাকে প্রাপ্ত করে নিতে পারি। প্রথম ক্ষণের কেবলজ্ঞানই অন্তিম ক্ষণের কেবলজ্ঞান রূপে দেখা দেয়। সাধনার প্রথম ক্ষণেই যদি কেবলজ্ঞানের সন্ধান না মেলে তবে সাধনার কোন ক্ষণেই—তা লক্ষ বৎসরব্যাপী সাধনা হোক না কেন—কেবলজ্ঞান লাভ করা যাবে না। সাধনার প্রথম ক্ষণেই তাকে লাভ করতে হবে, তবেই অন্তিম ক্ষণে তাকে লাভ করতে পারব।

কুম্ভকার একটি ঘড়া বানাল। ঐ ঘড়া যদি প্রথম ক্ষণেই ফেটে না যায় তবে আর কখনও ফাটবে না। একটি শিশু জন্মাল। সে যদি প্রথম ক্ষণেই মরে না যায় তবে আর কখনও সে মরবে না। সে অমর হয়ে গেল, কখনও সে মরবে না। যার প্রথম ক্ষণে বিনাশ ঘটে নি তার আর কখনও বিনাশ ঘটবে না। প্রথম ক্ষণেই যার সমাপ্তি ঘটে নি, কখনও তার সমাপ্তি ঘটানো যাবে না। প্রথম ক্ষণেই যদি কেবলজ্ঞান না হয়, তবে আর কখনও কেবলজ্ঞান হবে না। বাস্তবিক পক্ষে কেবলজ্ঞান হল কোবা জ্ঞান। এই জ্ঞানের সঙ্গে সংবেদন মিশ্রিত নেই। যখন আমরা সাধনার এরকম স্তর প্রাপ্ত হব তখন আমরা কেবলজ্ঞানের স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব।

প্রাণকে সংবেদন-শূন্য করা, সংজ্ঞার প্রভাব থেকে মুক্ত করা, যোগ-সংযোগ থেকে মুক্ত করা—এই হল আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হতে পারে, এমন করা কি করে সম্ভব হতে পারে? এই বিষয়ে আমি কিছু বিচার করতে চাই।

যোগ-সংযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকোত্তর চিত্ত গঠন করতে হয়। আমাদের চিত্ত দুই প্রকারের—লৌকিক চিত্ত, আর লোকোত্তর চিত্ত। যে চিত্ত সংজ্ঞার ফাঁদে পড়েছে, সংবেদনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে, তা-ই হল লৌকিক চিত্ত। যে চিত্ত পূর্বোক্ত দশটি সংজ্ঞাকেই অতিক্রম করেছে—তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে—তাই হল লোকোত্তর চিত্ত। যিনি লোকোত্তর চিত্ত লাভ করেছেন, তিনি নো-সংজ্ঞোপযুক্ত হয়ে গেছেন। একই শক্তি দুই ক্ষেত্রেই কাজ করে। যে উর্জা, যে প্রাণ ও যে শক্তি লৌকিক চিত্তে কাজ করে, সেই উর্জা, সেই প্রাণ ও সেই শক্তি লোকোত্তর চিত্তেও কাজ করে।

শরীরের দুটি মুখ্য কেন্দ্র আছে। তাদের একটি কাম-কেন্দ্র, অপরটি জ্ঞান-কেন্দ্র। নাভির নিচে যে স্থান তা কাম-কেন্দ্র বা বাসনা-কেন্দ্র। মস্তিষ্ক হল জ্ঞান-কেন্দ্র। আমাদের শরীরে উর্জার একই প্রবাহ আছে। যে স্থানে মন যাবে উর্জাও সেই স্থানে যাবে, প্রাণও সেই স্থানে যাবে। যদি আমাদের মন, আমাদের চিন্তন কাম-কেন্দ্রের দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, তবে ঐ কেন্দ্রের বল ও শক্তি বাড়বে, ঐ কেন্দ্র সমৃদ্ধ হতে থাকবে। প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়ম যে, যা কিছু সিঞ্চন লাভ করবে তা-ই পুষ্ট হবে। যা সিঞ্চন পায়না তা শুকিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। যা সিঞ্চন পায় তা বাড়ে ও সমৃদ্ধ হয়। আমাদের উর্জার সিঞ্চন যে কেন্দ্র লাভ করবে সে কেন্দ্র অবশ্যই পুষ্ট হবে, বাড়বে এবং সমৃদ্ধ হবে, তা সে কাম-কেন্দ্রই হোক বা জ্ঞান-কেন্দ্রই হোক। যদি এই সিঞ্চন নিচের দিকে, কাম কেন্দ্রের দিকে, যায়, তবে আমাদের উর্জার প্রবাহ ঐ দিকেই ঘুরে যাবে। আমাদের সমস্ত প্রাণশক্তি ঐ দিকেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। ফলে কাম-কেন্দ্র বলবান হতে

থাকবে, আর জ্ঞান-কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়বে। এই হল লৌকিক চিত্তের প্রক্রিয়া। লৌকিক চিত্তের কাজই হল, সর্বদা কামনাকে পুষ্ট করা, সেচন দিয়ে কাম-কেন্দ্রকে বলবান করা। আমরা ভালরূপেই এটা জানি যে, আমাদের জীবনে কামনার আকর্ষণ যতটা প্রবল আর কোন আকর্ষণই ততটা প্রবল নয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঐ আকর্ষণ নিরন্তর স্থায়ী। ক্রোধের আবেগ কখনও কখনও হয়, লোভের চেতনাও কখনও কখনও প্রকাশ পায়, কিন্তু কামের চেতনা নিরন্তর থাকে। যখন আমাদের চেতনা কাম-কেন্দ্রের দিকে অধিক পরিমাণে প্রবাহিত থাকে, তখন সহজেই জ্ঞান-কেন্দ্রের শক্তি ক্ষীণ হতে আরম্ভ করে। সাধনার দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। যে সাধক নিজের জ্ঞানের বিকাশ চায়, নিজের শক্তির অভিব্যক্তি চায়, নির্মলতা চায়, তাকে অবশ্যই চেতনার প্রবাহকে ওলটাতে হবে, ঘোরাতে হবে। অর্থাৎ তাকে ওপরের দিকে মনকে তুলে আনতে হবে।

ওপরে দেখ—ওপরের দিকে তাকাও। এর এই অর্থ করা যেতে পারে যে, মোক্ষের দিকে তাকাও। কিন্তু মোক্ষ অনেক দূরে। অত দূরে আমরা কেন যাব? কাছে যা আছে, তাই আমরা দেখব, কিন্তু মনের গতি ফেরাব মস্তিষ্কের দিকে। গতিকে এভাবে বদলে দেব। প্রাণধারার প্রবাহকে ঘুরিয়ে দেব, তার গতিকে বদলে দেব। তাকে ওপরের দিকে, জ্ঞান-কেন্দ্রের দিকে, চালিত করব। তখন জ্ঞান-কেন্দ্র প্রাণধারা থেকে সিঞ্চন পাবে। সিঞ্চন পেলেই জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হবে, আমাদের সাধনা সহজেই সফলতার দিকে অগ্রসর হবে। জ্ঞানকেন্দ্র তখনই পুষ্ট হয় যখন আমাদের উর্জা জ্ঞানকেন্দ্রে প্রবাহিত হয়। উর্জার এই যে উর্ধ্বগতি, তাকেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা যায়, বিশিষ্ট জ্ঞানের উপলব্ধি বলা যায় বা ঐ রকম অন্য কিছুও বলা যায়। জ্ঞানের সকল কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে। আবার শক্তির সমস্ত স্রোতও ঐ মস্তিষ্কে আছে।

শরীর শাস্ত্রের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কই সমস্ত শরীর-তন্ত্রের সঞ্চালন করে। পায়ে একটা ছোট কাঁটা ফুটল, ফলে

পায়ে ব্যথা হল, কাঁটা যে ফুটেছে তার অনুভব হল। আর অমনিই হাত এগিয়ে এল পায়ের সাহায্যে। কিন্তু কেন এমন হল? কাঁটা ফুটলেই আমাদের নাড়ি-মণ্ডল বা নাড়ি-সংস্থান সক্রিয় হয়ে ওঠে, আর মস্তিষ্ক পর্যন্ত এই সংবাদ পৌঁছে দেয় যে, পায়ে কাঁটা ফুটেছে। মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ আদেশ দেয়, কাঁটা বের করে দাও। এই আদেশ হাত পর্যন্ত আসে, আর তখন হাতের আঙুল এগিয়ে এসে পায়ের কাঁটা বের করে দেয়। এই সমস্ত সঞ্চালনই মস্তিষ্ক থেকে হচ্ছে। ওটাই সঞ্চালনের মুখ্য কেন্দ্র। মস্তিষ্কের ওপর ধ্যান যতই কেন্দ্রিত হবে, মস্তিষ্কের বিকাশ ততই ঘটতে থাকবে। আমরা তার খুব কম অংশের বিকাশই করতে পেরেছি। এর কারণও স্পষ্ট। আমাদের যতটা শক্তি আছে, আমাদের যতটা ক্ষয়োপশম ক্ষমতা আছে, তা আমরা কাজে লাগাতে পারি না। আমাদের ক্ষয়োপশম ক্ষমতার সামান্য অংশই কাজে লাগে, বাকিটা পড়েই থাকে।

বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় যে, মস্তিষ্কের যত ক্ষমতা আছে তার ব্যবহার আমরা করতে পারি না। ক্ষমতার শতকরা সামান্য অংশই আমরা ব্যবহার করতে সমর্থ হই। তার কারণ মস্তিষ্কের যে প্রকোষ্ঠ-গুলি খুললে অতিরিক্ত চেতনা আমাদের কাজে আসতে পারে, সেই প্রকোষ্ঠগুলি খোলার কোন প্রয়াসই আমরা করি না। আমাদের এই অসামর্থ্যের হেতু এই যে, আমাদের চেতনার সকল প্রবাহ নিচের দিকেই চলেছে। সেজন্য সাধনার এক মহৎ উদ্দেশ্য হল কাম-কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত মনের ধারাকে, কাম-কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত মনের উর্জাকে, মোড় ঘুরিয়ে ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। এটি একটি শ্রেষ্ঠ সাধনা।

আমাদের মনে নানা সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। আহারের সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, মৈথুনের সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। এদের উৎপত্তির কি কারণ? শাস্ত্রে প্রত্যেক সংজ্ঞার উৎপত্তির চার চারটি কারণ আছে বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণ হল—স্মৃতি। বার বার আহারের স্মৃতি, বার বার ভয়ের স্মৃতি, বার বার মৈথুনের স্মৃতি, বার বার

কামেব স্মৃতি মনে উদয হচ্ছে, আব সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব সংজ্ঞা উত্তেজিত হযে উঠছে, উদ্বেল হযে যাচ্ছে। বাব বাব স্মবণ কবা, বাব বাব চর্চা কবা, বাব বাব আপনাব প্রাণশক্তিকে সংজ্ঞাব দিকে প্রবাহিত কবে দেওযা—এই হল সংজ্ঞাব উদ্দীপনেব পথ। সংজ্ঞা উদ্দীপ্ত হওযাব কাবণ ঘটেছে, আমবা চেতমাকে তাব দিকে নিযে গিযেছি, তাই তাব উদ্বেল হযে ওঠাব সুযোগ মিলেছে। যদি চেত না তাব দিকে না যেত তবে তাব উদ্বেল হওয়াব কাবণ ঘটত না। এজন্য মহর্ষিগণ গভীব চিন্তা কবে বলেছেন, সাধক যেন 'বিকথা' না কবে। এ অতি গূঢ তাৎপর্যপূর্ণ কথা। সাধক চর্চা কবতে পাবে, কিন্তু তাব 'বিকথা' কবা উচিত হবে না। কাবণ তাব মন যদি বিকথায আসক্ত হয তবে তাবা সমস্ত প্রাণ-ধাবাই ঐদিকে প্রবাহিত হতে আবম্ভ কববে। তাহলে সাধনাব ক্রম স্তব্ধ হযে যাবে। সে জন্য উর্জাকে কোন দিকে বইযে দিতে হবে, সে বিষযে আমাদেব ধ্যানকে কেন্দ্রিত কবতে হবে।

সাধনাব দৃষ্টিতে জাগবণেব সূত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাগবণেব অর্থ হল—প্রবহমান উর্জাব প্রতি জাগৰুকতা। অর্থাৎ, উর্জাব প্রবাহ কোন্ দিকে চলেছে? যদি প্রবাহ নিচেব দিকে চলতে থাকে, তবে তাব মোড ঘুবিযে তাকে ওপবেব দিকে নিযে যাওযা।

সংজ্ঞা দশটি। তাদেব মধ্যে আটটি সংজ্ঞাব অর্থ স্পষ্ট। যথা—আহাব সংজ্ঞা, ভয সংজ্ঞা, মৈথুন সংজ্ঞা, পবিগ্রহ সংজ্ঞা, ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মাযা সংজ্ঞা আব লাভ সংজ্ঞা। এগুলি সহজেই বোঝা যায। বাকি দুইটি সংজ্ঞা লোক সংজ্ঞা আব ওধ সংজ্ঞা। এদেব সম্বন্ধে কিছু জানা দবকাব।

'লোক' শব্দেব অনেক অর্থ আছে। তাদেব মধ্যে এক অর্থ, শবীব। সুতবাং লোক সংজ্ঞাব অর্থ দাঁডাল, দেহাসক্তি। কেবল মানুষেব নয, প্রত্যেক প্রাণীবই দেহাসক্তি থাকে। শবীবেব প্রতি তাব নিবিড সম্বন্ধ থাকে। প্রত্যেক প্রাণীই শবীবকে বাঁচাতে প্রযত্ন কবে। কিন্তু সাধকেব কাছে শবীব বাঁচানোব প্রশ্নই মুখ্য নয। শবীবকে ঠিকমত বক্ষা কবা

আবশ্যক বটে। কিন্তু তা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাকে প্রথম স্থান দেওয়া যায় না, দ্বিতীয় স্থান হয়ত দেওয়া যায়।

লোক-সংজ্ঞার আর এক অর্থ, লৌকিক মান্যতার ধারণা দিয়ে মগজ ভরে দেওয়া। অনেক রকম মান্যতা মাথায় ঢুকিয়েছি। সে জন্য চেতনার বিকৃতি প্রবল হয়েছে। এখানে একটা ছোট কথা বলি। লোক-প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা ধরেই নিয়েছি যে, স্বভাবকে বদলান যায় না। এই ধারণাই আমাদের দৃঢ় হয়েছে। ফলে, আমাদের চেতনায় এক ছিদ্র হয়েছে, আর ছিদ্রপথে বিষ প্রবেশ করে চেতনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এখন আমরা কিছু করতেই আর সক্ষম নই, কারণ আমাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে, স্বভাব বদল করা সম্ভব নয়। সে জন্যই একটা গভীর অর্থপূর্ণ কথা মনে রাখতে হয়—কোন বিষয়ে ধারণা করার পূর্বে সেই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে হয়। কারণ যে ধারণা একবার হয়ে যায়, তা আর ছাড়তে চায় না, আমরা ঐ ধারণার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যাই। চেতনার সমস্ত প্রবাহ তখন বিপরীতমুখী হয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিষয় হল—সংকল্পের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা। আমরা কি সংকল্প করার ব্যাপারে স্বাধীন ? এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে যথেষ্ট চিন্তন ও মনন করা হয়েছে।

পশ্চিমে তিন প্রকার মতবাদ চলিত আছে, যথা—

১। নিয়তিবাদ।

২। আত্মবাদ।

৩। আত্ম-নিয়তিবাদ।

প্রথম বাদ—নিয়তিবাদ। নিয়তিবাদী মনে করে যে মানুষ যন্ত্রবৎ। যে রকম পরিস্থিতি হয়, যে রকম বাতাবরণ হয়, মানুষকে তদনুসারেই কাজ করতে হয়। সে সর্বদাই যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়। মানুষের নিজের কোন স্বাধীন সংকল্প নেই। এই হল নিয়তিবাদী ধারা।

দ্বিতীয় হল আত্মবাদী ধারা। ঐ মতবাদ অনুসারে সংকল্প করার

বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা আছে। মানুষ পরিস্থিতির দাস নয়, সে পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

তৃতীয় হল আত্ম-নিয়তিবাদী ধারা। আত্ম-নিয়তিবাদীর মত এই যে, নিয়তি সত্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের পরিস্থিতিতে নিয়তি কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা পূর্ণভাবেই স্বাধীন, সর্বদাই স্বাধীন।

আমরা কি সংকল্প করার ব্যাপারে পরাধীন? আমরা কি যন্ত্রের তুল্য? আমরা কি পরিস্থিতির দাস? অথবা, আমরা কি পূর্ণভাবে স্বাধীন? কোন পরিস্থিতিই কি আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না?

আমরা যদি যন্ত্রবৎ হই, আর সমস্ত ব্যাপারই যদি নিয়তির দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, স্বভাব বদল করা সম্ভব হবে না। যদি আমাদের স্বভাব নিয়ত হয়, তবে তাকে বদলানোর জন্য কোন সংকল্প বা পুরুষার্থের প্রয়োজন আমাদের থাকে না। আমাদের সকল প্রযত্নই ব্যর্থ হবে।

কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করি না। আমি মানি যে স্বভাবকে বদলানো যায়। সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনাকে নো-সংজ্ঞোপযুক্ত করে নেওয়া যায়। সকল সংজ্ঞারই পরিসমাপ্তি ঘটানো যায়। যখন এ সব কিছুই হতে পারে, তখন 'স্বভাবকে বদলানো যায় না'—এই কথাটি আপনা আপনি অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। স্বভাব বদলায়, স্বভাবকে বদলানো যায়।

আমি এটা মানি যে আত্মার কিছু অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব আছে। বাহ্য পরিস্থিতি বা বাতাবরণ কিছু প্রভাব বিস্তার করতে পারে বটে, কিন্তু আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি এতই প্রবল যে, যখন তা জাগ্রত হয় তখন বাহ্য প্রভাব শূন্য হয়ে যায়, নির্মূল হয়ে যায়—তার অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকে না।

আমরা বাহ্যের দ্বারা তখনই প্রভাবিত হই যখন আমাদের কষায় সংজ্ঞা প্রবল হয়। এক শ্রেণীর সংজ্ঞাকে কষায় সংজ্ঞা বলে। এই

এই শ্রেণীতে চাবটি সংজ্ঞা আছে—ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মাযা সংজ্ঞা, এবং লোভ সংজ্ঞা। এই চাব সংজ্ঞাব সাধাবণ নাম কষায সংজ্ঞা। যখন এদেব প্রাবল্য হয তখন আমাদেব ওপব বাহ্য পবিস্থিতিব প্রভাব এসে পড়ে, আব যখন এবা প্রবল থাকে না তখন বাহ্য-পবিস্থিতিব প্রভাব তীব্র হয না। ঐ প্রভাব তখন ক্ষীণ হযে যায। আগমে এই তথ্য এই ভাবে বোঝানো হযেছে। এক দেওয়ালে দুটি মাটিব গোলা ছুঁডে মাবা হল। একটি গোলা ছিল ভিজে মাটিব, আব একটি ছিল শুকনো মাটিব। যেটি ভিজে ছিল সেটি দেওযালে আটকে গেল, আব যেটি শুকনো ছিল সেটি নিচে মাটিতে পডে গেল। ভিজে আটকে গেল, আব শুকনো নিচে ঝবে পডল। যদি দেওযাল ভিজে হয তবে অবশ্যই তাতে ধুলো লেগে যাবে। যদি তা শুকনো হয তবে ধুলো নিচে ঝবে পডবে, তাতে লেগে থাকবে না। কষায চেতনা যেন ভিজে। ঐ চেতনা যখন প্রবল হয তখন বাহ্য পবিস্থিতি প্রবলরূপে প্রভাব বিস্তাব কবে, আব যখন তা প্রবল থাকে না তখন বাহ্য বাতাববণও প্রভাব দেখাতে পাবে না। আকাশ সর্বদা আকাশই থাকে। তাকে কিছুই প্রভাবিত কবতে পাবে না। বৃষ্টি হোক, শিলাপাত হোক, আঁধি আসুক, তুফান চলুক, বিদ্যুৎ চমক দিক, আবও যা কিছু হোক—আকাশ যেমন ছিল তেমনই থাকে। আকাশ বৃষ্টিতে ভেজে না, শিলাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয না, আঁধাবে ধোঁযাটে হয না, বিদ্যুতে জ্বলে ওঠে না। বৌদ্রেব তেজ যতই হোক না কেন, আকাশ কখনও গবম হয না। যত ববফই পড়ুন না কেন, আকাশ কখনও ঠাণ্ডা হয না।

চেতনা যদি বিশুদ্ধ হয তবে বাইবে যা কিছু ঘটুক না কেন, ব্যক্তিব ওপব কোন প্রভাব পডে না। চেতনাতে সংজ্ঞাব লোপ পডেছে, তাই তাতে বাইবেব ব্যাপাবেব ছাপ পড়ে—বাইবেব ব্যাপাব তাতে আটকে যায। তখন উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

এই তথ্য আমাদেব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, মান্যতাব ওপব নির্ভব কবে আমবা যেন নিজেদেব ধাবণাগুলি গড়ে না তুলি। এই লোক

সংজ্ঞাকেও আমাদের ছাড়তে হবে।

সংজ্ঞাকে যদি একটিমাত্র শব্দের দ্বারা বুঝতে চাই, তবে সেই শব্দ হবে—মূর্চ্ছা। যেমন আমাদের ভয়ের মূর্চ্ছা, কামের মূর্চ্ছা, কষায়ের মূর্চ্ছা, পরিগ্রহের মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে হয়, তেমনই আমাদের লোক মূর্চ্ছা, লৌকিক ধারণার মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে হবে। এই মূর্চ্ছা প্রবল হয়। যত দিন এই মূর্চ্ছা দূর না হবে, ততদিন অন্য সমস্ত মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। আমরা নিজের মান্যতার জালে জড়িয়ে পড়েছি। যার চিন্তাশক্তি কম সে অতি শীঘ্রই এই জালে জড়িয়ে পড়ে। এই বিপদের ঘাঁটি পার হতে হবে, লোক সংজ্ঞার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

আর এক সংজ্ঞা আছে—ওঘ সংজ্ঞা, অর্থাৎ সামূহিক চেতনা বা প্রবাহপাতী চেতনা। লোকে বলছে—'ভয়ের কারণ কি ? সবার যা ঘটছে আমাদের অবশ্যই তাই ঘটবে।' এই হল প্রবাহবাহী চেতনা। এক প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিলাম, আর সেই সুযোগে নিজের মন্দ আচরণকে প্রবাহবাহী চেতনার দ্বারা সংরক্ষণ করলাম। 'যা সবার ভাগ্যে ঘটে তাই আমার ভাগ্যে ঘটবে, ভাবনার কোন কারণ নেই'—এই রকম চিন্তা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক চেতনা। আমরা যখন এই চেতনার জালে আবদ্ধ হই তখন বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন হয়।

এই মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গতে না পারলে আমরা সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই পারব না। এটা খুবই আবশ্যক যে এই মূর্চ্ছা ত্যাগ করে আমরা নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করি, অর্থাৎ শুদ্ধ চেতনা নির্মাণ করি।

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন—'আমাকে একটা শিশু দাও, আর বল, তুমি তাকে কি বানাতে চাও। তুমি চাও তো আমি তাকে ডাকাত বানিয়ে দেব, তুমি চাও তো আমি তাকে মহাত্মা বানিয়ে দেব। যেমন চাও, তেমন বানাব। কারণ আমি পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, আর এই পরিস্থিতির ওপরই ব্যক্তির চরিত্র গঠন নির্ভর করে, ব্যক্তি ভাল বা মন্দ হয়ে গড়ে উঠে।'

এ রকম ঘোষণা লোকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে

শুধু আশ্চর্যজনক নয, এ ঘোষণা সুখদাযকও বটে। যদি কোন ব্যক্তিব হাতে এমন ক্ষমতা এসে যায় যে, সে পবিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কবে লোককে যেমন ইচ্ছা তেমনই বানাতে পাবে, তবে সংসাবে পবমাত্মা কল্পনা কবাব স্থলই আব থাকে না। পবমাত্মাকে মানাব কোন আবশ্যকতাই থাকে না, কাবণ ঐ বৈজ্ঞানিক তো স্বযং পবমাত্মা বনে গিযেছেন।

বৈজ্ঞানিক তো ঘোষণা কবলেন। লোকেও তা শুনল। কিন্তু কিছুই হল না। মানুষ বানানো সম্ভব হল না। কেবল বাহ্য পবিস্থিতিব সাহায্যে মানুষ গডাব কথা যখন ওঠে তখন আমবা এই সত্য ভুলে যাই যে, যদি কোন মানুষেব স্বকীয কোন বৈশিষ্ট্যই না থাকে তবে সে মানুষ মানুষই নয। সে চেতনাবান প্রাণীই নয। সে যন্ত্র মাত্র।

এও আমাদেব বুঝতে হবে যে, যদি কোন সাধক ঘোষণা কবেন তাঁব কাছে কোন শিশুকে বাখলে তিনি যেমন চাওযা যাবে তেমন কবেই তাঁকে মানুষ কবে দেবেন, তবে তিনি অসম্ভব কথা বলছেন। এ খুবই কঠিন ব্যাপাব, কাবণ পবিস্থিতিব দ্বাবা যেমন ব্যক্তিকে গডা যায না, তেমনই কেবল সাধনাব দ্বাবাও সে কাজ কবা সম্ভব হয না। আমাদেব দেখতে হবে কোন ব্যক্তিব কতটা আন্তবিক ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ কাব কতটা ক্ষযোপশম ক্ষমতা আছে। এই এক কথা। দ্বিতীয কথা এই যে, আমাদেব দেখতে হবে কোন ব্যক্তি সাধনাব কতখানি অবসব লাভ কবছে, কি প্রকাব বাতাববণ আব পবিস্থিতিব মধ্যে কালাতিপাত কবছে। একদিকে আন্তবিক ক্ষমতা, অন্যদিকে বাতাবরণ ও পবিস্থিতি— এই উভযেব উপযুক্ত সংযোগ হলেই চেতনা নির্মলীকবণেব কাজ অগ্রসব হতে পাবে। এই দুটিব কোন একটিব ক্রটি থাকলে, প্রযত্ন কবা সত্ত্বেও সফলতা হবে না। যদি এই তথ্য মনে বেখে চলি তবে সাধনাব প্রতি, সাধনাব উদ্দেশ্যেব প্রতি, আমাদেব দৃষ্টি কখনও আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হবে না এবং আমবাও ধীবে ধীবে অগ্রসব হতে পাবব।

ধ্যেয যদি স্পষ্ট না হয, শক্তি যদি অল্প হয, অথচ মনে যদি অনেক কিছু কবাব চিন্তা থাকে, তা হলে সম্ভবত মাঝপথেই বিভ্রান্ত হযে

ঘুরে বেড়াতে হবে।

একটা সুন্দর কাহিনী আছে। এক শেঠের দুই ছেলে ছিল। শেঠ ভাবল, কাকে আমার উত্তরাধিকারী করি। সে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করল। তার প্রচুর বিত্ত ছিল। সে দুই ছেলেকেই পাঁচ লাখ করে টাকা দিয়ে বলল, 'যাও, আমি তোমাকে টাকা দিলাম। রাজ্যের প্রত্যেক শহরে একটা করে পাকা বাড়ি বানাও, আর তিন মাসের মধ্যেই আমাকে খবর দিও। ছেলেরা চলে গেল। ঐ রাজ্যে অনেক শহর ছিল। সময় পূর্ণ হল। তিন মাস কেটে গেল।

এক ছেলে ফিরে এল। তাকে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'পাকা বাড়ি বানিয়েছ?' ছেলে বলল—'কয়েকটি শহরে বানিয়েছি। কি করে সব শহরে বানাব? আপনি যে টাকা দিয়েছিলেন তা তো তিন-চারটি পাকা বাড়ি করতেই ব্যয় হয়ে গিয়েছে।'

অপর ছেলেটিও ফিরে এল। তাকে খুব প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'কতগুলি পাকা বাড়ি বানিয়েছ?' সে বলল—'বাবা, সব শহরেই পাকা বাড়ি করেছি।' তাই শুনে শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'কত ব্যয় হল?' ছেলে বলল—'ব্যয় কিছুই হয় নি। পাঁচ লাখ টাকা ধরাই আছে।' শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'তা হলে কি করে করলে?' তখন ছেলে উত্তর করল—'সব শহরেই আমি মিত্র করেছি। এমন গভীর মিত্রতা করেছি যে, মিত্রদের সব বাড়িই আমার নিজের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। যখন ইচ্ছা তখনই সেই সব বাড়িতে যেতে পারি।'

এই কাহিনী থেকে আমরা এই বুঝি যে, শক্তির ব্যবহার আমরা করতে পারি, কিন্তু তার আগে আমাদের শক্তি কতখানি তা ওজন করে বুঝতে হবে, এবং কি ভাবে ঐ শক্তির ব্যবহার হবে তাও ভাবতে হবে। যদি নিজের শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক বোধ থাকে তবে প্রত্যেক স্থানেই পাকা বাড়ি করা সম্ভব হতে পারে। আর শক্তির যদি ঠিক আন্দাজ করতে না পারি, নির্ণয় করতে না পারি, তবে সামান্য কয়টি পাকা বাড়ি বানাতেই আমাদের ধন ফুরিয়ে যাবে।

১৫

শরীর ও তার বিশিষ্ট কেন্দ্র

আমাদেব উপব, মধ্য ও নিচ—এই তিন মুখ্য ভাগ আছে। এই তিন ভাগেই শক্তিব স্রোত প্রচ্ছন্ন আছে। শবীবশাস্ত্রজ্ঞগণ শবীবকে এক বিশেষ কোণ থেকে দেখেছেন। সেই কোণ সর্ববিদিত। কিন্তু যোগাচার্যগণ শবীবকে আব এক কোণ বেকে দেখেছেন। তাঁবা বলেছেন—শবীবে কতগুলি মুখ্য কেন্দ্র, চৈতন্য-কেন্দ্র, জ্ঞান-কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত কবতে পাবলে, সক্রিয কবতে পাবলে, শক্তিব স্রোত প্রবাহিত হয, আব শক্তিব বিশেষ অনুভব হতে আবম্ভ কবে। ভগবান মহাবীব আচাবাংগ সূত্রে বলেছেন—'আযতচক্খু লোকবিপস্সী', 'লোগস্স অহে ভাগং জাণই, উড্‌ঢং ভাগং জাণই, তিবিযং ভাগং জাণই' —যে আযতচক্ষু হয, সংযতচক্ষু হয, যে লোকদর্শী হয, যার উন্মীলিত-চক্ষু এক বিন্দুতে স্থিব থাকে, সেই লোকদর্শী ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক, অধোলোক—তিন লোকই দেখতে পায।

আমাদেব শবীবই লোক। বস্তুকে পুরুষেব মাধ্যমে বা লোকেব মাধ্যমে বোঝানো প্রাচীন পদ্ধতি। জৈন পবম্পবায লোককে বোঝানোব জন্য লোক-পুরুষেব কল্পনা কবা হযেছে। পুরুষেব সাথে লোকেব তুলনা কবা হযেছে। পুরুষেব শবীবেব তিন ভাগ আছে—ঊর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ

ও অধোভাগ। সেই বকম লোকেবও তিন ভাগ হয—উর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ ও অধোভাগ। এখানে লোকেব অর্থ—শবীব, পুরুষ-শবীব। পুরুষ-শবীবেব তিন ভাগেব ওপবই ধ্যান কবা যায। ভগবান মহাবীব শবীবেব তিন ভাগেব ওপবই ধ্যান কবতেন। প্রথম ভাগ হল—কপাল, মস্তিষ্কেব ওপব অংশ, মুখ্য মস্তিষ্ক—এই ভাগই হল ধ্যানেব মুখ্য কেন্দ্র, শক্তিব মুখ্য কেন্দ্র। দ্বিতীয ভাগ হল ভ্রূকুটি বা আজ্ঞাচক্র। তৃতীয ভাগ বিশুদ্ধি চক্র, যা কণ্ঠমণিব স্থান। এ ছাড়া চতুর্থ ভাগ আছে—মনঃচক্র। আমাদেব গলাব সোজা নিচে নাভিব বাব আঙ্গুল ওপবে যে স্থান আছে, তাই হল মনঃচক্র। জৈন পবম্পবায এই প্রসঙ্গে 'রুচক প্রদেশেব' কথা বলা হযেছে। এই প্রদেশ এমন যে এব ওপব কোন আববণ নেই, তা নিবাববণ। এ যদি অনাবৃত না থাকে তবে চৈতন্যেব হেবফেব হযে যায। জীব আব জীব থাকতে সমর্থ হয না। যোগেব আচার্যগণ মনঃচক্রেব আটটি দল স্বীকাব কবেছেন। এই দিক থেকে রুচক প্রদেশেব সঙ্গে এব তুলনা কবা হযেছে। এই হল মনঃচক্র। এব থেকে অল্প দূবে হৃদযেব যে স্থান তাও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থান আমাদেব উর্ধ্ব শবীবেব চৈতন্যেব এক বিশেষ কেন্দ্র।

মধ্য শবীবেব মুখ্য কেন্দ্র—নাভি। নাভি শক্তিশালী কেন্দ্র। নাভি আব তাব দু দিকেব ভাগই খুবই শক্তিশালী।

আমাদেব শবীবেব অধোভাগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আছে। মেরুদণ্ডেব নিচে যে বাঁক ('কার্ভ') আছে, মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হয, সেখানে যে মাংসপিণ্ড আছে, তাকে কুণ্ডলিনীব স্থান বলা হয। সেখানেই প্রাণধাবা উৎপন্ন হয, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয। এই স্থান জেনাবেটবেব কাজ কবে, এখান থেকেই সমস্ত শবীবে বিদ্যুৎ সবববাহ হয। এই স্থান মেরুদণ্ডেব অন্তিম প্রান্ত। তাব পবে আসে জননেন্দ্রিযেব স্থান, আব তাবও পবে পাযেব আঙ্গুল। অধো শবীবেব—অধোলোকেব—এগুলিই মুখ্য স্থান।

শবীবে এই সবই চেতনাব মুখ্য কেন্দ্র। আমাদেব কোন্ কেন্দ্রকে

জাগ্রত করতে হবে, সক্রিয় করতে হবে. তা নির্ভর করবে আমাদের লক্ষ্যের ওপর। প্রশ্ন হবে, কেন্দ্রকে জাগ্রত করার পদ্ধতি কি? এক সরল পদ্ধতি হল, আপনি যে কেন্দ্রকে জাগ্রত করতে চান, সক্রিয় করতে চান, তার ওপর মনকে একাগ্র করুন। মন যতই একাগ্র হবে ততই ঐ কেন্দ্র জাগ্রত হবে, সক্রিয় হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তি বার বার বাসনার কথা চিন্তা করে, তার বাসনা-কেন্দ্র. জননেন্দ্রিয়ের স্থান সক্রিয় হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করতে চায়, সে যদি তার সমগ্র মন মস্তিষ্কের মধ্যভাগে একাগ্র করে তবে তার জ্ঞান-কেন্দ্র সক্রিয় হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ করতে চায়, পবিত্র হতে চায়, সে বিশুদ্ধি-চক্রের ওপর মনকে বারে বারে একাগ্র করুক। এর ফলে বাসনার সংস্কার ক্ষীণ হবে, আর পবিত্রতা আসতে থাকবে। যে প্রাতিভ জ্ঞান চায়, কি ঘটতে যাচ্ছে তা আগেই জেনে নিতে চায়, সে আপন মন আজ্ঞাচক্রের ওপর কেন্দ্রিত করুক। ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের এরকম ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন থাকতে পারে। এটা সত্য যে, যার প্রতি আমরা বেশি মনোযোগ দেব, তা আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে যাবে। আমরা লৌকিক ব্যবহারেও সর্বদা অনুভব করেছি যে, যে ব্যক্তিকে আমরা বেশি পছন্দ করি, যার সম্বন্ধে আমরা ভাল ভাব পোষণ করি, যাকে আমরা বেশি ভালবাসি ও স্নেহ করি, যার সঙ্গে সর্বদা সম্বন্ধ রাখতে চেষ্টা করি, সেই ব্যক্তি সহজেই আমাদের হয়ে যায় ও আমাদের প্রত্যেক ইচ্ছা পালন করতে যত্নবান হয়। সেই ভাবে যে জ্ঞানতন্তুকে আমরা প্রশিক্ষিত করি তা নিশ্চিতরূপে আমাদের আদেশ পালন করবে। সেই জ্ঞানতন্তু আমাদের আদেশ পালন করবে না, যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, যাকে আমরা প্রশিক্ষিত করি নি বা যার সঙ্গে আমাদের মন সংযুক্ত হয় নি। প্রাকৃতিক চিকিৎসা বা মানসিক চিকিৎসার একটা মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে, যদি তোমার অন্ত্র ঠিকমত কাজ না করে তবে বার বার অন্ত্রের ওপর মন কেন্দ্রিত কর ও তাকে আদেশ দাও তা যেন ঠিকমত কাজ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই

অন্ত্রেব মধ্যে যে জ্ঞানতন্তু আছে তা তোমাব আদেশ মেনে নেবে ও ঠিক কাজ কবতে আবম্ভ কববে। যখন আমবা জ্ঞানতন্তুগুলিকে উপেক্ষা কবি তখন তাবাও উদাসীন থাকে ও কোন সহযোগিতা কবে না। যখন আমবা তাদেব ওপব সাপেক্ষ হই, তাদেব অপেক্ষা বাখি, তখন তাবাও সক্রিয হযে ওঠে এবং আমাদেব অপেক্ষিত কাজ কবতে তৎপব হয। এ সবই আমাদেব উপেক্ষা আব অপেক্ষাব ওপব নির্ভব কবে। জ্ঞানতন্তুব শক্তিব বা সহযোগিতাব কোন ন্যূনতা হয না। যে ব্যক্তি প্রাণশক্তি বা তৈজসকে প্রবল কবতে চায সে ব্যক্তিকে মেরুদণ্ডেব নিচে অবস্থিত মাংসপিণ্ডেব ওপব ধ্যান কেন্দ্রিত কবতে হবে। প্রাণধাবার প্রবলতা সাধনেব পক্ষে ঐ স্থান খুবই উপযুক্ত।

এখন আমি নিচেব দিকে যাব। পাযেব বুড়ো আঙ্গুলেবও যথেষ্ট মূল্য আছে। সেখানে প্রাণেব সীমা। যে প্রাণেব প্রবাহ নাসাগ্র থেকে চলতে আবম্ভ কবে তা পাযেব বুড়ো আঙ্গুলে এসে সমাপ্ত হয। যে ব্যক্তিব মনে আপনাব শক্তি ও বীর্যকে সুবক্ষিত কবাব চিন্তা আছে, সে যেন পাযেব বুড়ো আঙ্গুলে ধ্যান কেন্দ্রিত কবে। যোগে এক প্রক্রিযা নির্দিষ্ট আছে। যে ব্যক্তি বীর্যদোষগ্রস্ত, তাব সম্বন্ধে বলা হযেছে, সে যেন সবলভাবে শযন কবে এবং শাযিত অবস্থায শবীবকে একটু ওপবেব দিকে তুলে পাযেব বুড়ো আঙ্গুলেব ওপব মনকে একাগ্র কবে, ধ্যানকে কেন্দ্রিত কবে। এই মুদ্রায দুই-এক মিনিট থাকতে হয। দিন কযেক এই মুদ্রা অভ্যাস কবলেই বোগমুক্ত হবে।

এই কটি মুখ্য কেন্দ্র, যেখানে মনকে নিযোজিত কবলে আমবা লাভবান হতে পাবি। আধুনিক শবীবশাস্ত্রে কতকগুলি নতুন গ্রন্থিব, নতুন গ্ল্যানডেব, উল্লেখ কবা হযেছে। সেগুলিও আমাদেব বুঝতে হবে, সেগুলি থেকেও যথাসম্ভব লাভ আদায কবতে হবে।

আমাদেব শবীবেব চক্র আছে, সাত-আটটি গ্রন্থি আছে, কমল আছে। যোগেব ভাষায আমবা শুনি, আমাদেব শবীবে ছযটি চক্র আছে, সাত-আটটি গ্রন্থি আছে, আব হৃদয-কমল, নাভি-কমল প্রভৃতি

কমল আছে। শরীর শাস্ত্রের দৃষ্টিতেও কতকগুলি গ্রন্থি প্রতিপাদিত হয়েছে, কতকগুলি কমলও নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে, এ সব শব্দ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তাই এগুলি আমাদের বুঝতে হবে। এই যে সব কেন্দ্র নির্দিষ্ট আছে—মুখ্য কেন্দ্র আছে, সেখানে প্রাণতন্ত্র অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে, এঁকে-বেঁকে গিয়েছে। প্রাণের ধারা সেখানে সোজা চলতে পারে না, তাকে ঘুরে যেতে হয়, চেষ্টা করে যেতে হয়। সেজন্যই ঐগুলিকে 'গ্রন্থি' বলা হয়েছে। জট-পাকানো পথ বলে ওদের গ্রন্থি বলা হয়েছে, চক্র বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই বোঝানো যে, সেখানে গতি চক্রাকার ও ঘূর্ণমান, সহজ বা সরল নয়। সেজন্য 'চক্র' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কমল' শব্দটি প্রতীকাত্মক। কমল এমন বিচিত্র বস্তু যা বিকশিত হয়, আবার শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যার সঙ্কোচ ও বিস্তার আছে, যাতে সঙ্কোচ ও বিকাশের শক্তি আছে, তাকেই কমল বলা যায়। এখানে রূপক অর্থে 'কমল' শব্দের প্রয়োগ। এর অভিপ্রায় এই যে, যদি আপনারা ঐ সব ধ্যান কেন্দ্রের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত করে ঐগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন, তবে ঐগুলি সহজ ও সরল হয়ে যাবে, এবং আপনাদের প্রাণধারা সোজা পথে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। আর যদি আপনারা ঐ কেন্দ্রগুলিকে উপেক্ষা করেন, তাদের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত না করেন, তবে তারা সরল হবে না, সঙ্কুচিতই থাকবে এবং তার ফলে আপনাদের প্রাণধারা সোজা রাস্তা না পেয়ে এঁকে-বেঁকে চলার চেষ্টা করতে বাধ্য হবে।

এখন এই তিনটি কথাই স্পষ্ট হল যে, আমাদের শরীরে গ্রন্থি আছে, চক্র আছে, কমল আছে। কমলের মত কিছু দেখতে না পেয়ে আধুনিক কালের ডাক্তার বলেন—'আমরা গোটা শরীরটাই কেটে-কুটে দেখেছি, শরীরের প্রতিটা অণুই বিশ্লেষণ করেছি, কিন্তু কোথায়, কমলের তো দেখা পাই নি। কোথায় আজ্ঞা চক্র, কোথায় বিশুদ্ধ চক্র ইত্যাদি—কই, এসব কিছুই তো দেখা যায় নি।' স্বীকার করতেই হবে, ডাক্তার ঐ রকম কিছু দেখতে পান নি। তবে, আজ্ঞা চক্র থাক বা না থাক,

বিশুদ্ধি চক্র থাক বা না থাক, এখন যে 'পিনিযাল' আব ঐ বকম অনেক গ্রন্থি—অনেক 'গ্ল্যান্ড'—সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে, তুলনাত্মক দৃষ্টিতে সেগুলিকে দেখলে যোগশাস্ত্রেব প্রতিপাদন ও শবীবশাস্ত্রেব প্রতিপাদনেব মধ্যে যে বিশেষ ভেদ আছে এমন বোধ হবে না।

প্রশ্ন হতে পাবে, আমবা মনকে কোথায লাগাব ? ধ্যানকে কোথায কেন্দ্রিত কবব ? এব উত্তব আপনাদেব ওপবই নির্ভব কবে। আপনাদেব লক্ষ্য কি ? আপনাবা কি চান ? আপনাদেব প্রাপ্তিব বিষয কি ? যদি ধ্যানেব নির্মলতা সাধন আপনাদেব লক্ষ্য হয, তবে আপনাদেব ধ্যান-কেন্দ্রেব ওপব ধ্যান কবতে হবে। আচার্যগণ কিছু কিছু ব্যবস্থা দিযেছেন। আমবা 'ণমো অবহং তাণং'—এব ধ্যান কোথায কবব ? অর্হতেব ধ্যান কোথায কবা উচিত ? তাঁবা বলেছেন, শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান-কেন্দ্র, সেটাই অর্হৎ ধ্যানেব স্থান।

কেন্দ্রগুলি স্থূলভাবে তুটি ভাগে বিভক্ত—জ্ঞান-কেন্দ্র আব বাসনা-কেন্দ্র। যখন আমাদেব প্রাণধাবা তথা মনেব গতি নিচেব দিকে যায, তখন বাসনা-কেন্দ্র সক্রিয হয, তীব্র হয ও জাগ্রত হয। জ্ঞান-কেন্দ্র তুর্বল হযে যায। আবাব যখন আমাদেব প্রাণধাবাব—তথা মনেব—গতি ওপবেব দিকে ওঠে, তখন আমাদেব জ্ঞান-কেন্দ্র সক্রিয হয, তীব্র হয-ও জাগ্রত হয। বাসনা-কেন্দ্র ক্ষীণ হযে যায। অর্হতেব স্থান হল—মস্তিষ্ক। যদি আমবা মস্তিষ্কে অর্হতেব ধ্যান কবি, তবে আমবা জেনে বা না জেনে জ্ঞান-কেন্দ্রেব জাগবণ কবতে থাকি। জ্ঞান-কেন্দ্র জাগ্রত হযে যাবেই। এই হল জ্ঞান-কেন্দ্রকে সক্রিয কবাব উপায। আচার্যবা বলেছেন—অর্হতেব ধ্যানেব সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত বর্ণেব ধ্যানও কব। মস্তিষ্কেব যে অগ্রভাগ, সেখানে এক বকম পদার্থ আছে। তাব বঙ মেটে—খানিকটা হলদে, খানিকটা সাদা। সেখানে শ্বেতবর্ণেব (ধূসবেব) ধ্যান লাভপ্রদ। তাতে সেখানকাব পবমাণুগুলি সহজ শক্তি প্রাপ্ত হয। মস্তিষ্ক আপনা-আপনি শক্তিশালী হযে যায। আমাদেব জ্ঞান-কেন্দ্রেব তন্তুগুলি সক্রিয হযে জেগে ওঠে।

'ণমো সিদ্ধাণং'-এব ধ্যানেব স্থান ললাট—আজ্ঞাচক্র। এব বর্ণ—রক্ত। আজ্ঞাচক্র আমাদেব সমস্ত সক্রিযতাকে উৎপন্ন কবে। শবীবেব ওপব নিযন্ত্রণ বাখা—জ্ঞানাত্মক নিযন্ত্রণ বাখা—এই চক্রেব প্রধান কাজ। লাল বর্ণ প্রচুব উত্তেজনা, সক্রিযতা ও গতি উৎপাদন কবে। যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধবে লাল বঙেব ধ্যান কবে তাব বিপদও হতে পাবে। লাল বর্ণ থেকে অতিবিক্ত উষ্মা উৎপন্ন হয। তাতে বিপদেব সৃষ্টি হতে পাবে। ব্রক্তেব সমস্ত সক্রিযতাই লাল বঙেব কাবণে।

এখন প্রশ্ন, 'ণমো আযবিযাণং'—এব ধ্যান কোথায কবব? আচার্য আচাবেব প্রতীক। আচাবেব অর্থ—পবিত্রতা। পবিত্রতাব স্থান হল, গলাব পাশ। সেখানে যদি আমবা ধ্যান কেন্দ্রিত কবি তো আমাদেব আচাবেব ভাবনা সহজেই আসবে, আমাদেব পবিত্রতা জাগ্রত হবে। সেখানে আমাদেব হলদে বঙেব ধ্যান কবতে হবে। পীত বর্ণ ভাবনাকে বেগবতী কবে। 'অ্যানাটমি' শাস্ত্র অনুসাবে, শবীবেব আভ্যন্তবীণ স্রাব সর্দি, গর্মি প্রভৃতি নিযন্ত্রণ কবে। যাব শবীবেব স্রাব কম হয, সে ব্যক্তি অসমযেই বুড়ো হযে যায, ক্ষীণ হযে যায। তাব শবীবেব উপচয বন্ধ হযে যায। যাব শবীবে স্রাব যথোচিত হয, তাব শবীবেব সুসমঞ্জস বিকাশ হয। এই স্রাবই আমাদেব শবীবেব ওপব নিযন্ত্রণ কবে, আমাদেব গ্রন্থিগুলিব নিযামক তত্ত্বই এই স্রাব। পীত বর্ণেব সঙ্গে, 'ণমো আযবিযাণং'—এব ধ্যান এই নির্দিষ্ট স্থানে কবতে হয। পীত বর্ণ সদ্-ভাব ও আচাবেব পুষ্টিসাধক হয। যে ব্যক্তি পীত বর্ণেব ধ্যান কবে সে -ব্যক্তি যেমন জ্ঞানেব বিকাশ সাধন কবে, তেমনই পবিত্র ভাবনাব বিকাশেবও পোষকতা কবে। আপনাবা দেখবেন যে, পবিত্র ভাবনাব প্রতীক রূপে যেখানে বঙেব নির্বাচন কবা হযেছে সেখানেই পীত বঙকে গুরুত্ব দেওযা হযেছে—পীত বর্ণকে মুখ্য স্থান দেওযা হযেছে।

'ণমো উপজ্‌ঝাযাণং'—এই উপাধ্যাযেব ধ্যান কবাব স্থান—মনঃ-চক্র। কেউ কেউ মনে কবেন, এই ধ্যানেব স্থান—হৃদয। এ নিযে অনেক মীমাংসা হযেছে। মোট কথা, এটা হৃদয-স্থানেব ব্যাপাব নয,

এব স্থান মনঃচক্র। মনঃচক্রেব ওপব উপাধ্যাযেব ধ্যান কবতে হয। প্রাচীনকালে একে হৃদয-চক্র বলে মানা হতো। উপাধ্যাযেব ধ্যান নীল বর্ণেব সঙ্গে কবতে হয। নীল বর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদেব মনে উত্তেজনা হযেছে, জটিলতা হযেছে। আপনাবা ঐ উত্তেজনা ও জটিলতাকে প্রশমন কবতে নিজেদেব অসমর্থ বোধ কবেছেন। ঐ অবস্থায আপনাবা বিশ মিনিট ধবে নীল আকাশেব দিকে তাকিযে থাকুন। অবশ্য ঐ সমযেব আকাশ যেন স্বচ্ছ ও নিবাববণ থাকে। আকাশ দেখতে থাকলে অল্প সমযেব মধ্যেই আপনাব মনেব উত্তেজনা কমে যাবে, চিন্তা মিটে যাবে, জটিলতা হ্রাস পাবে। নীল বর্ণেব প্রধান কাজ—মনকে শান্ত কবা, উত্তেজনাকে কমিযে দেওযা। বোগী যখন খুবই উত্তেজিত হয, যখন তাব ঘুম কিছুতেই আসে না, তখন তাকে নীল বঙেব জল পান কবানো হয। এতেই তার উত্তেজনা কমে—ঘুম আসতে থাকে। বোগীব ছটফটানি ও কষ্টেব উপশম হয।

'ণমো লোএ সব্ব, সাহূণং'। মুনিব স্থান—চবণ। পাযেব অঙ্গুষ্ঠেব স্থানেব খুব মহত্ত্ব আছে। সেখানকাব বর্ণ—কৃষ্ণ, অর্থাৎ কালো। কালো বর্ণেব নিজস্ব এক অর্থ আছে। এব থেকে অবশোষণেব ক্ষমতা হয, যাব ফলে বাইবেব কোন প্রভাব ভেতবে যেতে পাবে না।

এই হল পাঁচটি স্থান ও পাঁচটি বর্ণ। যে আচার্যবা এই স্থান ও বর্ণগুলিব ব্যাখ্যা কবেছেন, তাঁবা শবীবেব গঠনপ্রণালীব সঙ্গে সম্পূর্ণ পবিচিত ছিলেন। তাঁব জানতেন, কোন্ স্থানে কোন্ বর্ণেব ওপবে ধ্যান কবলে কোন শক্তি জাগ্রত হয। স্থান ও বর্ণেব পবিকল্পনা এই ভিত্তিতে কবা হযেছিল যে সেখানে কেন্দ্র সক্রিয হতে পাবে ও তাব শক্তিব বিকাশ হতে পাবে। আপনাবা স্মবণ বাখবেন এ সবই মত-বাদেব কথা, বিজ্ঞানেব কথাও বটে। শবীবেব কেন্দ্রগুলি কিভাবে জাগ্রত কবা যায, সে বিষযে জৈন আচার্যবা নিজেদেব ভঙ্গিতে এই সব পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক চিন্তা কবেছেন।

জৈন পবম্পবায 'এগ পোগ্গল নিবিট্‌ঠদিট্‌ঠি' আব 'নাসাগ্গ

নিবিট্‌ঠদিটি্‌ঠ'—এক পুদ্‌গলেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব বা নাসাগ্রেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব কথা এসে যায। প্রশ্ন হতে পাবে, নাসাগ্রেব ওপবই দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবতে হবে কেন? যে কোন স্থানেই তো দৃষ্টিকে স্থিব কবা যায। আসলে, তাৎপর্যটা কি? দৃষ্টিকে কেন ভ্রূকুটিব ওপব স্থিব কবব? অন্যত্রও তো স্থিব কবতে পাবি। উত্তবে বলতে হবে, এ সবেব পেছনেই গভীব অর্থ আছে, বহস্য আছে। অমুক স্থানেব ওপব কেন্দ্রিত হলে, অমুক অমুক তন্তু সক্রিয হয, জাগ্রত হয। শবীবেব দিক থেকে দেখলেও, এইসব স্থানেব মহত্ত্ব আছে। আধ্যাত্মিক বা যৌগিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই সব স্থানেব মহত্ত্ব আবও ভাল কবে বোঝা যায। শবীবশাস্ত্রেব দৃষ্টি দৈহিক স্বাস্থ্যতেই সীমিত। জ্ঞানেব বিকাশ কবা, পবিত্রতাব বিকাশ কবা—এগুলি যোগেব দৃষ্টিকোণ থেকে কবণীয কাজ। শবীবেব অমুক অমুক স্থানকে জাগ্রত কবলে জ্ঞান বাড়ে, পবিত্রতা আসে—এই দৃষ্টি যোগ-শাস্ত্রীয, শবীবশাস্ত্রীয নয। শবীব অস্থি, মাংস, মজ্জা দিযে গঠিত—কেবল এই দৃষ্টিতেই আমবা শবীবকে দেখব না। দেখাব আব একটা কোণও আছে। মজ্জা একটি ধাতু, কিন্তু তাব কাজ কি? শবীবশাস্ত্রজ্ঞ এই প্রশ্নেব উত্তব দেবেন। জ্ঞানেব কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক জ্ঞান ও ক্রিযা—দুটিকেই নিযন্ত্রণ কবে। এখানে পৃষ্ঠবজ্জুও মস্তিষ্কেব সহাযতা কবে। এই বিষযে শবীবশাস্ত্রজ্ঞেবা অনেক বিচাব কবেছেন। যাঁবা ডাক্তাবি পডছেন, ডাক্তাব হচ্ছেন, তাঁবা এই সব কথা সূক্ষ্মভাবেই জানেন। কিন্তু মস্তিষ্কেব অতিবিক্ত অন্য কেন্দ্রকে সহযোগীরূপে বিকশিত কবলে আমাদেব ভাবপক্ষ, জ্ঞানপক্ষ ও ক্রিযাপক্ষেব কোন কোন চেষ্টা সফল হযে ওঠে—তা এঁদেব জানাব বিষয নয। অবশ্য আজকাল তাঁবাও এই ক্ষেত্র নিযে কাজ কবতে আবম্ভ কবেছেন। আগে তো এই ক্ষেত্র তাঁদেব পক্ষে একেবাবে অববুদ্ধ ছিল।

আমি সূক্ষ্ম শবীবেব কথা ছেড়ে দিযেছি। ঐ শবীবকে সক্রিয কবাব উপাযও আছে। এখানে সে বিষযেব আলোচনা কবব না।

স্থূল শবীবেব সঙ্গে আমাদেব নিকট সম্বন্ধ। কি উপাযে ঐ শবীবেব মুখ্য কেন্দ্রগুলিকে সক্রিয কবা যায, তাব সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবলাম। যদি আমবা এই বিষযে মনোযোগ দিই তবে নিজেদেব ভাবনা অনুসাবে অমুক অমুক কেন্দ্রকে সক্রিয কবে লাভবান হতে পাবব।

রাজগড় শিবির

(৭ জুন, ১৯৭৩—১৭ জুন, ১৯৭৩)

হিসার শিবির

(২ অক্টোবর, ১৯৭৩—৯ অক্টোবর, ১৯৭৩)

১৬

শরীর বোধের অপেক্ষা

সেদিন ছিল দীপাবলী। এক ব্যক্তি আসছিল। বাস্তায আব এক ব্যক্তিব সঙ্গে তাব দেখা হল। দ্বিতীয ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কবল, 'কোথা থেকে আসছ?' প্রথম ব্যক্তি উত্তব দিল, 'বাজাব থেকে।' 'কি এনেছ বাজাব থেকে?' 'দীপ এনেছি।' প্রথম ব্যক্তিব হাতে দীপ ছিল, অর্থাৎ মাটিব এক আকাববিশেষ ছিল। কিন্তু মাটিব তো দীপ হয না। দীপ তাকেই বলে যা প্রকাশমান—যাব আলো আছে, দীপ্তি আছে। যা প্রকাশমান নয, তা দীপ নয। অথচ ওই মাটিব পাত্র ছাড়া কেবল সলতে আলো দেয না, দীপ হয না। যখন মাটিব পাত্রে তেল ভবা হয, সলতে তেলে ভেজে, তখনই দীপ্তি হয। পাত্র ছাড়া কেবল সলতে বা কেবল তেল কিছু কবতে পাবে না, সলতে ও তেল একত্রেও কিছু কবতে পাবে না। আধাবই যেন স্বযং দীপ হযে গেল। তাই সাধাবণ লোকেব ভাষায, সলতে দীপ নয, যা তাব আধাব তাই দীপ।

আমাদেব ঠিক এই বকম অবস্থা। আমাদেব চেতনাব প্রকাশ আমাদেব শবীবেই প্রকট হয। শবীব বাদ দিযে চৈতন্য প্রকট হতে পাবে না। সেজন্য শবীবও আত্মা হযে যায। প্রাচীন সাহিত্যে চেতনাকে

আত্মা বলা হয়েছে, আবার শরীরকেও আত্মা বলা হয়েছে। চৈতন্যের যোগ আছে বলেই শরীরকে আত্মা বলা হয়েছে। আত্মাকে পুদ্গলও বলা হয়েছে। শরীর তো পৌদ্গলিক, তাকেও আত্মা বলা হয়েছে। এখানে আমি ভেদ-বিজ্ঞানের দিক থেকে কথা বলছি। আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, কিন্তু তাদের ভিন্ন মনে করা হয়েছে। আত্মা আর শরীর ভিন্ন, কিন্তু তাদের অভিন্ন মনে করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, শরীরের শক্তি আর আত্মার শক্তি—এই দুই শক্তির মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে। শরীরের শক্তি ছাড়া আত্মার শক্তি কার্যকর হয় না। আবার আত্মার শক্তি ছাড়া শরীরের যন্ত্র সঞ্চালিত হতে পারে না। যেমন আগেই বলেছি, দীপের যদি পাত্র না থাকে তবে আলো পাওয়া যাবে না। বাল্ব নেই, কেবল বৈদ্যুতিক কারেন্ট আছে, তাতে আলো হবে না। অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য আলোর বা দীপ্তির এক আবরণ প্রয়োজন। শরীর বিনা চৈতন্যের প্রকাশ অভিব্যক্ত হতে পারে না। চোখের গোলক যদি ঠিক না থাকে তবে লোকে দেখতে পায় না। চোখই যে দেখে, তা নয়। চোখ অভিব্যক্তির এক মাধ্যম মাত্র। কিন্তু গোলক ছাড়া চোখ দেখতে পায় না। চোখ আর তার গোলক—এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতি গভীর।

আমরা যখন সাধনার কথা মনে রেখে চিন্তা করি, তখন শরীরকে অনেক অভিশাপ দিই, গাল দিই। তবে শরীর যদি গালির যোগ্য হয় তবে প্রশংসার যোগ্যও বটে। যদি শরীর না থাকত তবে আমাদের এই জগৎও বস্তুহীন হতো। কোন কিছুই ব্যক্ত হতো না, সারা জগৎ অব্যক্তই থেকে যেত। সাধনার দৃষ্টিতেও শরীরের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শরীর নশ্বর বটে, কিন্তু সমস্ত শক্তিকে শরীরই অভিব্যক্তি দেয় ও আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। আপনারা যা দেখছেন কেবল সেটাই শরীর নয়, সেটা স্থূল শরীর মাত্র। সেই শরীরও শক্তিশালী, কিন্তু অন্য যেসব শরীর আছে তাদের সঙ্গে তুলনায় কম শক্তিশালী। সেই সব অন্য শরীর হল—সূক্ষ্ম শরীর। নাস্তিকরাও এই শরীরের মধ্যে আত্মার

সন্ধান কবতে চেষ্টা কবেছেন। বাজা প্রদেশী চোবেব শবীব টুকবো টুকবো কবে কেটে আত্মাব সন্ধান কবেছেন। কিন্তু আত্মাব দেখা মেলেনি। আজকেব বৈজ্ঞানিকবাও স্থূল শবীবকে মুখ্য মনে কবে আত্মাব সন্ধানে ব্যাপৃত হযেছেন। তাঁবা মৃত্যুব পূর্বে জীবন্ত শবীবের ওজন নিযেছেন, আবাব মৃত্যুব পবে মৃত শবীবেব ওজন নিযেছেন। তাঁদেব উদ্দেশ্য, দুই শবীবেব ওজনেব মধ্যে কোন পার্থক্য হয কিনা, তা নির্ধাবণ কবা। যদি ওজন কমে যায, বুঝতে হবে কোন বস্তু শবীব থেকে বেব হযে গিযেছে। আব সেটাই হবে আত্মা। যদি দুই ক্ষেত্রে ওজনেব কোন পার্থক্য না হয, বুঝতে হবে কিছুই বেব হয়ে যায নি। যা আগে ছিল এখনও তাই আছে। এই ধবনেব অনেক পবীক্ষাই কবা হযেছে। কিন্তু এ সবই খুব স্থূল ব্যাপাব। আত্মা এখন কোথায ? এখন যা দেখছি তা তো স্থূল শবীব। সেটা প্রথম দবজা মাত্র। তাব আগে আছে সূক্ষ্ম শবীব। সূক্ষ্ম শবীব দু প্রকাব—বৈক্রিয় আব আহাবক। এরা স্থূল শবীব অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বৈক্রিয শবীবেব ক্রিযা নানা রূপে প্রকট হয। আমাদেব স্থূল শবীবেব ক্রিযা একই, অর্থাৎ তা এক রূপেই দেখা যায। স্থূল শবীব রূপ বদল কবতে পাবে না। কিন্তু বৈক্রিয শবীবেব এমন শক্তি আছে যে তা নানা ভাবে রূপ বদল কবতে পাবে। যদি আবশ্যক হয তো এই শবীব একটা পদ্মফুলেব সমান হতে পাবে, আবাব প্রযোজন হলে বিষ্ণুকুমাবেব মত লক্ষযোজন বিস্তৃত রূপ ধাবণ কবতে পাবে। প্রযোজন থাকলে না আবাব পশু-পক্ষীব রূপও ধাবণ করতে পাবে। এই সূক্ষ্ম শবীব এইভাবে নানা রূপ ধাবণ কবতে সমর্থ।

আব এক আছে আহাবক শবীব। এই শবীবও সূক্ষ্ম। এই শবীব বিচাবেব—অর্থাৎ চিন্তা ভাবনাব—সংবাহক। আমাব মনে চিন্তা হল, অমুক ব্যক্তিব সঙ্গে মিলতে হবে, অমুক ব্যক্তিব সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। কিন্তু সে ব্যক্তি এখানে নেই, অনেক দূবে কোথাও আছে। কি কবে তাব সঙ্গে আমাব মিলন হবে ? কি কবে কথাবার্তা

হবে ? এই অবস্থায় সংকল্পমাত্রই এক সূক্ষ্ম শরীরের নির্মাণ হয়ে যায়। এই শরীরের সংস্থান ছোট হয়। ছোট, খুবই ছোট। ধারণাতীত ক্ষুদ্র। এই শরীর হাজার মাইলের দূরত্ব এক মুহূর্তে পার হয়ে আমার ইঙ্গিতে ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। তার কাছে আমার প্রশ্ন রাখে, আবার উত্তরও নেয়, তার পরে ফিরে এসে আমার শরীরে প্রবেশ করে সমাহিত হয়ে যায়। এই সমস্ত ক্রিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যায় যে, ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে না সম্পূর্ণ ক্রিয়াতে কত সময় লেগেছে। এই হল আহারক শরীরের কাজ। এই শরীর বিচারের—চিন্তা-ভাবনার—সংবাহক। চিন্তা বহন করে নিয়ে যায়, আবার চিন্তা বহন করে ফিরে আসে।

এর আগে আরও দুটি সূক্ষ্মতম শরীর আছে। তাদের একটি তৈজস শরীর, অপরটি কার্মণ শরীর। সবশুদ্ধ শরীরের তিনটি 'গ্রুপ' হয়ে গেল :

স্থূল শরীর—ঔদারিক শরীর—হাড়-মাংসের শরীর।

সূক্ষ্ম শরীর—বৈক্রিয় শরীর—নানারূপ গ্রহণে সমর্থ শরীর।

আহারক শরীর—বিচার-সংবাহক শরীর।

সূক্ষ্মতম শরীর—তৈজস শরীর—তাপময় শরীর।

কার্মণ শরীর—কর্মময় শরীর।

তৈজস শরীর হল তাপময় শরীর। এই শরীর আমাদের উষ্মা, সক্রিয়তা আর শক্তির সঞ্চালক। এই শরীর যদি না থাকত, তবে উষ্মা উৎপন্ন হতো না, পাচন ক্রিয়া হতো না, রক্তের সঞ্চরণও হতো না। এই তৈজস শরীরই আমাদের স্থূল শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া সঞ্চালন করছে। স্থূল শরীরে যে শক্তি আছে তার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডারই হল তৈজস শরীর। যার তৈজস শরীর মন্দ হয়, তার অগ্নিমান্দ্য হয়, সমস্ত ক্রিয়াতেই মন্দতা লক্ষিত হয়। অগ্নি তীব্র হলেই সমস্ত ক্রিয়াতে তীব্রতা আসে। আধুনিক বিজ্ঞানে এই তথ্য ভাল করেই ধারণা করা হয়েছে। ডঃ হীহাক প্রতিপাদন করেছেন যে, সূর্যের তেজ আমাদের আহারের পূর্তি করে।

সূর্যের তাপ আমাদের খাদ্যের পূরক। যদি সূর্যের তাপ না মেলে আমরা কেবল খাদ্যের সাহায্যে বেঁচে থাকতে পারি না। এই বিষয়ে মাইকেল ও তাঁর কয়জন সহকারী ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা আঠারোটি ইঁদুর বেছে নেন। তাদের মধ্যে বারোটিকে এমন আহার দিলেন যাতে সুষম খাদ্যের সব উপাদানই ছিল, কিন্তু ক্যালসিয়াম ও ফস-ফরাসের অভাব ছিল। খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুরো উপাদান না থাকায় ইঁদুরগুলি রোগগ্রস্ত হয়ে গেল। তাদের অন্ধকার ঘরে রাখা হয়েছিল। তারা রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাদের সূর্যের তাপে রাখা হল। দু-একদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে গেল, যদিও তাদের খাদ্য অপূর্ণই রইল।

দ্বিতীয় দলের ইঁদুরগুলিকেও অপূর্ণ খাদ্য দেওয়া হল। তারাও রোগগ্রস্ত হয়ে গেল। কিন্তু এবার তাদের সূর্যের তাপে ছাড়া হল না। তারা অন্ধকার ঘরেই রইল। কিন্তু তাদের যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল তা দেওয়ার আগে অনেকক্ষণ রৌদ্রে রাখা হল। দুই-চার দিনের মধ্যেই ইঁদুরগুলি সুস্থ হয়ে গেল। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে ডাক্তার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, সূর্যের তাপ কেবল খাদ্যকে পাক করে না, ঐ তাপ নিজেই খাদ্য এবং আহারের পরিপূরক। সূর্যের তেজ না পেলে বনস্পতির বিকাশ হয় না। মনুষ্য শরীরেরও বিকাশ হয় না, আর ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকও হয় না। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে মনে এক চিন্তা আসছে। জৈন পরম্পরায় মুনিদের আতাপনা নেওয়ার কথা সর্বজনবিদিত। অনেক মুনি আতাপনা নিতেন। তাঁরা কয়েক ঘণ্টা ধরে সূর্যের তাপ নিতেন। তাঁরা পুরো দু দিন বা পুরো তিন দিন আহার না করে থাকতেন। তাঁদের ক্ষিধে কমে যেত। তাঁরা এই রহস্য জানতেন, সে জন্যই এই ক্রিয়াতে ব্রতী হতেন। আতাপনা তিন প্রকারের হতে পারে—জঘন্য, মধ্যম আর উৎকৃষ্ট। মুনি তাঁর শারীরিক শক্তি অনুসারে ব্রত নিতেন। স্থূল উপকরণের দ্বারা ভোজনের যে পূর্তি হতো, সূর্যের তাপ থেকে সহজেই সেই পূর্তি হয়। সূর্যের তাপ থেকেই মুনি পুরো ভোজন পেতেন। আতপ সেবন করার সময়ে মুনি পরিধানে

কেবল একটি নেংটি কাপড বাখতেন, দেহেব অধিকাংশ অংশই বৌদ্রে অনাবৃত বাখতেন। সমস্ত বোমকূপ দিযে সূর্যেব বশ্মি শবীবে প্রবিষ্ট হতো, আব তা অনেক কেন্দ্রকে সক্রিয কবে তুলত। আজকাল লোকে শবীবেব ওপব পোষাকেব বোঝা চাপায, সে বোঝা ভেদ কবে হাওযাও যায না, আলোও যায না। ফলে শবীব তাপ আব আলো পায না।

সূর্যেব তাপ আমাদেব আহাবেব খাদ্যেব পূর্তি কেবল তখনই কবতে পাবে যখন তৈজস সক্রিয থাকে। তৈজস নিষ্ক্রিয থাকলে সূর্যেব আতপ কার্যকব হয না। আমাদেব তৈজস শবীবেব শক্তি জাগ্রত হওযা দবকাব। তৈজস শবীবেব দুটি কার্য আছে—

১। শবীব-তন্ত্রেব সঞ্চালন।

২। অনুগ্রহ আব নিগ্রহ বা উপঘাত।

আমবা জানি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে কোন সভাব দিকে তাকান তো সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই অপূর্ব আনন্দ বোধ কবে ও নিজেকে ধন্য মনে কবে। প্রসন্নতা-ভবা দৃষ্টিতে কাবো কিছু মেলে না। ওই বিশিষ্ট ব্যক্তি কাউকে কিছু দেওযাব চেষ্টাও কবেন না—তবুও প্রত্যেক ব্যক্তি মনে কবে সে পূর্ণকাম হযে গিযেছে, তাকে খুবই কৃপা কবা হযেছে। যেন অমৃত বর্ষণ হযে গিযেছে। 'ভবত বাহুবলী' মহাকাব্যে কবি পুণ্যকুশল লিখেছেন—'নৃপাঃ প্রসীদন্তি দৃশৈব নো গিবা' —বাজাবা দৃষ্টিব দ্বাবাই প্রসন্নতা বর্ষণ কবেন, বাণীব দ্বাবা নয। তাঁবা এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ কবেন যে, সামনে যাবা থাকে তাবা আপনা-আপনি অনুগৃহীত হযেছে বলে মনে কবে। কেমন কবে এই অনুগ্রহ তাঁদেব দৃষ্টি থেকে ঝবে পডে? দৃষ্টি থেকেই ঝবে, কিন্তু আসলে এই অনুগ্রহ চোখে নেই। তা আছে তৈজস শবীবে। ঐ বকম ব্যক্তিদেব তৈজস শবীব এতই অনুগ্রাহক, প্রভাবশালী আব তীব্র হয যে, তাঁবা যে দিকেই দৃষ্টিপাত কবেন সে দিকেই লোকে অনুভব কবে যেন তাবা সুধাস্নাত হযেছে।

তৈজস শবীবেব দ্বিতীয কার্য হল—নিগ্রহ কবা, উপঘাত কবা।

তৈজস শবীবেব নিগ্রহ কবাব বা উপঘাত কবাব প্রবল ক্ষমতাও থাকে। ঐ ক্ষমতা এমন যে, একবাব যদি ঐ ক্ষমতাব অধিকাবী কোন দিকে ক্রুব দৃষ্টিপাত কবেন, তবে হাজাব হাজাব লোক ভযে কেঁপে ওঠে। এই বকম উপঘাতক শক্তিব প্রকাশ আমবাও দেখেছি। এভাবে তৈজস শবীব অনুগ্রহ ও নিগ্রহ কবতে সমর্থ হয।

কার্মণ শবীব সূক্ষ্মতম শবীব। এটা কর্ম-শবীব, অন্য সব শবীবেবই মূল আধাব। এই শবীব আছে বলেই তৈজস শবীব আছে, বৈক্রিয আব আহাবক শবীব আছে, স্থূল ঔদাবিক শবীব আছে। যদি এই শবীব না থাকে, কোন শবীবই থাকবে না। স্থূল শবীব মৃত্যুব পবেই ছেড়ে যায, কার্মণ কিন্তু তা নয। যখন কাবো কার্মণ শবীব ছেড়ে যায তখন আমবা বলি—তাব মোক্ষ হল, সে মুক্ত হযে গেল। কার্মণ শবীবেব বিচ্ছেদ একবাবই হয, স্থূল শবীবেব বিচ্ছেদ বাব বাব হয।

একটা ছোট ঘটনাব কথা বলি। একবাব মাছি আব পিঁপড়েব মধ্যে বিবাদ হল। মাছি পিঁপড়েকে বলল—'তুই কোথায কোথায যেতে পাবিস? তোব গতিব তো সীমা আছে। আব দেখ, আমি সব জাযগায যেতে পাবি। যেখানে ভগবানেব ভোগ লাগাচ্ছে সেখানেও যেতে পাবি। আমাব চলাফেবাব কোন বাধা নেই।' পিঁপড়ে বলল—'যাওযা এক কথা, আব নিমন্ত্রণ পেযে যাওযা আব এক কথা। তুমি যেখানেই যাও সেখানেই তোমাকে উড়িযে দেয, মেবে দেয, গাল দেয।'

ওই মাছিব দশাই আমাদেব শবীবেব। যতবাবই আমবা শবীব ছাড়ি, ততবাবই আবাব শবীব এসে জোটে। কার্মণ শবীব কিন্তু এমন নয। এই শবীব সহজে ছাড়ে না। কিন্তু একবাব যদি ছেড়ে যায তো চিবকালেব মত ছাড়ে। এই শবীব—ভাবনাব শবীব, বাসনাব শবীব, সংস্কাবেব শবীব। এই শবীব থেকে মুক্তি পাওযা কঠিন।

স্থূল শবীবেব সঙ্গেই আমাদেব কাজ। সাধনাব উদ্দেশ্য হল, আমবা স্থূল শবীবেব শক্তিকে জাগ্রত কবব, সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম শবীবেব শক্তিকেও সক্রিয কবব। স্থূল ও সূক্ষ্ম—উভয শবীব থেকেই আমবা লাভবান হব।

মনোবিজ্ঞান চেতন মন আব অবচেতন মন—এই তুই প্রকাব মনেব প্রতিপাদন কবেছে। চেতন মনে যত শক্তি আছে, অবচেতম মনে তাব অনন্ত গুণ শক্তি আছে। চেতন মন চতুব। অবচেতন মন সবল, কিন্তু অনন্ত শক্তিব ভাণ্ডাব। এ কাজ কবতে হবে, ও কাজ কবা হবে না—আপনাব এ সব কথা চেতন মন শুনবে বটে, কিন্তু কবাব বেলায তা সেই কাজই কববে যে কাজ তাব আগে ভাল লেগেছে। অবচেতন মন সে বকম নয। অবচেতন মনকে আপনি যা বলবেন তা যদি ঐ মন ধাবণা কবে নিতে পাবে, তবে ঐ মন সেই কাজই কববে যে কাজ তাকে কবতে বলবেন। এই যে চেতন মন আব অবচেতন মনেব পার্থক্য, তা স্থূল শবীব ও সূক্ষ্ম শবীবেব পার্থক্যও বটে। স্থূল শবীবেব শক্তিকে যদি এক পযসা মনে কবা যায তো সূক্ষ্ম শবীবেব শক্তিকে বলতে হবে নিবানব্বই পযসা। এত পার্থক্য তুই শবীবেব মধ্যে। সূক্ষ্ম শবীবকে জাগ্রত কবাব অর্থ হল—বিদ্যুৎ ভাণ্ডাব নির্মাণ কবা। কিন্তু আমাদেব চলতে হবে স্থূল শবীবকে নিযেই। আমাদেব শক্তিকে প্রকট কবাব প্রথম উপায এই স্থূল শবীব। সাধনাব দৃষ্টিতে এই শবীব মূল্যবান। আবাব অনেক উচ্চে দৃষ্টি দিযে আমবা শবীবকে বহিষ্কাব কবেছি, কাবণ শবীবই আমাদেব বাসনাব দিকে প্রেবিত কবে। আমাদেব সাহিত্যিকবাও জিভকে, চোখকে হাজাব বকমেব গাল দিযেছেন, ভাল-মন্দ বলেছেন। কোন কোন সাধক বলেছেন, চোখকে ফুঁডে দেওযাই খুব বড সাধনা, কাবণ চোখই বিকৃতিব শক্তিমান মাধ্যম। চোখকে না ফুঁডলে সাধনা সম্ভব হয না। তাঁবা বাস্তবিকই চোখ ফুঁডতেন, আব চিবকালেব জন্য অন্ধ হযে যেতেন।

সাধনাব জন্য শবীবেব উপযোগিতা কি? শবীবেব তুই মুখ্য ভাগ—মস্তিষ্ক আব সুষুম্না। মস্তিষ্ক সমস্ত শবীবতন্ত্রেব নিযামক আব সঞ্চালক। চোখ দেখে। কিন্তু দর্শন শক্তি আছে মস্তিষ্কে। কান শোনে। কিন্তু শ্রবণশক্তি থাকে মস্তিষ্কে। সমস্ত জ্ঞানেব গ্রাহক ও সঞ্চালক সংস্থান হল মস্তিষ্ক। সকল স্মৃতিই সেখানে সংগৃহীত থাকে। মস্তিষ্ককে জাগ্রত

করাই স্মৃতিকোষকে জাগ্রত করা। আমাদের মস্তিষ্ক অতিশয় শক্তিশালী। সেখানে শতকোটি কোষ আছে, আর সেই সব কোষে অসংখ্য সংস্কার, অসংখ্য স্মৃতি সংগৃহীত আছে। অবধান বিদ্যা স্মৃতিকোষেরই এক চমৎকারী প্রকাশ।

নন্দীসূত্রে মতিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেখানে তার বারটি প্রকার-ভেদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে—বহুগ্রাহী, ক্ষিপ্রগ্রাহী ইত্যাদি। ঐগুলি সমস্ত মস্তিষ্কের শক্তির দ্যোতক। তবে ঐগুলির বিবেচনা সময়-সাপেক্ষ। আজ একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে স্থূল শরীরের শক্তির বিষয়ে আমাদের পুরো জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের শরীরে মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠরজ্জু, কণ্ঠ, ভ্রূকুটি, তালু, নাসাগ্র, নাভি, মূলবন্ধের স্থান ও পায়ের বুড়ো আঙ্গুল—এগুলি মুখ্য কেন্দ্র। এগুলিকে জানা আবশ্যক। এদের দ্বারা আমরা স্থূল শরীরকে জাগ্রত করব, আর ঐ শরীরের যে সব শক্তি আছে তাদের থেকে লাভবান হব। এ কথা বলা যায় যে, আমাদের স্থূল শরীরের সমগ্র শক্তির লক্ষ ভাগের মধ্যে কেবল দু-চারটি ভাগই আমরা বর্তমানে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি, বাকি সব ভাগই সুষুপ্ত রয়ে গিয়েছে, জাগ্রত হয় নি। কিন্তু এই সুষুপ্ত শক্তির বোধ আমাদের হওয়া চাই।

ধর্ম এই কথা বলেছে, অধ্যাত্মশাস্ত্র এই নির্দেশ দিয়েছে, সাধনা এই শিখিয়েছে যে—তুমি অনন্ত শক্তির স্রোত, তুমি নিজের শক্তি-সম্পদকে দেখ, বোঝ আর অনুভব কর, বৃথাই তুমি ভিখারির মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কেন তুমি ভিক্ষা চেয়ে মরছ। অবশ্য এই জ্ঞান কেবল তখনই হতে পারে যখন আমাদের শরীর সম্বন্ধে পূর্ণ বোধ হয়েছে। তাই আমরা শরীরকে উপেক্ষা করব না ; শরীরের কাছে আমাদের যেমন প্রত্যাশা, তার অনুরূপ সম্মান ও আদর আমরা শরীরকে দেব।

১৭

প্রাণ ও তার কার্যক্ষেত্র

সাধারণ জৈন বিদ্যার্থীও জানে আমাদের শরীরে দশটি প্রাণ আছে। সে তাদের পারিভাষিক নাম ও বিশেষ বিশেষ কার্যও জানে। আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই অহিংসার আধারে স্থাপিত। হিংসা বোঝাতে একটি শব্দ আছে—প্রাণাতিপাত। প্রাণের বিনিযোজন করা—হিংসা। প্রাণী, প্রাণ ও প্রাণের বিনিযোজন—এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। প্রাণী তাকেই বলি যে প্রাণকে ধারণ করে আছে। প্রাণ না থাকলে আত্মাও প্রাণী হতে পারত না। আত্মার যে প্রাণীর অবস্থা, তা প্রাণধারার কারণেই হয়েছে। প্রাণ জীবনের মুখ্য কেন্দ্র। আমাদের বুঝতে হবে, সাধনার দৃষ্টিতে প্রাণের কি মূল্য আছে। প্রাণ একটি ধারা, শক্তির এক প্রবাহ। ঐ প্রবাহ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত রয়েছে। তার দ্বারাই জীবনের সঞ্চালন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাণ দশটি নয়, প্রাণধারা একই। কিন্তু তা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, সেজন্য অনেক হয়ে যায়। প্রাণের মুখ্য কেন্দ্র দশটি, সেজন্য প্রাণ দশটি বলা হয়। যে জীব মাত্র এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে, যে জীব পাঁচ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে। এ রকম স্থলে প্রাণের সংখ্যার পার্থক্য হয় বটে, কিন্তু প্রাণশক্তির পার্থক্য হয় না।

প্রাণের দশটি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা বলি শরীরে দশটি প্রাণ আছে, তাৎপর্য এই যে, শরীরে এমন দশটি কেন্দ্র আছে যেখান থেকে প্রাণশক্তি সঞ্চালিত হতে পারে। পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বচন, কায়া, শ্বাস-প্রশ্বাস আর আয়ুষ্য—এই দশটি প্রাণ। এই দশ প্রাণের স্থান কোথায় কোথায়? যে প্রাণের দ্বারা নিজের কেন্দ্রগুলিতে শক্তি যোগায় তার অবস্থানই বা কোথায়, তার 'সেন্টার' কোথায়? দশ প্রাণকেই শক্তি দেওয়ার কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে আছে। মস্তিষ্কে সমস্ত শক্তিই কেন্দ্রিত। লক্ষ্য করুন, আপনার শ্রবণের এক কেন্দ্র আছে, ঘ্রাণের এক কেন্দ্র আছে, শ্বাসের এক কেন্দ্র আছে, চিন্তন ও সংবেদনা প্রভৃতির এক কেন্দ্র আছে; কিন্তু ঐ সব কেন্দ্রই মস্তিষ্কে অবস্থিত। এর এই অর্থ যে, আমাদের ছয়টি পর্যাপ্তির কেন্দ্রই আমাদের মস্তিষ্কে আছে। পর্যাপ্তিগুলি পৌদগলিক রচনা। পর্যাপ্তি একটি সংস্থান, তাতে ক্ষমতা আছে। তার কেন্দ্রে যখন প্রাণের ধারা সঞ্চারিত হয়, তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন পর্যাপ্তি প্রাণের রূপ ধারণ করে। এজন্য আমরা মানি যে পর্যাপ্তি কারণ, আর প্রাণ কার্য। দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। মূল প্রাণ কি? এই প্রশ্ন জটিল। এক আছে প্রাণবায়ু, আর এক আছে প্রাণ। দুটি কিন্তু একই বস্তু নয়। অনেক সময়েই আমরা প্রাণবায়ুকেই প্রাণ বলে মনে করেছি। আসলে কিন্তু ঐ দুটি পৃথক, এক নয়। যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি তা সম্পূর্ণ প্রাণ নয়। যখন আমরা শ্বাস নিই তখন আমরা প্রাণকে টেনে নিই না, যখন আমরা শ্বাস ছাড়ি তখন আমরা প্রাণকে ছাড়ি না। যখন আমরা প্রাণায়াম করি তখন আমরা প্রাণের আয়াম, অর্থাৎ নিয়মন করি না, আমরা প্রাণবায়ুর আয়াম করি। এই যে এত শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া—এ সবই বায়ুর কাজ, প্রাণের কাজ নয়। আমাদের প্রাণ তো এক সূক্ষ্ম ধারা, যা আমাদের ভেতরে থেকে সমস্ত কার্য সঞ্চালিত করে। প্রাণ আসছে আত্মশক্তি থেকে, তৈজস শরীরের রূপে। প্রাণবায়ুর চেতনার সঙ্গে সোজাসুজি সম্বন্ধ হয় না, প্রাণ কিন্তু চেতনার সঙ্গে সোজা সম্বন্ধে জড়িত।

আমাদের তৈজস শরীর সমস্ত উষ্মা উৎপাদন করে। জীবনের সঙ্গে ঐ শরীরের নিকট সম্বন্ধ, স্থূল শরীরের সম্বন্ধ নিকট নয়। এক দিকে জীবের তৈজসশক্তি আর এক দিকে চৈতন্য, যখন এই দুই দিকের সংযোগ হয়, তখন প্রাণের উৎপত্তি হয়। প্রাণে চৈতন্যের প্রবাহ আছে, প্রাণবায়ুতে চেতনার প্রবাহ নেই। প্রাণকে এক যৌগিক শক্তি বলতে হয়।

আমাদের শরীরে এক বিশেষ কেন্দ্র আছে। যে স্থানে সুষুম্নার নিম্নস্থ প্রান্তভাগ শেষ হয় তার নিচেই সেই কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রটি প্রাণশক্তির উৎপাদক। প্রাণশক্তিকে প্রকটিত করার ও তাকে সঞ্চারিত করার মুখ্য কেন্দ্রই ঐটি। প্রাণশক্তি সুষুম্না দিয়ে বিভিন্ন মার্গে সঞ্চারিত হয় ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছয়। প্রাণশক্তি ওপর থেকে নিচের দিকে যায় না, নিচ থেকে ওপরের দিকে যায়। ঐ শক্তি নিচ থেকে যত বেশি ওপরের দিকে যাবে, মানুষের শরীর ও মন ততই সুস্থ থাকবে। প্রাণশক্তির প্রবাহ যতই কম হবে মানুষ ততই শরীর ও মনে রুগ্ন হয়ে যাবে।

কর্মকার ভস্ত্রা চালায়। তাতে হাওয়া হয় এবং আগুন জ্বলে ওঠে। এক দিকে ভস্ত্রা দিয়ে হাওয়া বের হয়, অন্যদিকে আগুন জ্বলে। হাওয়া আর আগুন এক নয়। অথচ হাওয়ার যত তেজ হবে, আগুনেরও তত তেজ হবে। ঠিক এইভাবেই প্রাণবায়ু প্রাণকে উত্তেজিত করে, সহায়তা দেয়। আমরা যে মাত্রায় প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) নেব, সেই মাত্রায় প্রাণ বিশুদ্ধ হবে, সক্রিয় হবে। যদি প্রাণবায়ু না মেলে তো প্রাণে উত্তেজনা বা সক্রিয়তা আসবে না। শরীর শাস্ত্রের দিক থেকে এর কারণ এই যে, আমাদের শরীরে রক্ত-সঞ্চালন হৃৎপিণ্ডের দ্বারা হয়, তবে ঐ রক্ত ফুসফুসে এসে তারপরে সারা শরীরে যায়। হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস—এই দুটি আমাদের রক্ত-সঞ্চালনের মুখ্য যন্ত্র। ফুসফুসে যে রক্তের শোধন হয় তার জন্য ইন্ধন চাই। ঐ ইন্ধনই হল প্রাণবায়ু-অক্সিজেন। যদি প্রাণবায়ু ঠিকমত মেলে, তবে অশুদ্ধ বায়ুকে শুদ্ধ

কবে কার্বন প্রভৃতি শবীর থেকে বেব করে দেওযা যাবে, আর শুদ্ধ রক্ত ভেতবে প্রবাহিত হবে। আব যদি প্রাণবায়ু না মেলে তো রক্ত বিকৃতই থাকবে, আব তাব ফলে সারা শরীরেই বিকৃতি দেখা দেবে। প্রাণবায়ু বক্ত-শুদ্ধিব উপায, আব শুদ্ধ বক্তকে সাবা শরীরে প্রাণবাযুই গতি দেয়। প্রাণেব সঙ্গে তাব সম্বন্ধ গভীব। প্রাণবায়ু রক্তের মাধ্যমে প্রাণকে উত্তেজিত করে, সক্রিয কবে। একটা ছোট গাছ যদি জলেব পর্যাপ্ত সেচন পায় তবে তা সবুজ পাতায পূর্ণ হযে বেড়ে ওঠে। সেই বকম, প্রাণবাযুব পর্যাপ্ত সেচন পেলে প্রাণের ছোট গাছটিও পাতার সমাবোহে বেড়ে ওঠে। পুবো সেচ না পেলে ছোট গাছ শুকিযে যায। সেই বকম, মানুষও নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয হয়ে যায়।

যেখানে প্রাণবায়ু পৌঁছতে পারে না সেখানে বক্তের শোধন হয না, আব শোধনেব অভাবে দূষিত পদার্থ জমতে থাকে। যে প্রাণাযাম জানে সে সবার আগে এই বিষযে প্রযত্ন করে, কিভাবে বেশি বায়ু ফুসফুসে পৌঁছে দেওযা যায। কিভাবে শ্বাসকে দীর্ঘ করা যায।

প্রাণবায়ুকে ঠিকমত নেওযার সাধনই হল—প্রাণাযাম। যে প্রাণাযাম জানে না. সে পুবো মাত্রায প্রাণবায়ু গ্রহণ কবতে সক্ষম হয না। তিনটি ব্যাপার এখানে জড়িত—প্রাণ, প্রাণবায়ু আর প্রাণাযাম। প্রাণাযাম ছাড়া প্রাণবায়ুর সম্যক গ্রহণ হয না, আবার প্রাণবায়ু ছাড়া প্রাণেব সম্যক উদ্দীপন হয না। সবশেষে আমি প্রাণাযামের কথা বলছি। প্রাণায়াম এক সাধন। এই সাধন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এব সম্যক জ্ঞান না থাকলে প্রাণবায়ুকে জানা সম্ভব হয না। যোগেব আচার্যবা এই বিষযে যা কিছু লিখে গিযেছেন আজকের বিজ্ঞান তাব সঙ্গে একমত হতে চলেছে।

আমি প্রাণ থেকে আবম্ভ -করেছিলাম, তারপরে প্রাণবায়ুর কথা বলেছিলাম, এখন প্রাণাযামে এসে পৌঁছেছি। এবার উল্টো পথে যাত্রা শুরু করছি। আমি প্রাণাযাম থেকে আবম্ভ কবছি। আমাদের প্রাণাযামেব অভ্যাস উপযুক্ত হওযা দরকাব। তাহলে প্রাণবায়ু স্বযং

প্রসাধিত হবে। প্রাণবায়ুকে কি মাত্রায় নেওয়া দরকার, প্রাণবায়ু কতদূর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে—এসব বিষয়েরও জ্ঞান থাকা চাই। প্রাণবায়ু ঠিকমত নিতে পারলে প্রাণকে সক্রিয় করার ক্ষমতা জাগ্রত হবে। প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করে যোগী ব্যক্তি বিচিত্র কাজকর্ম করে দেখাতে পারেন। তৈজস শরীরেব অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করাব ক্ষমতা আছে। তৈজসশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নির্যাতন করতে পারেন, বিনষ্ট করতে পাবেন, মারতে পারেন—আবাব অনেক রকম অনুগ্রহও করতে পারেন, দিতেও পারেন। ঐ রকম ব্যক্তির দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে। এ সবই আসলে প্রাণশক্তির ক্রিয়া; প্রাণের সম্বন্ধ আছে তৈজসের সঙ্গে। এসব ক্রিয়া তখনই হয়, যখন প্রাণায়াম থেকে প্রাপ্ত প্রাণবায়ুর অগ্নি প্রাণকে এতটা উদ্দীপ্ত করে—প্রাণকে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করে—যে, প্রাণের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকটিত হয়ে যায়। সুতরাং এদিক থেকে প্রাণায়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

প্রাণেব সমস্ত কেন্দ্র মস্তিষ্কে, কিন্তু প্রাণধারার দুটি পথ হতে পারে। একটি পথ বাইরে, আর একটি পথ ভেতরে। বাইরেব পথই আগের পথ। এই পথ দিয়ে গেলে প্রাণশক্তি আমাদের শরীর-তন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে। আমাদের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তা এর থেকেই উৎপন্ন হয়। তা অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দেয় না। এই পথে প্রবহমান প্রাণশক্তি আমাদের দশটি প্রাণ-কেন্দ্রকে সক্রিয় করে, আর আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলে। যখন আমরা প্রাণশক্তিব প্রবাহকে এই পথ থেকে অপর পথে ঘুরিয়ে দিই, তখন ভিন্ন প্রকারের শক্তির উৎপত্তি হয়।

প্রাণধারা প্রবাহিত হওয়ার ভেতরের পথকে বলা হয়—মহাবীথি। এই শব্দ আচারাংগ থেকে এসেছে—‘পণয়া বীরা মহাবীহিং’। জানি না সূত্রকার কি অভিপ্রায়ে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, জানি না ব্যাখ্যাকারদের অভিপ্রায়ই বা কি। কিন্তু এই রকম মনে হয় যে, এই সূত্র প্রাণধারাকে পৃষ্টরজ্জু দিয়ে উর্ধ্বগামী কবে দেওয়ার সূত্র। এর

অর্থ যে বীর হয়, তাকে মহাপথ দিযে চলতে হয। 'হঠযোগ প্রদীপিকায' সুষুম্নার এক পর্যায়বাচী নাম 'মহাপথ'। অনুমান করি, মহাবীথি আর মহাপথ একই কথা। বীর সেই ব্যক্তিই, যে মহাবীথি ধরে চলতে পারে। সুষুম্নার পথ দিযে যাওয়া সত্যিই বীরের কাজ। সাধারণ মানুষ এ পথে চলতে পারে না। সুষুম্নার পথ দিয়ে প্রবহমান প্রাণধারা সুষুম্নার কোণে যে শক্তি আছে তাকে সংগ্রহ করে নেয় ও অধিকতর শক্তিশালী হযে যায। প্রাণধারার এই দুটি পথ—একটি অগ্রগামী বা বাইরের, অপরটি পৃষ্ঠরজ্জুগামী বা ভেতরের।

যে সাধক প্রাণাযাম করে, প্রাণবাযুর মর্ম বোঝে, সেই সাধক প্রাণবাযুকে উত্তেজিত করতে পারে। আবার কুম্ভক করে সুষুম্না মার্গে ধাক্কা লাগায, আর প্রাণকে ওপরে নিযে যায়। প্রাণ যতই জ্ঞান-কেন্দ্র পর্যন্ত, সহস্রার পর্যন্ত পৌছয়, ততই আমাদের বৌদ্ধিক ও আন্তরিক বিকাশ হয। প্রাণধারা যদি মনের সঙ্গে নিচের দিকে প্রবাহিত হয তবে ভাবাবেগ আর কামনা-বাসনায আমরা ভরে উঠি। প্রাণ আর মনের সম্বন্ধ অতি গভীর। প্রাণধারা নিম্নগামী হলে মনও নিম্নগামী হয, প্রাণধারা উর্ধ্বগামী হলে মনও উর্ধ্বগামী হয়। আবার মন নিম্নগামী হলে প্রাণধারাও নিম্নগামী হয, মন উর্ধ্বগামী হলে প্রাণধারাও উর্ধ্বগামী হয। এজন্য মন ও প্রাণ উভযকেই উর্ধ্বগামী অবস্থায রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮

আহার অনাহার

আমাদের জীবনের সকল কর্ম-প্রবৃত্তির আধারই হল শরীর, আর শরীরের আধার—আহার বা ভোজন। আহার ছাড়া শরীর চলে না, আবার শরীর ছাড়া কর্ম-প্রবৃত্তি হয় না। এই যে আঙ্গুল হেলাচ্ছি, এ কাজও আহার ছাড়া সম্ভব হয় না। আহার গ্রহণ না করে চিন্তা করা যায় না, কথা বলা যায় না, শ্বাস নেওয়া যায় না। আপনারা মনে করবেন না যে, পাঁচ ঘণ্টা আগে আমি যে আহার করেছিলাম তারই শক্তিতে এখন আঙ্গুল নাড়ছি। এখন যদি আঙ্গুল হেলাই, বুঝতে হবে এখনই আহার পেয়ে সে কাজ করতে পারছি। এখন যে আমি কথা বলে যাচ্ছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহার পাচ্ছি বলেই বলতে পারছি। এখন যে আমি চিন্তা করছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহার পাচ্ছি বলেই করতে পারছি। শরীরের প্রবৃত্তি যে ক্ষণে হয়, তার পূর্বক্ষণেই আমাদের আহার নিতে হয়। আহার নেওয়ার পরেই আমাদের প্রবৃত্তি হতে পারে। 'আহার' শব্দের অর্থ—বাইরে থেকে নেওয়া। বাইরে থেকে কিছু না নিয়ে কোন প্রবৃত্তিই হতে পারে না।

গৌতম মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভন্তে! এক সমর্থ মুনি আছেন। তিনি বৈক্রিয় রূপ নির্মাণ করেন। বৈক্রিয় শক্তির প্রয়োগ

করেন। তিনি নিজের থেকেই নানা রূপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি কি আহার না নিয়ে, পুদ্গল গ্রহণ না করে, এসব করতে পারেন?

মহাবীর বললেন—গৌতম! তুমি খুবই শক্তিশালী, কিন্তু বাহ্য পুদ্গল না নিয়ে তিনি এসব করতে পারেন না। তিনি বাইরে থেকে আহার নিয়েই এসব করছেন।

আমি স্বীকার করি আপনারা আহার সম্বন্ধে আমার এসব কথা পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না। না পারার কারণও আছে। আমাদের মুখ দিয়ে খাওয়া হয় যে খাদ্য তাকেই কেবল আমরা আহার বলে মানি, অন্য কোন আহার আমাদের আহার বলেই মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্য রকম। মুখ দিয়ে খাওয়া হয় যে পদার্থ তা আমাদের বড় শক্তি দেয়, তার থেকে অধিক শক্তি দেয় অন্য অনেক তত্ত্ব যা আমরা আহার রূপেই গ্রহণ করে থাকি। আহারের অর্থ—খেয়ে চেটে খেয়ে, আস্বাদন করে খেয়ে আমরা মুখ দিয়ে নিই। কিন্তু কতবার? সাধারণত দুবার, আর খুব বেশি হলে তিন-চারবার। কিন্তু এ সবই ভুল কথা, সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই যে, আমরা প্রতিক্ষণেই আহার নিয়ে থাকি, আর ঐ আহার ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। জৈন পরিভাষায় এই আহারের সংজ্ঞা—'লোম আহার'। যে আহার মুখ দিয়ে নেওয়া হয় তা 'কবল আহার', আর যে আহার শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়ে নেওয়া হয় তা 'রোম আহার'। বাস্তবিক পক্ষে, এই দ্বিতীয় প্রকারের আহারই আমাদের জীবনের আধারভূত আহার। এই আহার ছাড়া জীবন চলে না। মুখ দিয়ে কিছু না খেয়েও আমরা ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু 'রোম আহার' ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না।

প্রথম আহার 'কবল আহার', দ্বিতীয় আহার 'রোম আহার'। আবার তৃতীয় প্রকারের আহারও আছে, তাকে বলে 'মনো আহার' বা 'মানসিক আহার'। এই আহারের জন্য শরীরের প্রয়োজন নেই, কবল বা গ্রাসের প্রয়োজন নেই, রোমেরও প্রয়োজন নেই। মন সংকল্প করে

হল, আর অমনি পূর্ণ আহার হয়ে গেল। এই হল মনোভক্ষী আহার, মানসিক আহার। সুতরাং আহার হল তিন রকমের—কবল আহার, রোম আহার আর মনো আহার। সমগ্র আহার আমাদের শরীরকে নতুন স্বরূপ প্রদান করে, আর আমাদের আহার সম্বন্ধে স্থূল ধারণা দূর করে। আজ আহার বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে। তার ফলে মানুষ অনেক অস্বস্তিতে ভুগছে। কারণ, সবাই বুঝে নিয়েছে যে, মুখ দিয়ে যা খাওয়া হয় তা শরীর ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই পর্যাপ্ততার ধারণা কিন্তু ভুল। আজ 'সংতুলিত আহার' অর্থাৎ সুষম বা সুসমঞ্জস আহার, কথাটি বহুল প্রচলিত। সংতুলিত আহারের অর্থ, —সেই আহার, যাতে সব তত্ত্বই সংতুলিত মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আহারশাস্ত্রবিদের এই অভিমত। যোগশাস্ত্রজ্ঞদের অভিমত কিন্তু ভিন্ন। তাঁদের মতে সংতুলিত আহার তাকেই বলা যায়, যাতে এই চারটি তত্ত্বই পাওয়া যায়—যথা, খাদ্য, তেল, বায়ু আর প্রকাশ অর্থাৎ সূর্যের তাপ। শরীরশাস্ত্রীরা যে সংতুলিত আহারের কথা বলেন তার পরিধির মধ্যে আছে শুধু খাদ্য আর তেল, অর্থাৎ চারটি তত্ত্বের মধ্যে তাতে আছে প্রথম দুটি তত্ত্ব, কিন্তু শেষ দুটি তত্ত্ব নেই। আমি বলব সেই আহার সংতুলিত হতে পারে না, যাতে বায়ু আর প্রকাশের (রৌদ্রের) কোন স্থান নেই। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, খাদ্য আর তেলেই তো ক্ষুধার উপশম হয়, জঠরাগ্নি শান্ত হয়, তবে বায়ু আর রৌদ্রের প্রয়োজন কি? ওগুলি দিয়ে কি পেট ভরবে? আর যদি ওগুলিতেই পেট ভরে, তবে তো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, আজকের সব অভাবই মিটে গেল। কথাটা ঠিকই বটে। আমি এমন বলব না যে, আপনারা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করুন ওগুলিতে পেট ভরে। তবে আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আমার সব কথা শোনার পরে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এগুলিতেও পেট সত্যিই ভরে।

আমি প্রথমে রৌদ্রের কথা বলছি। রৌদ্র বা প্রকাশ আমরা

সূর্যের কাছ থেকে পাই। আমাদের শরীরের ভিটামিন 'ডি'-র বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই ভিটামিন 'ডি' সূর্যের রশ্মি থেকে যত ভালভাবে পাওয়া যায় অন্য কোন উৎস থেকে তত ভালভাবে পাওয়া যায় না। আমাদের শরীরের চামড়ার আশপাশে এমন এক দ্রব্য থাকে যার ওপরে সূর্যের রশ্মি পড়লেই ভিটামিন 'ডি' স্বতই উৎপন্ন হয়। সূর্যের রশ্মি ভিটামিন 'ডি'-র পূর্তি করে। শরীরের ওপর পতিত সূর্যের রশ্মি ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসেরও পূর্তি করে। এই দুটি দ্রব্যই শরীরের পক্ষে আবশ্যক। প্রাকৃতিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই অভিমত যে, মানুষের প্রতিদিন কিছু সময় জঙ্গলে গিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে থাকা উচিত, নগ্ন হয়ে ঘোরা উচিত ও সূর্যের তাপ সেবন করা উচিত। এতে শরীরের অনেক অভাব পূর্ণ হয়। সাধনার ক্রম অনুসারে নগ্নতার স্থান ছিল, নগ্নতা অনাবশ্যক ছিল না বা মূর্খতার পরিচায়ক ছিল না। নগ্নতা খুবই আবশ্যক ছিল, এবং অনেক বিচার-বিবেচনা করেই তার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। শারীরিক আর মানসিক সাধনার দিক থেকে নগ্ন থাকায় যে লাভ হতো, সবস্ত্র থাকায় সে লাভ হতো না। উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে, নগ্নতা (প্রতিরূপতা) থেকে লঘুতা হয়, লঘুতা থেকে অপ্রমাদ, জিতেন্দ্রিয়তা, বিপুলতপঃ প্রভৃতি লাভ হয়।

এখন শারীরিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করি। নির্বস্ত্র থাকলে সূর্যকিরণ আমার সারা শরীরে পড়তে পারে। ঐ রৌদ্র আমার আহারের পূর্তি করে। বিজ্ঞানেরও এই অভিমত। রৌদ্র খাদ্যের পূরক তত্ত্ব। যে ব্যক্তি আতাপনা নেয়, রৌদ্র সেবন করে, তার আহারের মাত্রাও কমে যায়। আতাপনা সম্বন্ধে যত তথ্য জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায় অন্যত্র তা পাওয়া যায় না। ঐ সাহিত্যে বলা হয়েছে, যে আতাপনা নেয় তার আহারের মাত্রা—আহারের আবশ্যকতা কমে যায়। সে অধিক ভোজন করতেই পারে না, কারণ তার আহারের অনেক আবশ্যকতাই রৌদ্র থেকে মিটে যায়। আতাপনার

মূল্য কত, আতাপনার মূল্য কত গুরুত্বপূর্ণ. তা আমরা ভুলেই গিয়েছি। আজকের আহারশাস্ত্রবিদেরাও স্বীকার করেন. যে ব্যক্তি রৌদ্র ও বায়ু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে. সে জেনেশুনে বিপদ ডেকে আনে। তাঁরা বলেন—জঙ্গলে চলে যাও, সমস্ত কাপড় ফেলে দাও, নেংটি রাখারও প্রয়োজন নেই। মাটির ওপর শুয়ে পড়, শরীর যদি রৌদ্রে জ্বলে যায়, জ্বলতে দাও—কোন ক্ষতি হবে না। যদি জ্বলন থেকে বাঁচতে চাও তো শরীরের ওপর একটা পাতলা কাপড়ের আবরণ রাখ। এই হল আতাপনার ক্রিয়া। একে হঠযোগের ক্রিয়া মনে করা মূর্খতা। এটা জীবনধারণের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া।

এখন আমি বায়ু সম্বন্ধে বিচার করব আমরা যা খাই. তাতে প্রাণবায়ুর যোগ না থাকলে তার মূল্য কম হয়ে যায়। যে পুরোমাত্রায় প্রাণবায়ু নেয় না, তার বেশি মাত্রায় আহার নেওয়ার আবশ্যক হয়। যে পুরোমাত্রায় প্রাণবায়ু গ্রহণ করে. তার আহারের মাত্রা কমে যায়।

যদি এই বিষয় সম্বন্ধে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারি যে. আমাদের শরীরে প্রধানত চারটি তত্ত্ব আছে—পৃথ্বী, জল. অগ্নি আর বায়ু। শরীরের এই চারটিরই প্রয়োজন আছে। এগুলি ঠিকমত যোগাতে হবে। খনিজ দ্রব্যের রূপে পৃথ্বীতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। আমাদের শরীরের জন্য লৌহ আবশ্যক. সীসা আবশ্যক. রৌপ্য আবশ্যক, স্বর্ণ আবশ্যক—অনেক ধাতুই আবশ্যক। আমরা দুধ পান করি—দুধের মধ্যে অভ্র আছে। আমরা জিরা খাই—জিরার মধ্যে লৌহ আছে। মাতৃদুগ্ধে উৎকৃষ্ট রৌপ্য থাকে। আমরা শাকসব্জি খাই, তাতে অনেক মূল্যবান খনিজ থাকে। মানুষ স্বর্ণভস্ম. রজতভস্ম. লৌহ ভস্ম ইত্যাদি ঔষধ রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ উপযোগী হয় না. তার বেশিরভাগই বৃথা চলে যায়। সেজন্য বলা হয়. প্রয়োজনীয় খনিজগুলি ভস্মরূপে না নিয়ে স্বাভাবিক আহার থেকে নেওয়ার চেষ্টা কর। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এসেছে। যেমন খনি থেকে পাওয়া খনিজ আমাদের দেহের সঙ্গে একরস হয় না, তেমনি গাছপালা

থেকে পাওয়া খনিজও পুরোপুরি একরস হয় না। এর থেকে যদি আমরা মানসিক আহার রূপে, কেবল মানসিক সংকল্পের দ্বারা, কোন দ্রব্য বিকশিত করে নিতে পারি, তবে তা সহজেই আমাদের সঙ্গে একরস হয়ে যায়। এই তথ্য প্রয়োগ করে দেখতে হয়, তবে প্রয়োগ দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হতে পারে। মনোভঙ্গী আহারের ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই সূক্ষ্ম। তবে সংকল্পের দ্বারা বিকশিত করার শক্তি অর্জন করতে পারলে আমরা মন থেকেই অনেক তত্ত্বের পূরণ করতে পারি। মনের দ্বারা পূরণ করা যদি কঠিন হয়, তবে আমরা সহজতর পথে বায়ুর দ্বারা পূর্তি করার চেষ্টা করব।

ভগবতী সূত্রে বলা হয়েছে, মানুষ ছয় দিক থেকে আহার গ্রহণ করে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ্ব আর অধঃ—এই ছয় দিক থেকেই মানুষ আহার পায়। আজ একথা কেবল পাঠের বিষয়রূপে গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ আছে। অনুসন্ধান আর চর্চার অভাবে আমরা এ কথার অর্থ আজ বুঝতে পারি না। কেন, আমরা কি পায়ের দিক থেকেও আহার সংগ্রহ করি না? নিশ্চয়ই করি। বলা হয়েছে—যখন হেঁটে বেড়াবে, খালি পায়ে হাঁট। আবার সড়ক দিয়ে হেঁট না, মাটির ওপর হাঁট। যদি সড়ক—বিশেষত পাকা সড়ক—আর জুতো দিয়ে ব্যবধান রচনা কর, তবে পৃথ্বী থেকে সাক্ষাৎ যে আহার মেলে, তা আর পাবে না। খালি পায়ে মাটির ওপর ঘুরে বেড়ালে পৃথ্বী থেকে সমস্ত তত্ত্ব টেনে নেওয়া যায়। আমরা নিজেদের মাথাকেও কাজে লাগাতে পারি। সৌর মণ্ডল থেকে প্রাণশক্তির উত্তেজক যে তত্ত্বটি বিকীর্ণ হচ্ছে তা আমরা মাথা দিয়ে দেহের মধ্যে টেনে নিতে পারি। এর থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, কোন্ কোন্ দিকে মাথা রেখে শুলে কি কি লাভ হয়—এই সম্বন্ধে যে তথ্য প্রচলিত আছে, তার মধ্যেও সারবত্তা আছে। এতদিন তো আমরা এই তথ্যকে কেবল লোক-প্রসিদ্ধি বা অন্ধানুকরণ বলে মনে করেছি। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরে এই তথ্য সত্য বলে নির্ণীত হয়েছে। ফরাসী ডাক্তার শোয়ার খাটের মাথার

দিক পরিবর্তন করে অনেক রোগীর চিকিৎসা করেছেন এবং এই পদ্ধতিতে রোগমুক্তি করতে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন। এর বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। সৌরমণ্ডল থেকে যে প্রবাহ আসছে তা আমার মাথাকে আকর্ষণ করে ও নিজের দিকে টেনে নেয়। যে প্রবাহের দিকে মাথা থাকে, সেই প্রবাহের তত্ত্বই মাথার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এজন্য এই পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

আহারের অর্থ কেবল খাওয়াই নয়। প্রকৃত অর্থ নেওয়া, টেনে নেওয়া, আহরণ করে নেওয়া। মুখ দিয়ে, পা দিয়ে, নাক দিয়ে, মাথা দিয়ে, পা দিয়ে, চাই কি সারা শরীর দিয়ে আমরা যা কিছু বাইরে থেকে গ্রহণ করছি, তা সবই আহার।

এভাবে আমরা ওপর থেকে, নিচ থেকে, আশপাশ থেকে, ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে আহার নিয়ে থাকি। আমরা সব দিক থেকেই, সব বিদিক থেকেই, আহার নিয়ে থাকি। বায়ুর আহার আমরা বায়ুর মাধ্যমেই পাই। বায়ু থেকে লভ্য আহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখব যে, গাছপালা আহার করে আমরা যে তত্ত্ব সংগ্রহ করি কেবল বায়ুর থেকেই তা আমরা লাভ করতে পারি। কারণ বায়ুমণ্ডলে সব তত্ত্বের পরমাণুই জমা আছে।

আরও দুটি বিষয় আছে। বিষয় দুটি অবশ্য সংতুলিত আহারের শ্রেণীতে পড়ে না, কিন্তু ঐ আহারের পরিপূরক হিসেবে তাদের উল্লেখ করা আবশ্যক। বিষয় দুটি—উপবাস আর মানসিক প্রসন্নতা। এদের বাদ দিলে, আহার অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। আপনারা আহার করবেন অথচ উপবাস করবেন না, অনাহারে থাকা অভ্যাস করবেন না—সে ক্ষেত্রে আহার কষ্টের কারণ হতে পারে, জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা আহার করলাম ক্ষুধার সমস্যা সমাধান করার জন্য, অথচ সেই আহার থেকে অনেক সমস্যার উৎপত্তি হল। যে লোক কেবল আহার করে, উপবাস করে না, সে উপবাসের মর্ম বুঝতে পারে না। ফলে সে আহারজনিত সমস্যার প্রতিকার করতে পারে না। প্রকৃত

তথ্য এই যে, আহারের সঙ্গে অনাহারের ও উপবাসের যোগ একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে উপবাসের অর্থ একেবারে না খাওয়াও হতে পারে, আবার আহারের মাত্রা কমিয়ে দেওয়াও হতে পারে।

আহারের সময় মনকে চিন্তামুক্ত রাখলে পাচন ক্রিয়া ভাল হয়। প্রসন্নতার অর্থ হর্ষ নয়। শোক যেমন একটা আবেশ, হর্ষও তেমনি এক আবেশ। প্রসন্নতা আবেশ নয়। প্রসন্নতা চিত্তের নির্মলতা। যেমন প্রসন্ন আকাশের অর্থ নির্মল আকাশ, মেঘ-মুক্ত আকাশ। যে চিত্ত হর্ষ, ভয়, শোক প্রভৃতি আবেশের দ্বারা আক্রান্ত নয়, সেই চিত্ত প্রসন্ন। সেই চিত্তের বৃত্তিগুলি শান্ত। যে আহার করছে, তাকে কেবল আহারের কাজেই মগ্ন থাকতে হয়। সে জন্য চিত্তের প্রসন্নতাও ভোজনের এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

১৭

ভাবনা

নদীর অপর তট সামনে। এক ব্যক্তি ঐ তটে যেতে চায়। নদী গভীর, অথচ সে সাঁতার জানে না। তাকে অবশ্যই নৌকোয় বসে অপর তটের দিকে যেতে হবে। অপর তটে যাওয়ার সাধন বা উপায় হল—নৌকো। নৌকো ছাড়া সেখানে পৌছনো যাবে না। আমরা যে তটে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সন্তুষ্ট বোধ করছি না। সামনে যে তট দেখতে পাচ্ছি সেখানে যেতে চাই। কিন্তু যাওয়া সহজ নয়, অনেক অসুবিধে আছে। নদী যেমন গভীর তাতে পায়ে হেঁটে আমরা ওপারে যেতে পারব না। আমাদের নৌকো চাই। সেই নৌকোই হল—ভাবনা। ভাবনার সাহায্য নিয়ে, ভাবনার নৌকোয় বসে, দূরে যে তট দেখা যাচ্ছে সেখানে পৌছব। এমন তটই থাকতে পারে না যেখানে ভাবনার নৌকোয় চড়ে পৌছনো যাবে না। এই হল ভাবনার প্রয়োজন, ভাবনার মহত্ব।

প্রশ্ন এই যে, ভাবনা কি? কোন বিচার বা চিন্তা বারবার মনে আলোড়ন করাই ভাবনা। ধ্যানের তিন অঙ্গ—ধারণা, ধ্যান আর সমাধি। এই হল মহর্ষি পতঞ্জলি-কৃত বিভাগ। আমরা বলি—ভাবনা, ধ্যান আর সমাধি। ধারণা আর ভাবনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ধারণার কাজ হল, মনকে কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা। বিষয়টি তখন ধ্যেয় হয়। ধারণা পুষ্ট হলে ধ্যান হয়ে যায়। ধ্যান পুষ্ট হলে সামাজিক সমাধি হযে যায। একই ধ্যানের—একই বিষয়ের—তিন রূপ হল : প্রথমে এক রূপ, মধ্যে আর এক রূপ ও শেষে আরও এক রূপ। এই হল ধারণা বা ভাবনার স্বরূপ। ভাবনাব অর্থ—সবিষয় ধ্যান। এটাই ভাবনার পাবিভাষিক নাম। যখনই আপনাদের মনে কোন বিষয় উপস্থিত হয, আপনাবা কোন বস্তুকে ধ্যেয় বলে নির্বাচন করে নেন, তখনই আপনারা সবিষয় ধ্যান করেন—আর তাকেই ভাবনা বলাও যায। ভাবনা, সবিষয় ধ্যান আর জপ—এগুলির মধ্যে কোন ভেদ নেই, তিনটিই এক। তবে, প্রত্যেকের উপযোগিতা বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্যের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। জপের অর্থ এই যে, যা জপ্য, যার জপ করা হচ্ছে—সেই জপ্য বস্তুর প্রতি জপকারী ব্যক্তিব তন্ময ও একাগ্র হযে যাওয়া। ভাবনার অর্থ—ভাব্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তন্ময ও একাগ্র হযে যাওযা। ধারণার অর্থও একই—যার ধারণা করা হচ্ছে তার প্রতি তন্ময ও একাগ্র হয়ে যাওযা। সবিষয় ধ্যানও তাই। বিষয়ের প্রতি বা ধ্যেযের প্রতি তন্ময ও একাগ্র হয়ে যাওযাই সবিষয় ধ্যান। জপ, ভাবনা, ধারণা আর সবিষয় ধ্যান—এই চারটি শব্দই একই পর্যায়ের। এদের মধ্যে তাৎপর্যের ভেদ নাই, আছে কেবল নামের ভেদ।

ভাবনা নৌকোর মত। ভগবান মহাবীর বলেছেন—যে ব্যক্তির আত্মা ভাবনা-যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হযেছে, সে যেন জলে নৌকো পেযেছে। যে যখনই চায় ওপাবে পৌছতে পারে। এখন, এই নৌকো কি করে ব্যবহার করা যায—এই প্রশ্ন থেকে যায়। ভাবনার দ্বারা ভাবিত হওযা আবশ্যক। আপনারা ভাবিত না হওযা পর্যন্ত সেই স্থিতিতে পৌছতে পারবেন না। আগমে 'ভাবিতাত্মা' শব্দটি ব্যবহার করা হযেছে। ভাবিতাত্মা হতে না পারলে লক্ষ্য বস্তুর প্রাপ্তি হয় না। ভাবিতাত্মা হলে পরে, যা হতে হবে তা-ই হওযা যায়।

এ সবই একাগ্রতার বিস্ময়জনক ফল। আমরা যা হতে চাই, তাই ঘটে যায়, মনকে যে রূপে বদলাতে চাই মন সেই রূপেই বদলায়। মন কেবল এক আকারের নয়, তার অসংখ্য পর্যায় আছে। মন ভিন্ন ভিন্ন আকারে বদলাতে পারে। আমরা যেমন চাই তেমন আকারই মন গ্রহণ করতে শুরু করে। এটা মনের নিজস্ব বিশেষত্ব। তন্ময়তা ও একাগ্রতার সঙ্গে আমরা যা ভাবনা করি তা অবশ্যই হতে থাকে। এ বিষয়ে কখনও অন্যথা হয় না। তবে, একাগ্রতা ও স্থিরতার প্রয়োজন। মন যখন বদলায় তখন সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বদলায়।

ফরাসী দেশে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আমেরিকার এক যুবক সেই দেশে এক পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেছিল। ঐ পরিবারের সঙ্গে তার গাঢ় সম্পর্ক হল। ঐ পরিবারে এক বয়স্কা কন্যা ছিল, তার সঙ্গে যুবকের প্রণয় হল। কিন্তু বিয়ের প্রশ্ন উঠলে যুবক বলল—'আমি তো এখনই বিয়ে করতে পারব না। যতদিন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারি ততদিন পত্নীর ভার বহন করতে পারব না। আমি আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে বিবাহ করব।' কন্যাটি এই কথা মেনে নিল। যুবক আমেরিকায় চলে গেল, যুবতী দেশেই রইল। কিন্তু যুবতীর মনে এক চিন্তা এল, 'পাঁচ-সাত বছর পরে যখন যুবক আমাকে বিয়ে করতে আসবে, তখন হয়ত আমার রূপ ও রঙ বিবর্ণ হয়ে যাবে, আমার যৌবনে ভাটা পড়বে। সে প্রতিদিন ভাবনা আরম্ভ করল। সে এক আয়নার সামনে দাঁড়াত আর চিন্তা করত—'আমি আজ যেমন আছি, তেমনি থাকব।' এই ভাবনায় সে তন্ময় হয়ে যেত। এইভাবে পনের বছর কেটে গেল। এদিকে যুবক নিজের পায়ে দাঁড়াল, তার আর্থিক অবস্থা ভাল হল। সে আত্মনির্ভর হয়ে গেল। তার মনে যুবতীর স্মৃতি অনুক্ষণ জাগ্রত ছিল। সে ফরাসী দেশে চলে এল। কিন্তু অন্য অনেক রকম চিন্তাও তার মনে এল। সে ভাবল, যুবতীর অবস্থা কেমন হবে? সে কেমন আছে? তার রূপ-যৌবনই

বা কেমন? যা হোক, সে যুবতীব সঙ্গে মিলিত হল। সে দেখল তার শবীরেব লাবণ্য, তাব সৌন্দর্য ও কমনীয়তা, পনের বছব আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। তিলমাত্র পার্থক্যও হয় নি। সে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হল। দুজনেই সুখী হল। এই হল ভাবনার আশ্চর্যজনক ক্ষমতার এক উদাহরণ।

একেই ভাবনা-যোগ বলে। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভাবনায় নিজেকে ভাবিত কবে, সে সেই প্রকারেই পরিবর্তিত হযে যায। ভাবনার এই রকম কত প্রয়োগই যে পৃথিবীতে হয়ে থাকে, তা কে জানে। জৈন পবম্পরায় ভাবনা-যোগকে বিশেষ মহত্ত্ব দেওয়া হযেছে। আপনারা তাব আধ্যাত্মিক মূল্য দেবেন কি না দেবেন আপনারাই জানেন, কিন্তু এই তথ্য স্পষ্ট যে ভাবনাকে আশ্রয় কবে মানুষ নিজেকে গড়তে ও ভাঙ্গতে পাবে।

জাপানের ধ্যান সম্প্রদায় (জেন সম্প্রদায) ভাবনার অনেক রকম প্রয়োগ করে। তাদেব কেউ হযতো আখডায নেমে ভযঙ্কব নিষ্ঠুর ষাঁড়েব সঙ্গে লডাই কবে। সে খালি হাতে আখড়ায় নামে। তার কাছে কোন অস্ত্রই থাকে না, লাঠি পর্যন্ত থাকে না। ষাঁড় দৌড়ে সামনে এসে যায। সে তাকে লাল নিশান দেখায়। লাল কাপড় দেখলেই ষাঁড় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হযে যায। সে তখন অতি বেগে তার দিকে ছুটে যায় ও তাকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ কবে। কিন্তু নিতান্ত কৃশকায সাধকও ভাবনা ও সংকল্পের শক্তিতে সেই ষাঁড়কে পবাস্ত করে মাটিতে আছাড় দিযে ফেলে দেয়। তার ভাবনাব রূপ হয় এ রকম—'আমি ষাঁড়ের সঙ্গে লডব। আমি নিশ্চযই ষাঁড়কে পবাস্ত করব।' এই ভাবনার সাহায্যে সে এমন শক্তি অর্জন কবে যে, সে ঐ ভযঙ্কর, উত্তেজিত আক্রমণকারী ষাঁড়কে শান্ত করে দেয়, যেন তাকে ছাগল বানিযে দেয। ভাবনার এ রকম প্রযোগ আজও হযে থাকে। কেবল অতীতেই হযত হতো, একথা ঠিক নয। আজও কিছু লোক এ রকম প্রয়োগ করে থাকে।

এক মঠ ছিল। সেই মঠে ছোট বড় অনেক সাধক সাধনার অভ্যাস করত। সেখানে এক মল্লযুদ্ধের (কুস্তির) আয়োজন করা হল। দুই পালোয়ানকে আমন্ত্রণ করা হল। তাদের একজন ছিল পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, অপর জন কম শক্তিশালী। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। বলিষ্ঠ পালোয়ান কম-জোরী পালোয়ানকে চিৎ করে দিল। সাধকদের মনে এক চিন্তার উদয় হল। তারা দুর্বল পালোয়ানকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করল। কয়জন সাধক চোখ বন্ধ করে এই ভাবনায় তন্ময় হয়ে গেল যে, এই পালোয়ানের জয় চাই। কিছু সময় গেল। সকলে দেখতে পেল, দুর্বল পালোয়ান বলিষ্ঠ পালোয়ানকে মাটিতে ফেলে দিল ও তার বুকে চেপে বসল।

ভাবনা অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, অন্য ব্যক্তির ওপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অপরের বিপদের শান্তি আনা ও রোগের প্রতিকার করা, অপরের হৃদয়ের পরিবর্তন করা বা চিন্তাধারার পরিবর্তন করা—এ সবই ভাবনার প্রয়োগ। ভাবনার দ্বারা এ সবই করা যায়। ভাবনার মাধ্যমে নিজের পরিবর্তন, অন্যের পরিবর্তন, আশপাশের ব্যক্তির পরিবর্তন, এমন কি সমস্ত বাতাবরণের পরিবর্তন করা সম্ভব। এক ব্যক্তির শরীর দুর্বল, তার শরীর সুস্থ করার জন্য ভাবনা করা যায়। এক ব্যক্তির মস্তিষ্ক দুর্বল, তার মস্তিষ্ক সবল করার জন্য ভাবনা করা যায়। এক ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষীণ, হৃদয় দুর্বল, চিন্তা অপবিত্র—তার সব কিছু সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য ভাবনা করা যায়। অসংখ্য প্রকারের ভাবনা হতে পারে। আজকের চিকিৎসকরা—বিশেষত জার্মান দেশের চিকিৎসকরা—রোগীকে ঔষধ না দিয়ে 'অটো সাজেসন' (Auto suggestion) দ্বারা আরোগ্য করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন—'জঙ্গলে চলে যাও। সেখানে এক গাছের নিচে বসে সমাধিস্থ হয়ে যাও, আর নিজেকে বোঝাও—আমি সুস্থ আছি, আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি।' এই চিকিৎসকরা মনে করেন, এই পদ্ধতিতে রোগী রোগমুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

এ সবই সামান্য কথা। যখন আমরা সাধনার দৃষ্টিতে বিচার করি তখন আমরা বুঝতে পারি যে, কি প্রকার ভাবনা আমাদের করতে হবে —তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

জৈন পরম্পরায় ভাবনা সম্বন্ধে অনেক বিচার করা হয়েছে। সব ধর্মেই ভাবনা সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে, তবে জৈন সাহিত্যে এই বিষয়ের উল্লেখ অনেক বেশি। ভাবনা প্রধানত এই চার প্রকারের—

১। জ্ঞান ভাবনা।

২। চারিত্র ভাবনা।

৩। তপ ভাবনা।

৪। বৈরাগ্য ভাবনা।

যে ব্যক্তি সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, তাকে সবার আগে জ্ঞান ভাবনার দ্বারা নিজেকে ভাবিত করতে হয়। ভাবনার অর্থ বিচার বা চিন্তার পুনরাবৃত্তি নয়, বিচারের স্থাপন ও দৃঢ়ীকরণই ভাবনার অর্থ। অভ্যাসকালে বিচারকে পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করতে হয়। বিচারের পুনরাবৃত্তি আর বিচারের স্থিরীকরণ—এই দুটি ব্যাপারেরই আবশ্যকতা আছে। যদি আপনারা একই বিষয়ের বার বার আবৃত্তি করেন, তবে তা ভাবনায় পরিণত হয়। আপনি তার দ্বারা ভাবিত হবেন, আর ঠিক তদনুসারে কাজ করবেন। এক ব্যক্তি দিনে দশ-পনরো বার দরজা খোলে আর বন্ধ করে। ফলে সে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা ভাবিত হয়ে যায়, প্রভাবিত হয়ে যায়। যখনই সে ঘরে প্রবেশ করে তখনই—দরকার থাকুক বা না থাকুক—তার মন ঐ ক্রিয়ার দিকেই হয়। সে দরজা খুলুক বা না খুলুক, তার স্মৃতি কিন্তু ঐ ক্রিয়াতেই সংলগ্ন হয়। কারণ সে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা ভাবিত হয়েছে। দু ভাবেই ব্যক্তি প্রভাবিত হতে পারে, বিচার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, আবার কার্যের দ্বারাও প্রভাবিত হতে পারে। বিচার ও কার্যের পুনরাবৃত্তি—এই দুটি ভাবনার মূল।

প্রশ্ন উঠবে, ভাবনার দ্বারা আমরা কি করে আমাদের পরিবর্তন

করব? প্রক্রিয়া এই প্রকার—আপনার প্রথমে ধ্যেয় কি, তা নির্বাচন করুন। আপনারা স্থির করুন আপনারা কি হতে চান বা কি করতে চান। আপনারা কবি হতে চান, কি দার্শনিক হতে চান, কি লেখক হতে চান, কি সাহিত্যিক হতে চান—যা চান তাই হতে পারেন। যা আপনাদের হতে হবে তা-ই আপনাদের ধ্যেয়। এবার, যাকে ধ্যেয় করেছেন তাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আপনারা ভাবনা অভ্যাস করুন। প্রশ্ন করতে পারেন, অভ্যাস কখন করব, কেমন করে করব? আপনারা নির্জন স্থানে চলে যান। শরীরকে শিথিল করে বসুন, মনকেও শিথিল করুন। মনে কোন উত্তেজনা রাখবেন না, আকুল-ব্যাকুল হবেন না। এটা প্রারম্ভিক স্থিতি মাত্র, কিন্তু এটা প্রয়োজন। যা আপনারা ধ্যেয় বলে পছন্দ করেছেন তাকে স্থুল মন থেকে হটিয়ে অবচেতন মনে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আপনাদের 'হওয়ার' ভাবনা সফল হবে না। আপনারা বলতে পারেন—'ঐ রকম ভাবনা তো অনেক করেছি, কিন্তু সফল হই নি।' অসফলতার কারণ, আপনাদের কোথাও বোঝার ভুল হয়েছে। ভাবনার তাৎপর্য হল, চেতন মনকে ভুলিয়ে দিয়ে অবচেতন মনকে জাগ্রত করা। চেতন মনের চিন্তাকে অবচেতন মনের কাছে গচ্ছিত রেখে অবচেতন মনেই তাকে স্থাপন করে দেওয়া—এই হল ভাবনা, ভাবনার অভ্যাস। তা দিন আপনাদের কথা অবচেতন মন পর্যন্ত পৌঁছবে না, ততদিন হাজার-দশ হাজার বার প্রযত্ন করলেও, শব্দের আবৃত্তি করলেও, সফলতা মিলবে না। সফলতা লাভ করতে হলে আপনাদের শরীরকে বিসর্জন দিতে হবে, অর্থাৎ শরীরকে একেবারে শিথিল করে দিতে হবে ও চেতন মনকে শান্ত করতে হবে। তার পরে আপনারা ধ্যেয়ের আবৃত্তি করতে থাকুন—প্রথমে কিছুটা নিম্ন কণ্ঠে, পরে উচ্চ-কণ্ঠে আবৃত্তি করুন। এই ক্রম দশ মিনিট ধরে চলবে। তার চেয়ে কম সময়ে সফলতা অসম্ভব। প্রতিদিন এই ক্রম অনুসারে আবৃত্তি করুন। স্মরণ রাখবেন, কখনও

যেন ক্রমভঙ্গ না হয়। আপনারা ধ্যেযকে অনুসরণ করে আচরণ করুন। নিশ্চিতভাবেই আপনারা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। ক্ষেত্র বিশেষে সময় কম বা বেশি লাগতে পারে, কিন্তু লক্ষ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত। কোন ব্যক্তিই ভাবনা ছাড়া প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না, ধ্যানের উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে না। শারীরিক, বৌদ্ধিক, মানসিক প্রভৃতি সর্ববিধ বিকাশের ক্ষেত্রে ভাবনার সর্বাধিক মহত্ত্ব আছে।

যে কোন লক্ষ্য পূরণ করতেই অনেক রকম উপক্রম করতে হয়। মনে করুন, আমরা নির্মোহ হতে চাই। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আমাদের সব মোহজনক বস্তুকে ছাড়তে হবে। যে বস্তু মোহ উৎপন্ন করে, মনকে মূঢ় করে, তাকে সরিয়ে দিতে হবে। ধ্যেয়ের অর্থই হল ভাবনা।

২০

অধ্যাত্মের সাধনা

এক ব্যক্তি বিচারকের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'সত্য কি? ভ্রান্তিই বা কি?' বিচারক উত্তর দিলেন—'আমি যা বলি তাই ভ্রান্তি। তুমি যে তা মান না, সেটাই সত্য।'

আমরা সংসারে সত্য আর ভ্রান্তিব চক্রে পড়ে পাছি। ধর্মের সকল পথই সত্যকে খোঁজার জন্য। আদিকাল থেকে মানুষ সত্যের খোঁজ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তিও চলেছে। ঐ রকমই চলবে। ভ্রান্তি যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলত তবে ধর্মের আজ কোন অপেক্ষাই থাকত না। কিন্তু যেমন যেমন ধর্মের বিস্তার হয়েছে, তেমন তেমন ভ্রান্তিরও বিস্তার হয়েছে। সত্যকে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যেই আমরা ধর্ম আর অধ্যাত্মের চর্চা করি। মানুষ সোনার মূল্য করতে পারে, কিন্তু মাটির মূল্য করতে পারে না। কারণ মাটি এত সহজলভ্য যে প্রত্যেক ব্যক্তি তা অনায়াসে পেতে পারে। তবে প্রকৃত সত্য এই যে, সোনার তুলনায় মাটির মূল্য হাজার গুণ বেশি। সোনা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে, মাটি যে কত মৃত্যুপথযাত্রীকে রক্ষা করেছে তা কে জানে। তবুও মাটির মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, কারণ মাটি সহজেই সুলভ। আমরা রুটির মূল্যাঙ্কন করি, কারণ আমরা জানি

ক্রুটি আমাদের জীবন। পরন্তু যে প্রাণ সত্যই আমাদের জীবন তার মূল্যাঙ্কন আমবা কখনও কবি না। অথচ প্রাণই আমাদেব সকল স্বাস্থ্য। সাধনার পদ্ধতি মূল্যাঙ্কনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মতভেদেব প্রশ্ন থাকে সেখানে হাজাব সম্প্রদায় গড়ে ওঠে. লোকে বলে, এত সম্প্রদায় না থাকুক। আমি এই ভাবে চিন্তা করি যে, হাজার সম্প্রদায়ই হোক—প্রত্যেক ব্যক্তির একটা সম্প্রদায় হোক। কেবল অধ্যাত্মই এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে সম্প্রদায় ভেদ হয় না। সাধনা আর অধ্যাত্মের ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়-ভেদ নেই। সাধনার পথে সবচেয়ে বড় যোগ হল ধ্যান। ধ্যানের অর্থই নির্বিকল্পতা, যেখানে কোন বিকল্প নেই, বিবাদ নেই। এখানে মতবাদের প্রশ্নই ওঠে না। সাধনাব মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কান বন্ধ হয়ে যায়, চোখ বন্ধ হয়ে যায—সে ক্ষেত্রে বিবাদেব প্রশ্ন উঠবে কি কবে? আমাদেব যে নৈতিকতার পুঁজি আছে তাব প্রকৃত পশ্চাৎপট—অধ্যাত্ম। অধ্যাত্মের আধাবেই নৈতিকতা বিকশিত হতে পারে। আজ আমাদের সমস্ত ধ্যানই শরীব-কেন্দ্রিত হযে গিয়েছে। মন কিন্তু মূল। অথচ সেই মনকে আমরা উপেক্ষা করে চলেছি। মনই সেই তত্ত্ব, যা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

একদিন মহাত্মা বুদ্ধ ভ্রমণ করছিলেন। সঙ্গে এক শিষ্য ছিল। সে প্রশ্ন করল—'ভন্তে! ধ্যানেব শক্তি কি, আমি জানতে ইচ্ছা করি।' বুদ্ধ শুনলেন. কিন্তু উত্তর দিলেন না। পথে এক কুয়ো পড়ল। এক পিপাসার্ত পথিক সেখানে এল। কুয়োর পাশে দড়ি-বাঁধা এক বালতি ছিল। পথিক বালতিটি কুয়োয নামিয়ে দড়ি টেনে তুলল। বালতি ওপবে চলে এল, কিন্তু বালতিতে জল ছিল না, ওটা ছিল খালি। পথিক আবার বালতি কুয়োয় নামাল, টেনে তুলল। কিন্তু এবাবেও দেখা গেল বালতি খালি। পথিকেব পিপাসার জল জুটল না। আসলে বালতির নিচে ছিদ্র ছিল, ফলে জলপূর্ণ বালতি ওপরে আসতে আসতেই খালি হয়ে যাচ্ছিল।

বুদ্ধ আরও এগিয়ে গেলেন। আবার এক কুয়ো দেখা গেল, তার পাশেও দড়ি-বাঁধা বালতি ছিল। এক পিপাসার্ত পথিক এল। বালতি দিয়ে জল টেনে তুলল। জল পান করল। তার পিপাসার শান্তি হল।

বুদ্ধ শিষ্যকে বললেন—'বৎস! তুমি জানতে চাও ধ্যানের শক্তি কি? ধ্যানের শক্তি এইভাবে বর্ণনা করা যায়—যে ব্যক্তি ধ্যান করে না, সে খালিই থেকে যায়, কখনও ভরে ওঠে না। তার ছিদ্র থেকে যায়। সে কখনও পূর্ণ হতে পারে না। যা কিছু তার ভেতরে আসে, তা সবই ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়। যে ধ্যান করে, তার ভেতরে যা প্রবেশ করে, তা হাজার গুণে বাড়ে।' এই হল ধ্যানের শক্তি—ধ্যানের মহত্ত্ব। আমার শরীরের, আমার মস্তিষ্কের কত শক্তিই না আছে। তাদের বিকাশ করার পথ—সাধনা। সাধনা ছাড়া তারা বিকশিত হয় না। সমস্ত সাধনার পথই শক্তি-বিকাশের পথ।

২১

ইন্দ্রিয় সংযম

এক কবি ছিলেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর বাস ছিল আমেরিকায। তাঁর নাম ছিল 'ইউন্‌কো'। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমল, আব দেখতে দেখতে মুষল-ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বৃষ্টির তেজ প্রবল ছিল। কবিকে থামতে হল। তাঁর কাছে এক স্বলিখিত ডাযেরি ছিল, যাতে তিনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কোন এক স্থানে যাওযা দরকার ছিল, অথচ বৃষ্টিতে ডাযেরি ভিজে যেতে পারে বলে তাঁর ভয় হল। পাশেই এক দোকান ছিল, এক বুড়ো দোকানদার সেখানে বসে ছিল। তিনি তার হাতে ডাযেরিটা দিযে বললেন—'দেখ, আমি তোমার কাছে এই ডায়েরি দিলাম। তুমি এটা ভাল করে রাখবে। কাল ফেবার পথে নিয়ে যাব। বৃষ্টি এসেছে। আমাব কাছে ছাতা পর্যন্ত নেই। ডাযেরিটা ভিজে যাবে, তাই তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সাবধানে রেখ।' দোকানদার ডাযেরিটা নিযে বেখে দিল।

পরের দিন কবি তাঁর ডায়েরি নেওযার জন্য দোকানে এলেন। তিনি দেখলেন দোকানদার ডাযেরি থেকে পাতা ছিঁডছে, আব তা দিযে গ্রাহকদের পুরিযা বেঁধে দিচ্ছে। অবাক হযে তিনি দোকানদাবকে বললেন, 'আরে! এ কি করছ? ডাযেবিটা এভাবে কেন নষ্ট করছ?'

বৃদ্ধ বলল—'ক্ষমা করুন, আমাব ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি বড় ভুলো স্বভাবের। আমার স্মরণই ছিল না এটা আপনাব ডায়েরি। তবে ব্যস্ত হবেন না। আমি এর ফালতু পাতাই ছিঁড়েছি। যে পাতাগুলি আপনি লিখে শেষ কবেছেন সেগুলিই ছিঁড়েছি। যে পাতাগুলি সাদা, যেগুলিতে কিছুই লেখা হয়নি, সে পাতাগুলি যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

দোকানদাব তাব নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই এ কথা বলছিল। সে এই ভেবেই তুষ্ট ছিল যে, সাদা পাতা একটাও ছেঁড়েনি। কবির মনে কি ভাব হল—কে কল্পনা করবে? কবির কাছে সাদা পাতার চেয়ে লেখা পাতার মূল্য অনেক বেশি ছিল। সেই পাতাগুলিতে তিনি অনেক নতুন কবিতা লিখেছিলেন। হয়ত সেই কবিতাগুলি এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে তাঁকে তা যশের শিখবে পৌঁছে দিতে পারত। তিনি খালি পাতা দিয়ে কি কববেন?

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারেও ঐ বকম ঘটনা ঘটছে। এক ইন্দ্রিয় হযত খালি পাতাব মতই আছে, আর এক ইন্দ্রিয় লেখা পাতার মত হযে গিয়েছে। কোনটিকে আমরা বেশি মূল্য দেব? আমাদের ইন্দ্রিয়েব সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা বয়ে চলে, তার থেকে ইন্দ্রিয়ের ওপব রাগের অঙ্কন পড়ে, দ্বেষেব অঙ্কনও পড়ে। ক্রমে অনন্ত অঙ্কন ইন্দ্রিযকে ছেয়ে ফেলে।

যে লোক ইন্দ্রিয সম্বন্ধে চিন্তা করে, জানার চেষ্টা কবে, পরম্পবাগত সংসাবকে লক্ষ্য করে বা ইন্দ্রিয়কে অধিক মর্যাদা দেয, সে ভাবে যত কিছু অঙ্কন পড়েছে, সবই বহুমূল্য। যদি তা শেষ হযে যায়, সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। অঙ্কন মুছে গেলে সবই মুছে যাবে। ইন্দ্রিয় যে সুখ এনে দেয়, সে সুখ যদি না থাকে, তবে কি-ই বা অবশিষ্ট বইল? এই শ্রেণীব লোক চায়, রাগ-দ্বেষের ধারায় এতকাল যা কিছু লিখিত হয়েছে, যা কিছু অঙ্কিত হয়েছে, তা চিবকালই অক্ষুণ্ণ থাকুক। এই এক দৃষ্টিকোণ বটে।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ পূর্বোক্ত দোকানদারের। তার বিচারে সাদা পাতাই কাজে লাগে, লেখা পাতা অকেজো। খালি পাতার মূল্য আছে, কারণ তার ওপর লেখা যেতে পারে। লেখা পাতার মূল্য নেই, কারণ সে পাতা ভরে লেখা তো হয়েই গিয়েছে, আর নতুন কিছু তো তাতে লেখা যাবে না। এটা কিন্তু এক মহত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ। অবশ্য কবির তা পক্ষে প্রিয় হবে না, ইন্দ্রিয়বাদীর কাছে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় হয় না। কিন্তু সাধকের পক্ষে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় ও মনোজ্ঞ। খালি পাতাই কার্যোপযোগী, অর্থাৎ পাতা খালিই রাখব, খালি করে নেব। তার ওপর কখনও কিছু লিখব না। তাকে খালি থাকতেই দেব। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ধারার সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা চলে, সেই রাগ-দ্বেষের ধারাকে রুদ্ধ করব, অবলুপ্ত করব। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তা হলে খালিই থাকবে। তার সঙ্গে রাগ-দ্বেষ জুড়ে দেব না, তার ওপর কোন অঙ্কনই পড়তে দেব না। একেই বলে ইন্দ্রিয়-সংযম।

দুটি মত আছে। মত দুটি সম্বন্ধে ভারতীয় যোগী ও সাধক-সম্প্রদায় বহুল আলোচনা করেছেন।

কোন কোন সাধক বলেন, ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিও না। চোখ দিয়ে দেখো না, চোখ বন্ধ রাখ। কান দিয়ে শুনো না, কানে তুলা কি কর্ক ঢুকিয়ে দাও। নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিও না, নাক বন্ধ করে রাখ। জিভ দিয়ে স্বাদ নিও না, সরস খাদ্য কখন গ্রহণ করো না—রসহীন, স্বাদহীন দ্রব্যই আহার কর—যাতে রস না আসে। কিন্তু সহজেই প্রশ্ন হয়, এসব কি সম্ভব? রাত্রি-দিন কি চোখ বুঁজে থাকা সম্ভব হয়? যার দেখার শক্তি আছে, দৃষ্টি আছে, সে যদি চোখকে কাজে না লাগায় তো পরিণতি কি হবে? শোনার জন্যই কান। কান বন্ধ করে রাখলাম, কিছুই শুনলাম না, তাতে কি বড় উপলব্ধি হবে? আর, কখনও কিছু শুনব না —এ রকম সম্ভবও নয়।

আর এক মত আছে। কোন কোন সাধক বলেন, ইন্দ্রিয়দের নিজ-নিজ কাজ আছে। তারা সেই কাজ করুক। চোখ, কান, নাক, জিভ

—প্রত্যেককে কাজে লাগাও। দেখ, শোন, ঘ্রাণ নাও, স্বাদ নাও, স্পর্শ কর—সব কিছুই কর। কিন্তু সেই সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা উপস্থিত হয়, তাকে তোমার ইন্দ্রিয়ের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দিও না। সেই ধারা যেন পৃথক ভাবেই চলে। তা হলে কোন বিপদ হবে না।

এই হল দুই মত। এক, বিষয়কে নিরোধ করা; আর এক, রাগ--দ্বেষকে নিরোধ করা। এক, ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে কোন কাজই না নেওয়া; আর এক, ইন্দ্রিয়ের কাজ থেকে কাজ নিয়েও তার সঙ্গে রাগ-দ্বেষকে যুক্ত হতে না দেওয়ার। মত দুটি ভিন্ন ভিন্ন। এখন চিন্তার বিষয়, সাধনার দৃষ্টিতে কোন্‌টি আদরণীয়? ইন্দ্রিয়ের কাজ না নেওয়াই ভাল, না রাগ-দ্বেষের সংযোগ বন্ধ করাই ভাল? কেউ বলবেন প্রথমটি ভাল, আবার কেউ বলবেন দ্বিতীয়টি ভাল। আমি কিন্তু বলতে পারব না প্রথমটি ভাল কি দ্বিতীয়টি ভাল। দুটিরই নিজ নিজ স্থান আছে, মহত্ত্ব আছে।

এক ঘটনা মনে আসছে। এক ব্যক্তি এক সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য কি ঘর ছাড়া নিতান্ত আবশ্যক?' সাধু উত্তর দিলেন—'ঘর ছাড়া মোটেই দরকার নয়। যদি আবশ্যক হতো তো জনক ঘরে থেকেই কি করে বিদেহ হলেন? আদর্শ গৃহে থেকে ভরত কি করে কৈবল্য প্রাপ্ত হলেন? ভগবান ঋষভের মাতা মরুদেবার কি করে মোক্ষ মিলল? মরুদেবা সাধ্বী হয়ে যান নি, ভরত গৃহত্যাগী হন নি, জনক রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হন নি। তবুও মরুদেবা মুক্ত হয়ে গেলেন, ভরত কেবলী হলেন, আর জনক বিদেহ হয়ে গেলেন।'

কিছু দিন পরে আর এক ব্যক্তি ঐ সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ! মোক্ষের জন্য ঘর-সংসার ছাড়া আবশ্যক নয় কি?' সাধু বললেন, 'খুবই আবশ্যক, নিতান্তই জরুরী। যদি সংসার ত্যাগ না করেও মোক্ষ মেলে, তবে শুকদেব যে রকম সন্ন্যাসী ছিলেন সে রকম সন্ন্যাসীর জন্ম হয় কি করে? জৈন, বৌদ্ধ, বৈদিক নির্বিশেষে আমাদের ভারতীয় পরম্পরায় হাজার হাজার সন্ন্যাসী হয়েছেন, মুনি হয়েছেন,

ভিক্ষু হয়েছেন, তাঁরা সন্ন্যাসী হলেন কেন? কেন তাঁবা ঘর ছেড়ে এসে সাধনা করছেন? মোক্ষ প্রাপ্তিব জন্য গৃহত্যাগ নিতান্ত আবশ্যক।'

একবার এই দুই ব্যক্তি কোন স্থানে একত্র হল। একজন বলল, 'মহাবাজ বলেছেন মোক্ষলাভ কবার জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক নয়।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'এ তুমি মিথ্যা বলছ। আমি ঐ সাধুকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন, মোক্ষ লাভ করার জন্য ঘর ছাডা নিতান্ত আবশ্যক।'

এই ভাবে দুজনেব মধ্যে বিবাদ হল। দুজনেই নিজেব বুদ্ধি-বিবেচনা মত সত্যিই বলছিল। যাক্, বিবাদ বেড়েই গেল, কোন সমাধান হল না। তখন তারা দুজনে সেই সাধুর কাছে গেল। তাঁকে, বলল 'মহাবাজ! আপনিই আমাদের মধ্যে লড়াই বাধিযে দিয়েছেন। আমবা আপনাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু আপনি উত্তর দিয়েছেন দুটি। আর ঐ উত্তব দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ। এব সমাধান কি?'

সাধু বললেন—'তোমরা দুজনেই বোকা। আমার অভিপ্রায বুঝতে পার নি।' তারপর প্রথম ব্যক্তিকে সম্বোধন কবে সাধু বললেন—'দেখ, ঘর ছাডার মত মনোবৃত্তি তোমার ছিল না। তুমি সত্যিই ঘর ছেড়ে সাধনা করতে চাও নি। সেজন্যই আমি বলেছিলাম, মোক্ষ লাভের জন্য ঘব ছাড়া আবশ্যক নয। তুমি ঘরে থেকেই সাধনা করতে পার। দ্বিতীয ব্যক্তির মনোবৃত্তি ঘর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিযেছিল, সেজন্য আমি তাকে বলেছিলাম, মোক্ষ লাভেব জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক। আমি তাকে কি করে বলব, তুমি ঘবেই থাক? তোমাব মনোভাবনা যে দিকে ছিল সেদিকেই আমি তোমাকে প্রেরিত করেছি। আর ওব মনোভাবনা যেদিকে ছিল সেদিকেই আমি ওকে প্রেরিত কবেছি। ওকে সে দিকেই যেতে বলেছি। এতে অসুবিধে কি হল?'

এই এক ঘটনা। আমরা সব ক্ষেত্রে বলতে পারব না যে ঘর ছাডাই ভাল, আবার এ ও বলতে পারব না যে ঘর না ছাড়াই ভাল। যার যেমন

যোগ্যতা, যেমন ক্ষমতা, যেমন প্রস্তুতি, যেমন মনোবৃত্তি, তাকে তদনুসারে তার পথেই চলতে দেওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলেন, চোখ বন্ধ করে বসে না থাকলে রূপের প্রতি যে আকর্ষণ আছে তা কখনও মিটবে না। রূপের প্রতি যে আসক্তি আছে তার এমনই নিবৃত্তি হবে না। সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই দু-চার ঘণ্টা চোখ বন্ধ করে বসে থাকা উচিত। কেবল এরকম করলেই চক্ষু-সংযম সম্ভব হতে পারে।

আবার কেউ কেউ বলেন—এটা দুর্বলতা, এটা ক্লীবতা। ববং আমাদের প্রযত্ন করতে হবে যে, রূপ দেখেও আমাদের মনে যেন আকর্ষণের উপপত্তি না হয়, বিকারের ভাব যেন না জাগে। চোখের কাজই দেখা। তবে, দেখার সঙ্গে আমরা রাগ-দ্বেষের চেতনা যেন না জুড়ে দিই, তা-ই হবে আমাদের সাধনা। আমাদের মনে যেন প্রিয়তা-অপ্রিয়তার ভাব, ভালমন্দের ভাব প্রবেশ না করে।

আমি বলি, প্রথমটি এক পথ, দ্বিতীয়টি আর এক পথ। দ্বিতীয়টি শ্রেষ্ঠ আর প্রথমটি অপকৃষ্ট, কিংবা প্রথমটি শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয়টি অপকৃষ্ট—এমন বলা যায় না। দুটিই পথ। যার যেমন রুচি সে তেমন পথে চলবে। এক পথ আর এক পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এমন কথার অর্থ হয় না। আসল কথা, ব্যক্তির রুচি, যোগ্যতা ও ক্ষমতা কি? দুটি পথই আছে, তার যে কোন একটিকে ধরে লক্ষ্যে পৌঁছনো যেতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তির এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয়ে থাকে যে, সে চোখ খোলা রাখলেও তার মনে প্রিয়-অপ্রিয় বা রাগ-দ্বেষের ভাব উদিত হয় না, তার পক্ষে চোখ বন্ধ রাখার কোন প্রয়োজনই হয় না। চোখ বন্ধ রাখা তারই পক্ষে প্রয়োজন যার এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয় নি, এবং ফলে যে মনে উদীয়মান প্রিয়তা-অপ্রিয়তার বা রাগ-দ্বেষের ভাবকে রোধ করতে অক্ষম।

মুখের ওপর পর্দা রাখার প্রথা আগে চলিত ছিল, এখনও আছে।

প্রশ্ন হতে পারে, পর্দা কে রাখবে—স্ত্রী না পুরুষ? এমন কথা নয় যে, স্ত্রী-ই পর্দা রাখবে, পুরুষ রাখবে না। পর্দা সে-ই রাখবে যার দৃষ্টি নির্বিকার নয়, যার দৃষ্টি সংযত নয়, তা সে স্ত্রীই হোক আর পুরুষ হোক। চোখ বন্ধ করে রাখা চোখের ওপর পর্দা রাখার মতই। ইচ্ছা হয় চোখ বন্ধ রাখা, ইচ্ছা হয় চোখের ওপর কাপড়ের আবরণ রাখা—দুই একই কথা। পর্দা আবরণ মাত্র। যার এমন ক্ষমতা হয়েছে যে, তার দৃষ্টিতে বিকার আসে না, রূপ-অরূপের প্রতি রাগ-দ্বেষ হয় না, তার ক্ষেত্রে পর্দার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তার চোখ বন্ধ করে সাধনা করার আবশ্যকতাও নেই।

এক পথ—ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধ। আর এক পথ—রাগ-দ্বেষের ধারা অবরোধ। এই দুটির সংযুক্ত নাম—ইন্দ্রিয়-প্রতিসংলীনতা। প্রতিসংলীনতার অর্থ—নিজের মধ্যেই লীন হয়ে যাওয়া। ইন্দ্রিয়-প্রতিসংলীনতা হল—চেতনার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের লীন হয়ে যাওয়া।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। আমরা জেনে রেখেছি—চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে কিন্তু ব্যাপার তা নয়। বাস্তবে ঐ রকম কোন ভাগ নেই। জ্ঞানের ধারা একই। তা ভাগে ভাগে বিভক্ত নয়। আমাদের ব্যবহারের সুবিধের জন্যই আমরা বিভাগ কল্পনা করে নিয়েছি।

জৈন পরম্পরায় চব্বিশ প্রকার 'লব্ধি'-র উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে এক লব্ধি হল—সংভিন্নস্রোতোলব্ধি। যে সাধক যোগীর এটা উপলব্ধ হয়ে যায়, যে সাধক সাধনার দ্বারা চেতনার বিকাশ অত্যুচ্চ স্তরে নিয়ে যান, সেই সাধক যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তিনি চোখ দিয়ে শুনতে পারেন, কান দিয়ে দেখতে পারেন—আঙ্গুল দিয়েও দেখতে পারেন, শুনতে পারেন। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের কাজের কোন বিভাজন নেই। যে কোন ইন্দ্রিয়ই সব ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এর থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানধারা এক ও অবিভাজ্য।

'সংভিন্নস্রোতোলব্ধি' কথাটিব শব্দার্থ হল—যে স্রোত আছে, তার সমস্তই ভিন্ন হয়ে যায়, খুলে যায়। ফলে এমন অবস্থা আব থাকে না যে, কান দিয়েই শুনতে হবে বা চোখ দিয়েই দেখতে হবে। তখন যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই শোনা যায় বা দেখা যায়।

আজ বিজ্ঞানেব দ্বারাও এই তত্ত্ব সম্ভব বলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেবল কানের দ্বারাই শুনতে হবে—এমন কোন বিধান নেই। কেবল অভ্যাসেব দ্বারাই আমরা এমন অবস্থায পৌঁছেছি, যেখানে কানের মাধ্যম ছাড়া আমরা শুনতেই সক্ষম হই না। তা না হলে, শোনার শক্তি হয়ত দাঁতেই অধিক পরিমাণে থাকত। আপনারা চোখ দিয়ে নয়, আঙ্গুল দিয়েই হয়ত দেখতে পাবতেন। রুশ দেশে রোজা কুলেশোবা নামে এক স্ত্রীলোক আছেন। তাঁর আঙ্গুলে অদ্ভুত ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে। চোখে পট্টি বেঁধে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যেই পুস্তক পডতে পারেন। আঙ্গুল পাতাব ওপর বোলান, আব পড়ে যান। যে কোন জিনিস তাঁর কাছে আনলে তিনি তার ওপব ডান হাতের আঙ্গুল ফেরান আর বলে দেন ঐ জিনিসের ওপব কি লেখা আছে বা কি ছাপানো আছে। তাঁব আঙ্গুল আয়নাব পিছনেও দেখতে পায। তিনি কোন বস্তুকে স্পর্শ না করেও তার পবিচয বলে দিতে পারেন। অবশ্য অন্ধও পুস্তক পড়ে, তবে সে উঁচু করে প্রস্তুত অক্ষরই পড়তে পারে। ঐ রকম অক্ষব পডার বিদ্যা আযত্ত কবার জন্য তাকে পূর্বে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সে সাধাবণ পুস্তক পডতে পারে না। কিন্তু ঐ রুশীয স্ত্রীলোক সাধারণ পুস্তকই আঙ্গুলের মাধ্যমে পড়তে পারেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এই যে বিভাজন—অমুক ইন্দ্রিয দিয়ে শুনতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয দিযে দেখতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে রসাস্বাদ করতে হবে, ইত্যাদি—তা আমাদের নিরন্তর অভ্যাসের কাবণেই হযেছে। কিন্তু এই বিভাগ যথার্থ নয়। যার চেতনা বিকশিত হযে যায় তার ক্ষেত্রে এই বিভাগ আর থাকে না।

আমরা দেখতে পাই, কোন ব্যক্তির মিষ্টান্নের প্রতি অনুরাগ আছে,

আবার কারও ঐ মিষ্টান্নের প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা আছে। কেউ কেউ এক বস্তু পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ অন্য বস্তু পছন্দ করে। কোন ব্যক্তির যদি এক বস্তুর প্রতি অনুরাগ থাকে তো অন্য ব্যক্তির ঐ বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি যেন রাগ-দ্বেষকে বণ্টন করে দিয়েছে। কিন্তু রাগ-দ্বেষ কি বণ্টন করা যায়, খণ্ড খণ্ড করা যায়? আমি বুঝি, এমন করা যায় না। রাগ-দ্বেষের একই ধারা। আমাদের চেতনার ধারাও এক। অনেক রকম পার্থক্যও যে দেখা যায়, তা কেবল অভ্যাসের কারণে, বাতাবরণের কারণে আর সংস্কারের কারণে। এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যে রকম অভ্যাস, বাতাবরণ আর সংস্কার গড়ে ওঠে, তাই সমস্ত বিভাগের বা পার্থক্যের সৃষ্টি করে।

কারও রসাস্বাদনের শক্তি প্রবল হয়, কারও শ্রবণশক্তি প্রবল হয়, আবার কারও দর্শনশক্তি প্রবল হয়। রাগ-দ্বেষের ধারা এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রুচির যে সৃষ্টি হয়, তার মূল কারণই সংস্কারের বিকাশ—বিভিন্ন সংস্কারের বিকাশ। আমরা কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করি, অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে যাই। এটা 'স্পেশালাইজেশনের' কথা। কোন ইন্দ্রিয়ের যদি কোন বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক হয়, তবে রাগ-দ্বেষের ধারা সেদিকেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে।

চাষের জন্য ক্ষেতে জল নেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়, তা আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। বড় খাল থেকে ছোট ছোট নালা কেটে সমস্ত ক্ষেতে জল নিয়ে যাওয়া হয়। যেসব নালা দিয়ে জল নেওয়ার আবশ্যকতা থাকে না, চাষী কখনও কখনও সেই সব নালার মুখ মাটির বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে। তখন জল আর সেসব বিভিন্ন নালা দিয়ে ছড়িয়ে না পড়ে এক দিকেই চলে। যে জল ভিন্ন ভিন্ন নালাতে বণ্টিত হয়ে প্রবাহিত ছিল, সেই জল এখন এক ধারাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির স্থিতি ঠিক এই রকম। রাগ-দ্বেষের ধারা সব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই চলছিল, এখন আমরা কতকগুলি

ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে সেই ধারাকে একই ইন্দ্রিয়ের দিকে প্রবাহিত করে দিলাম। এখন সমস্ত প্রবাহ পূর্ণবেগে এক দিকেই চলল। এবার আমাদের সংস্কার বলবান হতে আরম্ভ করল।

আমাদের সমস্ত শরীরে রক্তের সঞ্চার আছে, সমস্ত অবয়বেই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন শরীরের কোন এক বিন্দুতে ধ্যান কেন্দ্রিত করে সংকল্প করি যে ঐ বিন্দুতে রক্তের প্রবাহ অধিক হোক, তখন সত্যিই রক্তধারা সেখানে অধিক মাত্রায় প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। প্রাণধারা সেখানে প্রবাহিত হতে থাকবে। প্রাণধারার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারাও এসে যাবে। এই ভাবে যে দিকে আমার মন যাবে, সংকল্প যাবে, প্রাণধারাও সেদিকেই যাবে। রাগ-দ্বেষের ধারাও সেদিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। ফলে, সংস্কার বলবান ও পুষ্ট হতে থাকবে। রাগ-দ্বেষের ধারার মধ্যে কোন ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। চেতনার ধারার মধ্যেও ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। আমরা সংকল্পের দ্বারা ঐ ধারাকে গতি ও পুষ্টি দিয়ে ভেদের সৃষ্টি করি।

আমরা যদি ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করতে চাই তো ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধ আর রাগ-দ্বেষের ধারার নিরোধ—এই দুই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

সকলের ইন্দ্রিয়-অভ্যাস এক রকম নয়। কারও চক্ষু-ইন্দ্রিয় প্রবল। কারও শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় প্রবল, আবার কারও রসনা-ইন্দ্রিয় প্রবল। কারও ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় প্রবল হল তো অন্য কারও স্পর্শ-ইন্দ্রিয় প্রবল। ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করার পূর্বে ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে নির্ণয় করতে হবে, কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি—কোন বিষয়ের প্রতি—তার আসক্তি প্রবল। এইভাবে নির্ণয় করার পরে, তাকে নির্ণীত ইন্দ্রিয়কে সংযম করার পথে অগ্রসর হতে হবে। এই সংযম অভ্যাস এই ভাবে করতে হবে—যে ইন্দ্রিয়ের আসক্তি প্রবল, সেই ইন্দ্রিয়ের দিকে রাগ-দ্বেষের ধারাকে যেতে না দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। সর্বদা অবহিত থেকে নিরন্তর অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে। সাফল্য কতটা হচ্ছে, সে বিষয়ে সকালে

ও সন্ধ্যায আত্ম-নিরীক্ষণ কবতে হবে। এই যথেষ্ট। আর কিছু কবাব আবশ্যকতা হবে না। এতটা জাগবূকতা এসে গেলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ খুলে যাবে। কেবল সাধনার দৃষ্টিতে নয়, জীবনের দৃষ্টিতেও ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। স্বাস্থ্য, ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুর জন্যই ইন্দ্রিয়-সংযমেব প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে এমন উল্লেখ দেখা যায় যে, রাজাদেব পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম অত্যন্ত আবশ্যক। যে রাজা ইন্দ্রিয়-সংযমে অপটু, তাঁর পক্ষে যথার্থভাবে রাজ্যপালন সম্ভবই নয়। ইন্দ্রিয়-লোলুপ রাজা কি করে বৃহৎ সাম্রাজ্য চালনা কববেন? যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হল, তখন তখন হযত রাজা অন্তঃপুবে বিলাস-ব্যসনে ডুবে আছেন। তাহলে রাজ্য রক্ষা কেমন করে হবে? রাজার পক্ষে সংযত-ইন্দ্রিয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সমাজে যাঁরা প্রধান ব্যক্তি তাঁদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই আবশ্যক। যে অত্যধিক ইন্দ্রিয়-চর্চা কবে সে নিজেব জীবনই নষ্ট করে ফেলে। তিন রকম অবস্থা হতে পারে—যোগ, অযোগ আর অভিযোগ। মহর্ষি চরকের অভিমত, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিযের যোগ অর্থাৎ ব্যবহার না করে, ইন্দ্রিযের কাজ গ্রহণ না করে, তাব ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে যায়। ইন্দ্রিয তার কাজ কবা বন্ধ করে দেয়। আপনার চোখের ব্যবহাব বন্ধ যদি কবে দেন তো চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে। সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেই এই এক নিযম। আপনারা হাত ভাঁজ করে বাখুন, কিছু দিন পরে দেখবেন হাতকে আব সোজা করতে পারছেন না—তাব নমনীয়তা নষ্ট হযে গিয়েছে।

অযোগ বা অব্যবহারে যেমন শক্তি নষ্ট হয়, অতিযোগ বা অত্যধিক ব্যবহারে শক্তি তেমনই নষ্ট হয়। সেজন্য বলতে হয, 'যোগই' উত্তম পথ। ইন্দ্রিযের যথাযথ ব্যবহার হওয়া চাই। ইন্দ্রিযের কাজ গ্রহণ কবলাম, তারপরে বিশ্রাম করলাম। যতটা কাজ, ততটা বিশ্রাম। যতটা কাজ গ্রহণ করা দবকার ততটা কাজই গ্রহণ করলাম—তার অধিক বা অল্প নয়। এই হল যোগ। এটাই আয়ুর্বেদের অভিমত,

অর্থাৎ স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া অভিমত। এর তাৎপর্য এই যে, চোখের কাছ থেকে দেখাব কাজ নেওয়া চোখেব অসংযম নয়। কানের কাছ থেকে শোনার কাজ নেওযা কানেব অসংযম নয। অসংযম তখনই হয়, যখন এদেব সঙ্গে রাগ-দ্বেষ জুড়ে দেওয়া হয। ইন্দ্রিয সংযমের প্রকৃত অর্থ হল—আপনারা ইন্দ্রিয়েব মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করুন, কিন্তু সেই জ্ঞান যেন বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়—তাব সঙ্গে যেন আর কিছু জুডে না দেওযা হয। বিশুদ্ধ জলই যেন প্রবাহিত হয়, তার সঙ্গে যেন কোন আবর্জনা বা নোংরা জিনিষ যুক্ত না হয। একেই ইন্দ্রিয-সংযম বলে। জল প্রবাহিত হবে, না এক জায়গায পডে থাকবে—সেটা আমাদেব চিন্তার বিষয় নয। জল প্রবাহধারায় চলতে পাবে অথবা এক জায়গায় স্থিব থাকতে পারে। আমাদের কেবল এই চিন্তাই হবে, জলের সঙ্গে যেন আবর্জনাও না চলে, ধুলো-বালি যেন না মেশে। এই ব্যবস্থা করতে পারলেই যথেষ্ট হবে। এর জন্য যদি আমাদের কোন নালা বন্ধ কবে দিতে হয় তো তা বন্ধ করতে হবে। যদি কোন নালা ওপর থেকে ঢাকতে হয, যাতে কোন আবর্জনা বা নোংবা জিনিষ তাতে না ঢোকে, তবে তাই করতে হবে। মুল কথা—জল যেন পরিষ্কার থাকে, তার স্বচ্ছতা যেন নষ্ট না হয। এই হল ইন্দ্রিয-সংযম। যদি আমরা এই বিষযে সতর্ক থাকি যে, কোনক্রমেই যেন আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সঙ্গে বাগ-দ্বেষের ধারার সংযোগ না ঘটে, তাহলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ স্বতঃই প্রশস্ত হযে যাবে।

ইন্দ্রিয়-অসংযমেব ফল সঙ্গে সঙ্গেই মেলে। এক ব্যক্তি একদিন এত অধিক পরিমাণে ভোজন করল যে সেদিন সন্ধ্যায়, বা তাবপবে দুই-একদিন ধবে, তাব ভোজন করার প্রযোজনই রইল না। সে একবাবে গলা পর্যন্ত ভোজন কবল। তাব ফল সে তৎক্ষণাৎ পেল। পরিণামেব জন্য তাকে পরেব জন্ম পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হল না। প্রায়ই খবরের কাগজে পডা যায—অমুক শহরে একশ লোক মদ পান করে মারা গিয়েছে। ঐ মদ বিষাক্ত ছিল। তার ফল তখনই

ভুগতে হল। আমাদের সব হিসেব-নিকেশ বর্তমান কালেই হয়ে চলেছে।

আমাদের ভেতরে এমন এক 'কম্পিউটার' আছে যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব রাখে, গণনা করে। সমস্ত হিসেবই আমাদের ভেতরে হচ্ছে।

এক ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী। কিন্তু তার ধনী হওয়ার মূলে আছে কুটিল ও কপট প্রচেষ্টা। সে অন্যকে ঠকায়, ধাপ্পা দেয়, ভেজাল চালায়, চুরি করে। ধন তার হাতে স্তূপীকৃত হল। আমরা তাকে বহু মান দিলাম, কারণ সে ধনী। বাইরে থেকে তাকে খুবই প্রসন্ন দেখাবে। এবার তার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখুন। তাকে বড়ই দুঃখী বলে মনে হবে। তার আত্মা কাঁদছে। সংসারে তার অনেক ছিদ্র। তার ছেলে তার কথা শোনে না, তার স্ত্রী তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছে। দুশ্চিন্তায় তার প্রতি মুহূর্ত কাটছে। কুটিলতা কপটতার পরিণাম তাকে এখানেই ভোগ করতে হচ্ছে। তার ধন আছে, কিন্তু সুখ নেই, আত্মতোষ নেই, শান্তি নেই।

পরিণামের এই সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশ ভেতরে ভেতরে হয়েই চলেছে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখতে পাই না। ওটা স্বতঃ-চালিত ব্যবস্থা।

মার্কস বলেছেন, বাদ, প্রতিবাদ আর সমবাদ—এই তিনটি এক সঙ্গে চলে। বাদের সঙ্গেই প্রতিবাদের উৎপত্তি হয়। বাদ যে কোন পদ্ধতিতেই হোক—প্রতিবাদ অবশ্যই হবে। সংঘর্ষ অবশ্যই হবে। আমরা মনে করি, এই প্রতিবাদ বা সংঘর্ষ আজই উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। প্রতিবাদের উৎপত্তি সেই দিনই হয়েছিল, যেদিন বাদ উৎপন্ন হয়েছিল। শিশু যে দিন জন্মায়, যে ক্ষণ তাকে জন্ম দেয়, সেই দিন-ক্ষণ মৃত্যুর প্রারম্ভেরও সূচনা করে। শিশুর মৃত্যুর প্রারম্ভ হয়ে যায়। আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি ষাট বছর হয়ে মারা গিয়েছে, অমুক ব্যক্তি আশি বছরে পৌঁছে মারা গিয়েছে। তা কিন্তু ভুল। যে ব্যক্তি ষাট কি আশি বছর বেঁচে থাকতে পারে, সে কখনই মরতে পারে না। সে মৃত্যুর অতীত হয়ে যায়। যে শিশু নতুন জীবন পেয়ে

দু দিন না মরে বেঁচে থাকতে পারে, সে আর কখন মরে না; সে অমর হয়ে যায়। আসলে কিন্তু এ রকম হয় না। এই জগতে চিরকাল বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নেই। প্রাণী যে দিনে যে ক্ষণে জন্মায় সেই দিন সেই ক্ষণ থেকে মরতেও আরম্ভ করে। সে প্রতি ক্ষণেই মরে, তাই আমরা একদিন বলতে পারি—সে মরে গিয়েছে। একটা ঘড়া পড়ে আছে। আমরা একটা পাথর ছুঁড়ে মারলাম, ঘড়াটা ফেটে গেল। আমরা লাঠি দিয়ে ঘড়াকে আঘাত করলাম, ঘড়াটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমরা বললাম—'ঘড়াটা একটু আগেই অখণ্ড ছিল, এখন ফেটে গেল, ভেঙ্গে গেল।' সত্যিই কি ঘড়াটা এখনই ফেটে গেল? না, তা নয়। ঘড়াটা প্রতি ক্ষণেই ফাটছিল, তাই এখন ফেটে গেল। যখনই ঘড়াটা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যখনই ঘড়াটা বানানো হয়েছিল তখনই যদি সেটা না ফাটত, তবে পাথর বা লাঠির ঘায়ে কখনই সেটা ফাটত না। ঘড়া চিরস্থায়ী হয়ে যেত, কখনই বিনষ্ট হতো না। এই ভাবে পৃথিবীতে প্রত্যেক বাদের সঙ্গে প্রতিবাদ, প্রত্যেক জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, প্রত্যেক অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব, সংযুক্ত আছে।

বাদের প্রতিবাদ আসে, তারপরে আসে সমবাদ। সমবাদীর অর্থ হচ্ছে—পুষ্টি প্রদানকারী। সমবাদী পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনে, নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। একটি তথ্য এই যে, আমাদের ভেতরে যে ক্রিয়া হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। কোন ব্যক্তি উত্তম আহার করছে। সে ভাবছে, আজ অমৃত আহার করলাম। কিন্তু সেই অমৃতের সঙ্গে কি বিষের মাত্রাও নেই? অবশ্যই আছে। কেউ দুধকে অমৃত ভাবে, কেউ শাক-সবজিকে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেও অমৃতের সঙ্গে বিষের মাত্রা মিশ্রিত আছে। দুধে বিষ আছে, শাক-সবজিতেও বিষ আছে। এমন কোন খাদ্য নেই যা কেবলই অমৃত, বিষের সম্পর্কশূন্য। আবার এমন খাদ্যও নেই যা কেবলই বিষ, অমৃতের সম্পর্কশূন্য। অমৃত ও বিষ এক সঙ্গেই থাকে। যেখানেই জীবনের ক্রিয়া হয়, সেখানেই মরণের প্রতিক্রিয়া হয়। জন্ম যদি এক

ক্রিয়া হয় তো মৃত্যু তার প্রতিক্রিয়া। স্বাস্থ্যকে যদি ক্রিয়া বলা যায়, রোগকে বলতে হয় প্রতিক্রিয়া। উভয়কে আলাদা করা যায় না, তবে মাত্রা-ভেদ অনুসারে আমরা এদেব আলাদা-আলাদা করেই নিই। ধনী ব্যক্তিব ধনেব মাত্রা দেখে আমরা বলি, এ ব্যক্তি এত পাপ করেও এত উন্নতি করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা তাব অন্তরের অবস্থা দেখি, তার সুখ দেখি, তার শান্তি দেখি, তবে হয়ত বলব যে, সে লোকসানে ডুবে গিযেছে। ধন হয়েছে তো কি হযেছে? সে না পেযেছে শান্তি, না পেয়েছে সুখ, না পেয়েছে প্রসন্নতা। কাবণ, হিসেব যে এক সঙ্গেই চলছে। পরলোকের কথা ছেড়েই দিন। ক্রিযার প্রতিক্রিযা ইহলোকে, বর্তমান কালেই হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাব, পবিণাম প্রদান করার, হিসেব-নিকেশ নিষ্পন্ন করার যে অব্যর্থ 'কমপিউটার'—তা আমাদের ভেতরেই আছে। এর জন্য কোন বাহ্য সত্তাকে আমন্ত্রণ জানাবাব আবশ্যকতা নেই।

২২

অপ্রমাদ

এক লোক তার সারা দিনের করণীয় কাজ একটি কাগজে লিখে রাখত। একদিন সে তার নিয়ম অনুসারে সেই দিনের কাজ কাগজে লিখে রাখল। তারপব কাজের সময় যখন এল তখন সে কাগজখানি এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কাগজ আব খুঁজে পেল না। এমন সময তার এক বন্ধু সেখানে এল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ তুমি কি কবছ?' সে বলল, 'আমি মনে করতে পারছি না, এখন আমাব কোন্ কাজ করার কথা।' বন্ধু বলল, 'কেন, তুমি তো কাগজে লিখে রেখেছ। কাগজ উঠিয়ে দেখে নাও না।' সে বলল, 'কাগজটা যে কোথায় বেখেছি তা ভুলে গেছি। মনে করতে পারছি না। কাগজই তো খুঁজছি।'

কাজের কথা স্মবণ রাখার জন্য কাগজ, আবার কাগজের কথা স্মরণ বাখার জন্য তৃতীয় কোন মাধ্যম দরকার। ভুলো স্বভাব এমনই যে, কেবল কাগজে কাজ চলে না, সেই কাগজ সামলে রাখার ব্যবস্থাও দরকাব। এ তো বড় সমস্যা! কিন্তু কেন এমন হয? এমন হওযার কাবণ—প্রমাদ। প্রমাদেব অর্থ—বিস্মৃতি। 'কি', 'কি প্রকারে', 'কেন'—এসব কিছুর বোধ আমাদেব থাকে না। আমরা সবই ভুলে যাই।

জীবনে অপ্রমাদ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু না ভুললেও কাজ চলে না; ভোলাও আবশ্যক। মানুষ নেশা করে—মদ খায়, ভাঙ খায়। কিন্তু তার পরিণতি কি? মদ বা ভাঙ কোন সুস্বাদু পদার্থ নয়। তবুও মানুষ লোলুপ হয়ে তা সেবন করে। এর কারণ কি হতে পারে? যারা মদ খায় তারাও বলে, মদ খাওয়ার সময় মুখ বিকৃত হয়—মদের গন্ধ অসহ্য লাগে। খেতে সুস্বাদু নয়, অথচ আমাদের খেতেই হয়, না খেলে চলে না—এরও অবশ্য একটা কারণ আছে। সেই কারণ হল—মানুষ একলা থাকতে চায়। নেশা তাকে ভুলিয়ে দেয়।

আমাদের সামনে দুটি দিক আছে। এক দিক সম্পর্কের, আর এক দিক একাকীত্বের। ব্যক্তির সম্পর্ক হয় পরিবারের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, সমব্যবসায়ীদের সঙ্গে, সামাজিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সঙ্গে। গ্রামের সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। অনেক প্রয়োজনে, অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক শ্রেণী ও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক হয়। কেবল প্রাণীদের সঙ্গেই যে সম্পর্ক হয় তা নয়, শরীরের সঙ্গে, পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে, ঘর-বাড়ির সঙ্গে ও আরও অনেক বস্তুর সঙ্গেও সম্পর্ক হয়। যে ভাবে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ঠিক সে ভাবেই বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাবনার সঙ্গেও সম্পর্ক হয়। এ সবই সম্পর্ক। একদিকে ব্যক্তি একাকী, অপর দিকে তার এই প্রকার সম্পর্কের বহুলতা। সম্পর্ক চিন্তা উৎপন্ন করে। যত সম্পর্ক, তত চিন্তা। সম্পর্ক থেকে চিন্তা বাড়ে। চিন্তা বাড়লে মনে হয় দুঃখও বাড়ছে। বস্তুত, দুঃখ কি? আমি তো মনে করি, সম্পর্কই দুঃখ। দুঃখের অর্থই হল, কোন না কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক। সম্পর্ক হয়েছে কি দুঃখও হয়েছে, সম্পর্ক নেই তো দুঃখও নেই। সম্পর্ককে ছেড়ে দুঃখের কল্পনাও করা যায় না। এক ব্যক্তি শান্ত হয়ে অবস্থান করছে। তার মন শান্ত, চিন্তা-ভাবনাও শান্ত। হঠাৎ সে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল,

'যে তার প্রতি অনুকূল নয়, কিন্তু প্রতিকূল, যে তার অপ্রিয়, যে অতীতে তাকে ঠকিয়েছে বা অপমানিত করেছে। তাকে দেখা মাত্রই শান্ত ব্যক্তির শান্তি ভঙ্গ হল। তার মন ক্রোধে ভরে উঠল। সে অশান্ত হয়ে গেল, দুঃখী হয়ে গেল। তার এই দুঃখের হেতু কি? সম্পর্কই হেতু। দুঃখের অর্থই হল সম্পর্ক, আর সম্পর্কের অর্থই হল দুঃখ বা চিন্তা। কোন ব্যক্তি সব সময় চিন্তিত হয়ে থাকতে পারে না। যখন সে চিন্তিত থাকে তখন তার মনে অস্থিরতা আসে, ব্যাকুলতা আসে, উত্তেজনা আসে। এই অস্থিরতা, এই ব্যাকুলতা তাকে একলা হয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে বা বাধ্য করে—যেন তাকে বলে, 'তুমি একলা হয়ে যাও, তাহলে কোন চিন্তা থাকবে না, কোন ব্যাকুলতা থাকবে না।'

বোধ হয়, চিন্তামুক্তির জন্যই মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের প্রচলন হয়েছিল। লোকে চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, সম্পর্ককে ছিন্ন করার জন্য, দুঃখ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য নেশা করে, মাদক বস্তুর প্রয়োগ করে। যখনই কেউ মদ্য পান করে, তখনই সে একলা হয়ে যায়, তার সব সম্পর্ক টুটে যায়, বাইরের কোন বোধ আর থাকে না। সে অনুভব করতে আরম্ভ করে, সে একলা হয়ে গিয়েছে, আর এই একলা হওয়াতেই বড় সুখ। মদ্যপান করার মধ্যে সত্যিই কোন সুখ থাকতে পারে না। আসলে মদ্যপান একাকীত্বের একটা নিমিত্ত মাত্র। এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখই হল—একাকীত্ব। কিন্তু লোকে একলা হতে পারে না, কারণ সে এত সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে আর সেই সব সম্পর্কের দরুণ চিন্তা-সূত্রের জঙ্গল এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, সে নিজেকে আর আলগা করতে পারে না—পৃথক করে নিতে পারে না। তার এমন ক্ষমতা নেই যে সে ঝটকায় জাল ছিঁড়ে বের হতে পারে। সে তো ধ্যানের প্রয়োগ জানে না, সে যে ধ্যানের অভ্যাস করে নি। সে ধ্যানের দ্বারা আপনাকে একলা করার, সম্পর্ককে ছিন্ন করার, কৌশল আয়ত্ত করে নি; তাই সে মদিরা ও

অন্যান্য মাদক বস্তুর সাহায্য নিয়ে আপনার একাকীত্বের অনুভব করার চেষ্টা করে। লোকে মনোরঞ্জনের বিষয় পেলে রসবোধ করে, কিন্তু কেন? সে কেন সিনেমায় যায়, সার্কাস দেখে, নাট্যাভিনয় দেখে, বেড়াতে যায়, পিকনিক করে? এ সবেরই কিন্তু ঐ এক হেতু। সে ভাবে, সারাদিন তো অফিসের কাজে, কি দোকানে বসে কাটল— এখন চল, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়া যাক—চিন্তায় তো ডুবে আছি, চল, কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা যাক। সে এইভাবে সারা দিনের শ্রম ও সকল চিন্তাকে ভুলতে চায়, বিস্মৃত হতে চায়। তার এই চেষ্টার দ্বারা সে কিছু সময়ের জন্য সকল সম্পর্ক থেকে, ও সেই সঙ্গে সকল চিন্তা থেকে, মুক্ত হয়।

মানব সমাজের সব চেয়ে বড় সমস্যা, সম্পর্ক-জনিত চিন্তা। বাইরে থেকে যখন এত চিন্তা এসে জড়িয়ে ফেলে, তখন বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও তার উৎপত্তি আছে। তার উৎপত্তি স্থল—স্ব-বিস্মৃতি, অর্থাৎ নিজেকে নিজের ভুলে যাওয়া। যখন আপনি দ্বিতীয় কিছুর স্মরণ রাখতে থাকেন, তখন আপনি নিজেকে ভুলতে বাধ্য হন। আপনি নিজেকে না ভুললে অন্য কিছুর স্মৃতি রাখতে পারবেন না, আবার অন্য সব কিছুর স্মৃতি বিসর্জন না দিলে নিজের স্মৃতি রাখতে পারবেন না। নিজের বিস্মৃতি না ঘটলে পরের স্মৃতি থাকে না; আবার পরের বিস্মৃতি না হলে, নিজের স্মৃতি থাকে না। হয় আপনি নিজেকে ভুলবেন নয়তো পরকে ভুলবেন। হয় বাহ্য সম্পর্ককে কম করতে হবে, ছিঁড়ে ফেলতে হবে, নয়তো আপনার নিজের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককেই ছিঁড়তে হবে, নিজের সম্পর্ক-সূত্রকেই কাটতে হবে। এর অর্থ হল, আপনাতে আপনার যে একত্ব ছিল, আপনাতে আপনার একাকীত্বের যে অনুভব ছিল—তা ফেলে দিয়ে, সেখানে বাইরের সঙ্গে অজস্র সম্পর্ক যোজনা করা। এরই নাম—আত্ম-বিস্মৃতি। বাহ্য সম্পর্কই আত্ম-বিস্মৃতির কারণ। যে লোক দ্বিতীয় কিছু সম্বন্ধে জাগরূপ হয়, সাবধান হয়, সে নিজের সম্বন্ধে সুপ্তবৎ হয়ে যায়, অসাবধান হয়ে যায়।

সক্রেটিস প্রাচীন গ্রীসের এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। একদিন পথে যেতে তিনি সামনে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। সে ছিল এথেন্সের এক প্রসিদ্ধ মদ্যপ। সক্রেটিস দেখলেন সে ব্যক্তি নেশায় চুর হয়ে আছে, কোন মতে টলমল করতে করতে চলছে। তিনি তাকে বললেন, 'সামলে চল, খানাখন্দে পড়ে যাবে।' মদ্যপ সে কথা শুনল. সে তো নেশায় চুর হয়ে আছে। সে বলল, 'আরে মহাত্মা! আমাকে কি শেখাচ্ছ? টলমল করে চলছি তো কি হয়েছে? খানায় যদি পড়ি, তাতেই বা কি হয়েছে? কাপড় যদি নোংরা হয়—হলই বা, আবার ধুয়ে নেব। আমি মদ্যপ, আমি নেশাখোর—সারা শহর তা জানে। যা কিছু হোক, তার জন্য আমার চিন্তা নেই। কিন্তু তুমি মহাত্মা ব্যক্তি। তুমি সামলে চল। তুমি যদি টলতে টলতে খানায় পড়, তোমার একূল ওকূল দুকূল যাবে। খুব সামলে চল, যেন পা পিছলে না যায়। আমাকে আর কেন জ্ঞান দিতে যাচ্ছ?'

এই হল এক দার্শনিক আর এক মদ্যপের মধ্যে কথাবার্তা। মদ্যপ এক বড় রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছে, এক সার কথা শুনিয়েছে। তার তাৎপর্য হল—যে মদ্যপ, যে নিজেকে ভুলেছে, যে একাকীত্বের আশায় নেশা করেছে, সে যদি টলমল করে, তার পা যদি পিছলে যায়, তবে কোন ক্ষতি বা দুঃখের কারণ হয় না। কিন্তু যে সাধক, যে আপনাকে আপনার মধ্যে পাওয়ার জন্য সাধনা করছে, যে একাকীত্বের সাধনায় রত আছে, তাকে তার নিজের চিন্তা নিয়েই থাকতে হয়, পরের চিন্তা করতে হয় না। সে জন্য মদ্যপ সক্রেটিসকে বলেছিল—'তুমি নিজের চিন্তা কর, আমার চিন্তা ছেড়ে দাও। তুমি যদি পিছলে পড়, তোমার পবিত্রতা নষ্ট হবে, তা কখনও আর ফিরে পাবে না। তুমি আর নির্মল থাকবে না। তুমি আত্ম-বিস্মৃতির গর্তে পড়ে যাবে।'

এই যে আত্ম-স্মৃতির কথা, জাগরূকতা আর সাবধানতার কথা—এগুলি বাস্তবিক পক্ষে সাবধানতার মহান সূত্র। এগুলিই হল—অপ্রমাদ। আমি একলা আছি, এই বিচার-সূত্রকে আত্মসাৎ করে

নেওয়া খুবই বড় সাধনা। এই সূত্র যখন আত্মগত হবে, তখন ব্যক্তি সকল সংকট ও দুর্ভোগ পার হয়ে যাবে, সকল ঝঞ্ঝাট ও সমস্যার অতীত হয়ে যাবে। এই সব সমস্যা বৈয়ক্তিক, সামাজিক বা জাগতিক হতে পারে। যে ব্যক্তি আপনার মধ্যে আপনার একাকীত্ব অনুভব করে সে এই সব সমস্যাই পার হয়ে যায়। কিন্তু যার একাকীত্বের অনুভব নেই, সে আর এই সব সমস্যা পার হতে পারে না। আর যেহেতু সে সমস্যার পার পায় না, সেহেতু তার মদ চাই, ভাঙ চাই, বিড়ি-সিগারেট চাই, আরও নানা রকমের মাদক বস্তু চাই। এগুলি সবই তার কাছে বিস্মৃতির মাধ্যম। যে আপনা-আপনি একলা হওয়ার রহস্য অবগত হয় নি, উপায় উদ্ভাবন করতে পারে নি— সে এই সব বাহ্য সাধনাকেই নিজের করে নেয়। কিন্তু এই সব বাহ্য সাধন উপকারের বদলে অপকারই করে। এদের থেকে ক্ষতিই হয়।

অপ্রমাদ আত্ম-স্মৃতির এক শক্তিযুক্ত সাধনা। এর অর্থ হল— আপনাতে আপন একাকীত্বের অনুভব করার অভ্যাস। এটা সাধনার পরম সূত্র তো বটেই, ব্যবহারেরও এটা মহান সূত্র। এ ছাড়া ব্যবহারিক জীবন সুখী ও আনন্দময় হয় না। আপনি যতদিন আপনাতে আপন একাকীত্ব অনুভব করতে সমর্থ না হবেন ততদিন চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন না। আমি কথাটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। ধরুন, এক পরিবার আছে। সেই পরিবারে পিতা মনে করে, পুত্রের ওপর তার অধিকার আছে; স্বামী মনে করে, স্ত্রীর ওপর তার অধিকার আছে। সম্পর্ক আছে বলেই পিতা আপন দায়িত্ব বোধ করে, আর মনে করে পুত্রের ওপর তার অধিকার আছে। স্বামীর ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। কিন্তু যেখানে সম্পর্ক আছে, দায়িত্বের সেখানে চিন্তা নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে। এখন হয়েছে কি, পিতা একদিন বসে আছে, তার খুব পিপাসা হয়েছে, অথচ ছেলে জলের গেলাস হাতে নিয়ে আসে নি। আগের দিন যে সময়ে বাপকে জল খাইয়েছিল আজ সেই সময়ে জল নিয়ে আসে নি। পিতা অমনি ভাবতে আরম্ভ

করলেন, ছেলের আমার দিকে মন নেই। সে খাওয়ার জল আনল না? এই বকম চিন্তাই পিতাব মনে উৎপন্ন হল। কিন্তু কেন হল? ছেলের পক্ষে এটা কি খুবই জরুবী যে, সে জলেব গেলাস হাতে নিযে আসবে? আচ্ছা, জরুবীই বটে, কর্তব্য তো বটেই। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে সে ভুলে গিযেছে, ঠিক সমযে তার কথাটা মনে হয নি। পিতার পক্ষে কি নিতান্তই এটা দবকার যে সে এই ব্যাপাবটা নিয়ে এতটা ভাবতে থাকবে, নিজেকে এতটা দুঃখী বোধ করবে? সত্যিই তার এত চিন্তাতুর হওযার কোন প্রয়োজন নেই। তবুও সে চিন্তাতুর হয়, কারণ তার একাকীত্বের অনুভব নেই।

একাধিক স্তরে আমাদের জীবন চলে। তাদের এক স্তরে আমরা অনুভব করি, আমাদের পরিবারে অনেক সদস্য আছে—চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন সদস্য আছে। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা হতে পারে। আমরা যদি কেবল বাইরে থেকে মনে করি যে আমবা পঞ্চাশ জন, তবে সব ঠিকই আছে। কিন্তু যদি আমরা ভেতব থেকেও ভাবতে থাকি আমরা পঞ্চাশজন, আমরা একলা নই, তবে অনেক সমস্যাব উৎপত্তি হবে।

আমাদের অনুভূতি দুই স্তরেই হওয়া দরকার। এক ব্যবহাবের স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হয আমরা একলা নই, আমরা পঞ্চাশজন আছি। আর এক যথার্থতার স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হয় যে আমরা প্রত্যেকে একলা, আমাদেব আর কেউ নেই। যদি এই দুই অনুভূতি এক সঙ্গে চলে তবে কোন সমস্যা বা অসুবিধা হয় না। কিন্তু যখন আমাদের অনুভূতি একাঙ্গী হয, তখন প্রচুর সমস্যা দেখা দেয। যখন কোন ব্যক্তি ব্যবহাবেব স্তরের সঙ্গে যথার্থতার স্তবকে মিশিয়ে ফেলে, তখন বিপদ হয। যতক্ষণ সে জানে ব্যবহাবের দিক থেকে সে পঞ্চাশ, কিন্তু যথার্থতার দিক থেকে সে এক—সে একলা, ততক্ষণ কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু যখনই সে মনে করে যেহেতু ব্যবহারে সে পঞ্চাশ, সেহেতু যথার্থই সে পঞ্চাশ,

সে একলা নয়, তখনই নানা সমস্যা এসে যায়। আজ পিতা বৃদ্ধ হয়েছে, অর্থোপার্জনে অসমর্থ হয়েছে। পরিবারের যে স্বার্থ তার দ্বারা সাধিত হতো, তা বন্ধ হয়েছে। এমন অবস্থায় তার প্রতি পরিবারের লোকদের উপেক্ষা আসতে পারে। তারা তাঁর কথাকে আর তেমন গুরুত্ব দেয় না। তখন সে ভাবতে থাকে, 'আরে, এ কি ব্যাপার! বিশ বছর আগে আমার সারা পরিবার আমার ইশারায় চলত, আমি ভ্রূকুটি করলে সকলে ভয়ে কাঁপত, একবার ডাকলে সকলে আমার সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াত। আর আজ কেউ আমার কথা শোনে না। আদর করা দূরে থাকুক, ছোট-বড় সকলে আমাকে তিরস্কার করে, আমাকে উপেক্ষা করে।' এইসব ভেবে বৃদ্ধ দুঃখী হয়ে যায়, চিন্তাতুর হয়ে যায়। একদিকে তার বিশ বছর আগেকার স্মৃতি কাজ করছে, অন্য দিকে তার বর্তমান পরিস্থিতি। যখনই সে তার আগেকার পরিস্থিতি বর্তমানের সঙ্গে জুড়তে চেষ্টা করে, তখনই তার দুঃখের অবধি থাকে না। তার মনে হয়, 'এই কি বেঁচে থাকা? কি হয়ে গেল? দুনিয়াই বদলে গেল, না যুগ পালটে গেল?'

এটা আমার কল্পনামাত্র নয়। অনেক লোকেরই এই রকম পরিস্থিতি, এই রকম অনুভব। নিজের প্রমাদের জন্যই লোকে দুঃখী হয়। সে যদি যথার্থতার দিক থেকে প্রমাদী না হত, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সে দুঃখ বোধ করত না। তার প্রমাদ এই যে, যা কেবল ব্যবহারের বেলায় সত্য, তাকেই সে যথার্থ সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এই ভুলই তার দুঃখের কারণ হয়েছে। ব্যবহারের সত্য এই যে, পিতার প্রতি পুত্রের কি কথা, দূরের লোকও 'যে আজ্ঞা' বলে উপস্থিত হয়, আদেশ মানে, আদর দেখায়, চোখের ইশারায় ওঠে-বসে। যেমনি স্বার্থের বন্ধন টুটে যায়, তেমনি পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। সব কিছুই বদলে যায়। এখন আমাদের যদি স্পষ্ট অনুভূতি থাকত, জীবনের প্রতি অপ্রমত্ততা থাকত, জাগরূকতা থাকত, তবে আমরা স্পষ্টই অনুভব করতাম যে, আগে আমাদের যে ভূমিকা ছিল, সেখানে

আমরা অন্য অনেকের জন্য ছিলাম, আব সেজন্য তখনকার ব্যবহার ছিল এক রকম ; আর এখন আমাদের যে ভূমিকা, সেখানে আমবা অন্য কারও জন্য নয়, কেবল নিজের জন্য, সুতরাং এখনকার ব্যবহার হবে অন্য বকম। দুই ব্যবহারের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ হবে, আকাশ-পাতাল ফারাক হবে। এই যে আমরা মনে করছি 'এটা আমার'—এর মূলেই আছে আমাদের আত্মা সম্বন্ধে বিস্মৃতি। তুমি কি করে ভাবতে পার, এটা তোমার নিজস্ব ? কখনও নিজস্ব কিছু হয় না। বস্তুত এই বিপবীত অনুভূতি হওয়া চাই যে, আমি একলা, আমি কেবল আমিই, আমার কেউ নেই। এটাই যথার্থ, এটাই প্রকৃত সত্য। এই আমাব পবিবার, এই আমার পত্নী, এই আমার পুত্র, এই আমার ভাই, এই আমার মিত্র—এসবই আমাদের ব্যবহারের ভূমি। ব্যবহাবের ভূমিতেই ব্যবহাবের বোধ থাকে, ব্যবহারের অনুভূতি থাকে, সম্পর্কেব বোধ থাকে। কিন্তু যখন চরম ও পরম সত্যের প্রশ্ন ওঠে, তখনই অনুভূতি হয় যে প্রকৃতপক্ষে আমি একলা, আমার কেউ নেই, আমিও কারও নই। যদি কারও এই অনুভূতি তীব্র হয়, তবে তার বয়স ষাট হোক, সত্তর হোক, পরিবারের লোকেরা তাকে উপেক্ষা করুক—কোন কিছুতেই সে আর দুঃখী বোধ করবে না, চিন্তাপীড়িত হবে না। সে তখন ভাববে, 'আমি যখন অন্যেব কাজে লাগতাম তখন পরিবারের লোকেরা আমাব খাতির করত, বন্ধুরা পরামর্শ নিত। আজ তো আমি অন্য কারও জন্যই নই, তবে ওরাই বা আমাকে খাতির করবে কেন ? আর ওদেব খাতির আমি চাইও না।' এই চিন্তাই তাব দুঃখ মোচন করবে।

তেরাপন্থ সংঘে এক সন্ত ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মগনলালজী স্বামী। তাঁকে মন্ত্রী-মুনি বলা হত। তাঁব জীবনী পড়লে মনে হয়, তাঁব মত বুদ্ধিমান, বিবেকী, তত্ত্বজ্ঞ ও অধ্যাত্মরত ব্যক্তি অতি বিরল। তাঁর সত্তর-আশি বয়স হয়েছিল, কোন মুনি যদি তাঁকে জলপান করাতেন, তবে খুবই ভাল, যদি না করাতেন, তবে তাও কিছু

খারাপ নয়। আমি তাঁকে কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখিনি। যখন কোন মুনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে বলতেন, 'ক্ষমা করুন, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনাকে জলপান করাতে পারি নি'; তখন মন্ত্রী-মুনি উত্তর করতেন, 'ভুল হয়েছে তো কি হয়েছে, এমন কিছু মারাত্মক ভুল তো নয়। আমার যদি পিপাসা পেত, সামনে যাকে দেখতাম তার কাছ থেকে জল চেয়ে নিতাম। তা সম্ভব না হলে, এটা সামান্য কষ্ট মনে করে সহ্য করে যেতাম। ব্যাপারটা কিছু গুরুতর নয়।' এই রকমই ছিল তাঁর কথা। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি ছিলেন নিজের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া আত্মসমাহিত ব্যক্তি। তিনি এই রকম মনে করতেন যে, কেউ যদি কারও জন্য কিছু করে তা নিজ গুণেই করে। এমন নয় যে তার ঋণ আছে, যা তাকে শোধ করতেই হবে। এই রকম অনুভূতি সেই ব্যক্তিরই হতে পারে যে বাস্তবিকই অনুভব করেছে যে, সে একলা। যে একাকীত্বের এই সূত্র আবিষ্কার করেছে, জীবন-যাপনের এই কৌশল আয়ত্ত করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে সুখী জীবনের অধিকারী হয়েছে। যে এই সূত্র আবিষ্কার করতে পারে নি, সে অন্যের মধ্যে হাজার দোষ দেখতে পায়। সে সর্বদা অনুযোগ করে, 'ও এটা করে নি, ও এই রকম করেছে, ও ঐ রকম করেছে'—ইত্যাদি। তার অভিযোগের অন্ত থাকে না। অভিযোগের ভাব তখনই আসে যখন ব্যক্তির আত্ম-বিস্মৃতি হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি যখন নিজেকে ভুলে যায়।

অপ্রমাদের সূত্র হল—আত্ম-স্মৃতি অর্থাৎ নিজের নিজেকে স্মরণ রাখা, এই ধারণাকে পুষ্ট করা যে, আমি একলা আছি—'একোঽহম্'। একত্ব ভাবনার যে সংস্কার আমাদের মধ্যে আছে, তাকে দৃঢ় করতে হবে। এই ভাবনা পুষ্ট হলে আত্ম-স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায়, অপ্রমত্ত থাকার অভ্যাস হয়। এখানে আর একটা ব্যাপার বুঝতে হবে। 'আত্মার স্মৃতি' বলে ঠিক কোন কথা হয় না। আত্মা তো আমাদের

স্বভাব, আমাদের স্বরূপ। স্বভাবের স্মৃতি তারই হতে পারে, যা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। স্বভাব বিস্মৃত হতে পারি না, সুতরাং তার স্মৃতিও সম্ভব নয়। এ কথা সত্যি বলেই মানতে হবে। প্রকৃত তথ্য এই যে, আমরা এক ব্যবধান রচনা করে বসেছি; আর এই ব্যবধানের দরুণ ভুলেই গিয়েছি, আমরা কে বা কি। আমরা বাহ্য বস্তুর ওপর, অনাত্মীয় বিষয়ের ওপর, আত্মীয়তা আরোপ করি, অথচ নিজের আত্মার দিকে দৃষ্টি দিই না। এই যে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক—এটাই প্রমাদের বড় কারণ। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই অপ্রমাদের সাধন। আমাদের অজ্ঞানের কারণে, ভুল দৃষ্টিকোণের কারণে, মতিভ্রমের কারণে, মানসিক বাচিক ও কায়িক চঞ্চলতার কারণে, প্রমাদ উৎপন্ন হয়। নিদ্রাও প্রমাদের হেতু হতে পারে। নিদ্রার সময়ে ব্যক্তি নিজেকে বিস্মৃত হয়। নিদ্রায় যে অবস্থা হয় তার সঙ্গে নেশার অবস্থার খুব বেশি পার্থক্য নেই। দুই অবস্থাতেই আত্ম-বিস্মৃতি হয়। নিদ্রা ভুলে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু তাও প্রমাদ, প্রমাদের হেতু ও প্রমাদের উৎপাদক। এই কারণে সাধনের জন্য সাধকের নিদ্রা জয় করা দরকার। নিদ্রাবিজয় সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। ইন্দ্রিয়ের লোলুপতাও প্রমাদের কারণ, সেজন্য ইন্দ্রিয় সংযম সাধনার অঙ্গ। ইন্দ্রিয়-সংযম সাধককে অপ্রমত্ততার দিকে নিয়ে যায়। যতক্ষণ অপ্রমাদের সাধনা করা না হয়, ততদিন অধ্যাত্মের অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই যায় না। অপ্রমাদ সাধনার এক সশক্ত সূত্র। প্রমাদ হল ভয়, অপ্রমাদ অভয়। ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'সব্বও পমত্তস্স ভয়ং'—প্রমাদীর চার দিকেই ভয় ঘিরে থাকে। সর্বত্রই তার পক্ষে ভয় আর ভয়, এক ক্ষণের জন্যও সে অভয়ের দশা পায় না। তার প্রতি ক্ষণই ভয়ের মধ্যে কাটে। সকলের মধ্যেই সে অবিশ্বাসের গন্ধ পায়। আপন ধন-ভাণ্ডারের চাবি কাউকেই দেয় না, তার মনে ভয় থাকে কেউ হয়ত তার ধন নিয়ে পালিয়ে যাবে। নিজের ছেলেকেও সে চাবি দেবে না, কারণ তার ভয় আছে যে, ছেলে ধন-ভাণ্ডারের

চাবি পেয়ে গেলে তাকে আর মানবে না, তাকে তোয়াক্কা করবে না। সে তার স্ত্রীকেও চাবি দেবে না, কারণ সে ভাববে, চাবি দিলে মা ও ছেলে দুজনে মিলে তার দুর্দশা ঘটাবে, তাকে একেবারে হেনস্থা করে ছাড়বে। সুতরাং অন্তিম কাল পর্যন্ত সে কারও হাতে চাবি ছাড়বে না, কারণ তার যে ভয় থাকবে। এই ভয়ই প্রমাদ।

কেউ কেউ একেই জাগরূকতা বলে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই জাগরূকতার পশ্চাতে ভয়ই ক্রিয়া করছে। এর পরে এরা আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, এই রকম ভয়-মিশ্রিত চিন্তা যদি না থাকত, তবে এই প্রকার জাগৃতিও আসত না। এই জাগৃতির কারণই যে ভয়। কখনও কখনও আমি এরকম ঘরে বাস করেছি, যে ঘরের আলমারিতে লাখ টাকার টাকার মাল পড়ে থাকে। সে ঘরে কোন পাহারাদার নেই, চৌকিদার নেই, কেবল আমিই আছি। বাড়ির মালিক সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। সে জেগে নেই, কারণ তার এই ভয় নেই যে, মুনি তার ধন বের করে নেবে। তার মনে কোন ভয় নেই, তাই সে জেগে থাকে না, সুখেই নিদ্রা যায়। যেখানে ভয় নেই, সেখানে পরম নিশ্চিন্ততা।

এক আশ্চর্য এই যে, লোকে এই ভেবে চলে যে, তারা পঞ্চাশ জন কি একশ জন—যেন তারা এই পঞ্চাশ কি একশ জন মিলে একই ব্যক্তি। অথচ তাদের প্রত্যেকের মনেই অপর প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। কোন ব্যক্তিই অপর ব্যক্তিকে মনের সব কথা খুলে বলে না, কাউকে কিছুটা বলে, অপর কাউকে আর কিছুটা, এই রকম। যে কোন পরিবারের কর্তাই সেই পরিবারের কোন সদস্যকে পরিবার-সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি বিষয় জানায় না, কাউকে খানিকটা জানায়, আর কাউকে আর খানিকটা জানায় —কিন্তু কাউকেই সবটা জানায় না। তার মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেখানে পৃথক পৃথক ভয়ও আছে। মূলে এ সবেরই উৎপত্তিস্থল ভয়। ভয় হলে জাগতে হয়, ভয় না থাকলে জাগার প্রয়োজন হয়

না। এই ভয় আবার উৎপন্ন হয় বাহ্য সম্পর্ক থেকে। বাহ্য সম্পর্ককেই নিজেব বলে মেনে নিয়েছি, তাই ভয় হয়—পাছে সেই সম্পর্ক টুটে যায়। এই ভযেব জন্যই নানা প্রকার প্রমাদ এসে উপস্থিত হয।

এই বকম অবস্থায় অপ্রমাদের উপায় হল, একাকীত্বেব অনুভূতি। অবশ্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন ব্যক্তি ব্যবহাবের ভূমিতে বাস করতে পারে না। আমি একথা বলছি না যে, ব্যবহারকে তুলে দিতে হবে। তা কোন ব্যক্তি করতে পারে না। ব্যবহার ত্যাগ করে কোন ব্যক্তি জীবন ধাবণ কবতে পারে না। সংসার ত্যাগ চলবে না। এই সব কথায় ব্যবহাব বন্ধ হবে না, বরং আরও মধুর হযে উঠবে। বাস্তবিকই যদি আপনি আপনার মধ্যে আপন একাকীত্ব অনুভব করতে পারেন তবে অনেক কঠিন অবস্থা থেকে বেঁচে যাবেন। আপনাকে চিন্তা আর দুঃখের শিকার হতে হবে না। অন্যেব ব্যবহার দেখে আপনি জড়িয়ে পড়বেন না, বা দুঃখী হবেন না। তখন আপনার নিজের ব্যবহাব অন্যের কাছে মধুব লাগবে। আপনার মস্তিষ্কে তখন যে চিন্তা-সূত্র ক্রিয়াশীল হবে তা হল—আমি একলা। যখন কোন সমস্যা আপনার সামনে আসবে তখন এই চিন্তাসূত্র ধরেই সমাহিত থাকবেন। সমস্যা আপনাকে পীড়িত করবে না। যে সমস্যা ষোল আনা ছিল, তা এক আনা মাত্র হযে যাবে। তা আপনি ব্যবহারেব ভূমিতে সমাধান করে নিতে পারবেন। যদি একাকীত্বেব এই আলম্বন-সূত্র আপনার কাছে না থাকে, তবে ছোট সমস্যাও বড় বলে মনে হবে। সহজে তার সমাধান হবে না। বস্তুত অপ্রমাদের সাধনা কি ব্যক্তিগত জীবন, কি ব্যবহারিক জীবন—দুই ক্ষেত্রেই সমান ভাবে লাভপ্রদ ; দুই ক্ষেত্রেই তা সমস্যার সমাধান হতে সক্ষম। এই সাধনা সমস্যা মোচন করে, আবার আমাদেব এক পা এক পা করে এগিযে যেতেও সাহায্য করে।

আমরা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হই, আবার সম্পর্ক থেকে পালিযে যাই, সম্পর্ক এড়িযে যাই। যুক্ত হওয়া আর পালিযে যাওযা—এই দুই ব্যাপারই ঠিক। জুড়ে যাওয়া ভাল, ভেগে যাওযাও ভাল। সমূহের

মধ্যে থাকাও ভাল, একলা থাকাও ভাল। এদের মধ্যে কোন একটাই কেবল ঠিক, এমন বলা যাবে না। কারণ আমাদেব ব্যবহাবেব জীবন যাপন করতেই হয়। আমাদের ব্যবহারের একটা স্তর আছে—যেখানে আমাদের শবীর থাকে, আমাদেব জীবন থাকে। সে স্তব আমাদেব আবশ্যক তো বটেই। আমাদেব রুটি খেতে হয়, কাপড় পরতে হয়, ঘব বানাতে হয, ঘবে থাকতে হয—এ সবই তো আমাদের অপরিহার্য। এই পবিস্থিতিতে আমবা সম্পর্ক ত্যাগ করতে সমর্থ হব কি করে? সব সম্পর্কের সাহায্যই আমাদের নিতে হবে। কিন্তু যখনই আমরা বাস্তবিকতাব জগতে বাস কবি, প্রকৃত সত্যেব জগতে বাস কবি, যথার্থতার জগতে বাস কবি, তখনই আমবা প্রত্যেকে একলাই বাস করি। তখন আমাদের একলাই থাকতে হবে। অন্যথায় অনেক কঠিন ভার আমাদেব বহন কবতে হবে। এব কোন বিকল্প নেই।

আশ্চর্য ভিক্ষু ভাবি সুন্দর একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'গণের মধ্যে থেকেও তুমি একলা থাক।' কথাটা স্ব-বিবোধী বলে মনে হতে পাবে। শাসনের অধীন থাকব, সমূহের মধ্যে থাকব, আবার একলাও থাকব—এ কেমন করে সম্ভব? হয সমূহের মধ্যে থাকতে হবে, নয একলা থাকতে হবে। একই সঙ্গে তো দু ভাবেই থাকা যায় না। কথাটাব মধ্যেই যে বিরোধ আছে। অসংখ্য সাধু-সাধ্বীর মধ্যে থাকব, আবার একলাও থাকব—কথাটা স্ব-বিবোধী তো বটেই। কিন্তু সেরকম মনে হলেও, কথাটার সত্যিই কোন বিবোধ নেই। তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। তাৎপর্য এই যে, তুমি সংঘে থাক, তোমার সেবা অপর সাধুকে দাও, আবার আবশ্যক হলে তার কাছ থেকে সেবা নাও। তুমি তার সহযোগিতা কর, আব প্রয়োজনে তার সহযোগিতা প্রার্থনা কব। তুমি লোককে বোঝাও, উপদেশ দাও, তাদেব কাছ থেকে যা নেওযার আছে, তা নাও। কিন্তু কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বেধো না, কাবও সঙ্গে দল বেধো না।

গণ মেঁ রহুঁ নির্দাব অকেলো,
কিণ্‌ স্যুঁ হী নহীঁ বাঁধুঁ কীলো।

'আমি গণে থেকেও একলা থাকব, কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধব না, কাবও সঙ্গে দল বাধব না।' এই কথার তাৎপর্য, সহযোগের স্তরে তুমি একলাই থাক। আর যদি কেবল সমূহেব মধ্যেই থেকে যাও, সংগঠনের মধ্যেই থেকে যাও, তবে তোমার সাধনাও শেষ হযে যাবে। কেবল সংগঠনের ভার, সংগঠনের চিন্তা যদি তোমার মাথায় থাকে তো তোমার সাধনার সমাপ্তি ঘটবে। তোমাকে সাধনাও করতে হবে, আর তোমার আবশ্যকতা-পূর্তির জন্য সংগঠনকেও বাঁচিযে রাখতে হবে। এই দু দিক রক্ষা হলেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হয। কেবল একলা থাকাই সব নয়, আবার কেবল সংগঠনের মধ্যে থাকাও সব নয। তেমনি কেবল পরিবারেব মধ্যে থাকাই সব নয়, আবাব কেবল একলা থাকাও সব নয়। যেখানে সুখ-সুবিধা, সহযোগ প্রভৃতি দেওয়া-নেওযার প্রশ্ন আছে, সেখানে ব্যক্তি পরিবারের মধ্যেই থাকে, সম্পর্ক জোড়া দেয় আর অনেকের মধ্যেই বেঁচে থাকে। যেখানে যথার্থতার অনুভব করা প্রয়োজন, সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করা আবশ্যক, সেখানে একলা থাকতে হবে, একাকীত্বের বোধ দৃঢ় করতে হবে। এই দুই ভাব এক সঙ্গে মিললে জীবন পবিপূর্ণ ও অখণ্ডিত হয়। তখন আমরা আর এ পাড়েও জড়িযে যাব না, ও পাড়েও জড়িয়ে যাব না; দুই তটই পার হযে চলে যাব।

০

২৩

জ্ঞান ও সংবেদন

সংবেদন এবং অহং—উভয়ে সাথে সাথে চলে। রাজা শুনলেন নগবে এক শক্তিশালী সাধু এসেছেন। বড়ই বিচিত্র তাঁব কার্যকলাপ। হাজার হাজাব লোক আসছে যাচ্ছে। ঘরে ঘবে তাঁর যশোগান। রাজা তাঁর কাছে নিজের লোক পাঠিয়ে প্রার্থনা জানালেন সাধুজী যেন রাজাকে একবাব দর্শন দেন। সন্ন্যাসী বললেন—'আমি রাজার প্রাসাদে যেতে পাবব না, রাজা যদি দর্শন করতে চান তবে এখানে এসে অনুগ্রহ কবে দর্শন করুন।' প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা ছিল রাজার, সন্ন্যাসীব নয়। ক্ষুধিত লোকেরই ভোজ্যেব কাছে আসতে হয়। পিপাসা ছিল রাজার, সন্ন্যাসীর নয়। পিপাসিত লোককেই পানীযেব কাছে আসতে হয়। তখন রাজা স্বয়ং সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিযে এলেন। সন্ন্যাসী প্রাসাদে এক দিন থাকলেন, দুদিন থাকলেন, মাস ভোর থাকলেন। তিনি চলে যাবার নামও করেন না। রাজা ভাবলেন, 'এ কেমন? আমি কোন্ আপদ ডেকে আনলাম? আমি তো ভেবেছিলাম বনবাসী লোক, দু-এক দিন প্রাসাদে থেকে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি তো এখান থেকে চলে যাবাব নামও করেন না।' এক দিন রাজা সন্ন্যাসীকে বললেন, 'মহারাজ, চলুন আমরা বনে বেড়িযে আসি।' সন্ন্যাসী এবং রাজা ভ্রমণ করতে বের হলেন। তাঁরা চলতে

চলতে নগর থেকে বহু দূর গেলেন। রাজা বললেন, 'আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এবার চলুন প্রাসাদের দিকে ফিরে যাই।' সন্ন্যাসী বললেন, 'আর প্রাসাদে ফিরে যাব কেন? আমি তো বনের দিকেই চলেছি।' তখন রাজা বললেন, 'মহারাজ, আপনিও প্রাসাদে থাকতেন আর আমিও প্রাসাদে থাকতাম। তবে আপনার আর আমার মধ্যে প্রভেদ কি আছে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি প্রাসাদে ছিলাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে প্রাসাদ ছিল না, আর তুমি প্রাসাদে থাক, প্রাসাদ তোমার অন্তর অধিকার করে আছে। তোমার আমার মধ্যে এই প্রভেদ। আমি বনে থাকলেও প্রাসাদে অবস্থান করি, প্রাসাদে থাকলেও বনে বাস করি। আমি যখন বনে থাকি তখনও নিজের ভাবে নিমগ্ন থাকি, যখন প্রাসাদে থাকি তখনও নিজের ভাবে নিমগ্ন থাকি। আমার মনে আমার অন্তরে প্রাসাদ ছিল না। প্রাসাদে বাস করা বা বনে বাস করা আমার অন্তরের ব্যাপার নয়। আমার কাছে উভয়ই সমান। তোমার পক্ষে দুই-ই সমান নয়। তোমার কাছে জঙ্গল জঙ্গল এবং প্রাসাদ প্রাসাদ বটে।'

সম্পত্তি থাকা বা না থাকা—উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পার্থক্য কেবল অন্তরে, সম্পত্তির বোধ হওয়ায় এবং না হওয়ায়।

একবার গৌতম ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করেন—'ভন্তে, ছয় খণ্ডের অধিপতি চক্রবর্তী রাজা এবং সূক্ষ্ম জন্তু উভয়ে কি সমান?'

মহাবীর বললেন, 'হ্যাঁ, উভয়ে সমান।'

'ভন্তে, আপনার কথায় বড়ই আশ্চর্য বোধ করছি। দুই-ই সমান হতে পারে কি করে? কোথায় চক্রবর্তী সম্রাটের ঐশ্বর্য ও প্রভুত্ব আর কোথায় ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবন!'

'গৌতম! রাজচক্রবর্তীর মধ্যে যতটা আকাঙ্ক্ষা আছে প্রাণীর মধ্যেও ততটাই আকাঙ্ক্ষা আছে। ঐশ্বর্য বা প্রভুত্ব থাকা বা না থাকা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু আকর্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়েই সমান। যতটা

আকর্ষণ চক্রবর্তী সম্রাটে আছে ততটাই আকর্ষণ প্রাণীতে আছে।' উভয়ের মধ্যেই অবিরতি সম পরিমাণে বিদ্যমান। যেখানে উভয়ের অবিরতির সমতা সেখানে উভয়ে সমতাপ্রাপ্ত হয়েছে।' কি গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ কথা। যখন সংবেদনা জাগ্রত হয় তখন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। যখন সংবেদনার সংহরণ হয় তখন অন্তর্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যখন মনের সংবেদন বৃদ্ধি পায় তখন অহং উৎপন্ন হয়। যদি মনে সংবেদন না থাকে তবে সম্পত্তি বা ঐশ্বর্যের পরিগ্রহ ঘটে না। যখন সম্পত্তিপরিগ্রহ ঘটে তখন মনে সংবেদনা জেগে উঠে।

দুটি ব্যাপার আছে—একটি জ্ঞানের ধারা, অপরটি সংবেদনা। আমরা যেন জ্ঞানের ধারাকে জ্ঞানের ধারা রূপেই থাকতে দিই। আর চেতনার জ্যোতিরশ্মিকে যেন চেতনার জ্যোতিরশ্মি রূপেই সংরক্ষিত করি। একেই বলে সাধনা, এরই নাম আত্মদর্শন। এরই নাম প্রকাশ। একেই আমাদের জানতে হবে, মানতে হবে এবং এর মধ্যেই থাকতে হবে। তাতে কোনও অসুবিধা বা বিঘ্ন হবে না।

যখনই জ্ঞানের ধারা সংবেদনার গুরুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে এসে পড়ে তখনই তা সংবেদনায় পরিণত হয়। তাতে ভার এসে যায়, আর তা ভেতর থেকে বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্তরীক্ষযাত্রী যখন অন্তরীক্ষের সীমার মধ্যে থাকে তখন সে ভারশূন্য। তখন সে কালের সীমাকেও লঙ্ঘন করে। কিন্তু যখন সে পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণের সীমার মধ্যে চলে আসে তখন সে ভারি হয়ে যায় এবং কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। এই ভাবে যতক্ষণ আমাদের চেতনার ধারা, আমাদের জ্ঞানের ধারা, বিশুদ্ধ রূপে প্রবাহিত হতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সাধনা, তথা পবিত্রতা। যখনই তা হৃদযাবেগের গুরুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখনই বাসনা, লোভ, বঞ্চনা, মান প্রভৃতি সমুদয় দোষ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি বিষয়ের ওপরে আমাদের ধ্যান

কেন্দ্রিত করা প্রয়োজন। প্রথম কথা হল, আমাদের চেতনাকে চেতনা রূপেই থাকতে দেব। আর দ্বিতীয় কথা—আমরা চেতনাকে সংবেদনায় পরিণত হতে দেব না। চেতনাকে চেতনা রূপে সংরক্ষণের প্রধান উপায়—শুদ্ধ উপযোগ। জ্ঞানকে জ্ঞানরূপে জানা ও দেখা, সহজ আনন্দকে অনুভব করা, অনন্ত শক্তিকে উপলব্ধি করা, এই চেতনাকে চেতনার পরিধির মধ্যে সংরক্ষণের রূপ। যেখানে রশ্মির পরিবর্তন ঘটে সেখানে চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। তার মূল কারণ হৃদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। চেতনার ওপরে হৃদয়াবেগের ভার পড়লে চেতনা আর চেতনা থাকে না। তা বিকৃত হয়ে যায়। আমাদের চেতনায় স্থিতির ক্ষণই আমাদের জাগরূকতার ক্ষণ। সেই ক্ষণই আমাদের সাধনার ক্ষণ, তথা আমাদের আত্মদর্শনের ক্ষণ। ঐ ক্ষণ আমাদের চেতনার অভিমুখী হওয়ার ক্ষণ। যখন চেতনা হৃদয়াবেগ দ্বারা ভাবগ্রস্ত হয় তখন বাসনা, বঞ্চনা তথা অহমের ক্ষণ। তখন আমাদের সামনে সমস্যা এসে যায়। সংবেদনা সমস্যা উৎপাদন করে। ভয়, ঘৃণা, বাসনা, লোভ, আবেগ সবই এক একটি সমস্যা। এ সমস্ত সমস্যার মূল—হৃদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। তার অভাব হলে সমস্যার অভাব হয়, এবং চেতনা চেতনা রূপে স্থিত হয়।

দুই স্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এক চেতনার বিশুদ্ধ স্থিতি, চেতনার ভাবাবেগসম্বলিত স্থিতি। সাধকের জাগরূক থাকা প্রয়োজন। তার চেতনাকে চেতনার সীমার মধ্যে থাকতে দিতে হবে। সেটাই সাধনা। ঐ হল আত্মার উপাসনা। যে লোক চেতনাকে চেতনা রূপে থাকতে দিতে পারে সে ভাবাবেগের গুরুত্বাকর্ষণ থেকে বাঁচতে পারে। সে-ই বাস্তবে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

২৪

জপ ও মৌনতা

দুটি লোক নদীর ধারে এল। তারা নদী পার হতে চায়। তারা দেখল নদীর কিনারায় একটি নৌকো আছে। একজন বলল—'নাবিক তো নেই, কিন্তু নৌকো পড়ে আছে। কাজেই আমরা নদী পার হতে পারব।' দ্বিতীয় জন বলল—'এরকম হওয়া সম্ভব নয়। নদী পার হতে হলে কেবল নৌকো থাকলেই যথেষ্ট নয়। নাবিকও চাই, দাঁড়ও চাই, নৌকো চালনার কৌশলও জানা চাই। এইসব হলে তবে নদী পার হওয়া সম্ভব হয়।' প্রথমজন বলল, 'এ রকম কি করে হতে পারে? জীবন-ভোর শুনছি নদী পার হতে হলে নৌকোয় চড়ে পার হও। নৌকো পড়ে আছে। অন্য কোন বস্তুর কি আবশ্যকতা আছে?' দ্বিতীয় লোকটি তাকে বোঝাল, কিন্তু সে তার কথা মানল না। সে নৌকো পাড় থেকে খুলল, তাতে একাই বসল। জলের এক ঢেউ এসে লাগল, আর নৌকো এগিয়ে চলল। নৌকো নদী পার হওয়ার উপায়, কিন্তু আজ ঐ যাত্রীর পক্ষে নৌকো তার ডোবার কারণ হল। যে পার হওয়ার উপায়, সে কখনও কখনও ডোবার কারণ হতে পারে। বাস্তবে যে পার করতে পারে এবং যে ডোবাতে পারে—দুই ভিন্ন নয়, একই হয়ে থাকে। যে তারক,

সে-ই নিমজ্জক আর যে নিমজ্জক, সে-ই তাবক। বাস্তবে এ দুটি স্বতন্ত্র নয। তাদের প্রভেদ সংযোগেব প্রভেদ। নৌকো চলল, লোকটি শান্তভাবে বসে থাকল। জলেব খুব তোড ছিল, স্রোত প্রবল ছিল। নৌকোটি টলমল করে চলতে লাগল। কিছু দূর যাওযাব পরে নৌকোটি উলটে গেল। আরোহী জলে ডুবে গেল।

নৌকো নদী পার করে দেয, একথা ঠিকই বটে। কিন্তু তাব অর্থ এই নয় যে শুধু নৌকো, একলা নৌকোই, নদী পার করে দেয়। তার সাথে অন্য কোন কোন জিনিসের প্রযোজন আছে। যে লোক এক অংশ আঁকড়ে ধরে কিন্তু অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করে, তার পক্ষে পাবপারকারী ডুবন্ত হযে যায়।

ঠিক এই রকম ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে। আমবা জানি, ওঙ্কাব বড মন্ত্র। আমরা জানি, অহম মহত্বপূর্ণ মন্ত্র। 'নমো অবহন্তাণং' বড় মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করলে সর্ব কর্মে সিদ্ধিলাভ হয। একথা ঠিক। তেমনি সত্য যেমন নৌকোয উঠে বসলেই নদীর অপর পারে পৌঁছানো যায়, এ কথা সত্য। মন্ত্র জপ করে সর্ব বিষযে সিদ্ধিলাভ করবে। এ কথা যথার্থ। কিন্তু শুধু মন্ত্রকে গ্রহণ করে, তাকে বছরের পর বছর জপ কবতে লাগলে, অথচ কিছু হল না, কিছুই অনুভব হল না, কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হল না। এই রকম পরিস্থিতিতে লোকে বলে থাকে—এত বছর ধরে জপ করলাম, জপেব মালা ঘোরালাম, কিন্তু কই চমকপ্রদ কিছু তো ঘটল না। কোন কিছুই লাভ হল না। অর্থাৎ এ নৌকো পার হওয়াব উপায নয়। মনে হয এব প্রচেষ্টা ডুবিযে দেওযাব, এবং সে চেষ্টায় অনেকটা সফল হযেছে। কেউ কেউ বলে—এতদিন ধরে আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে মালা ঘোবালাম আর মন্ত্র জপ করলাম, অমুক অমুক অনুষ্ঠান করলাম, কিন্তু মনে হল কিছুই ফল হচ্ছে না। তাই আমরা মালা ঘোরানো, মন্ত্র জপ কবা সব ছেড়ে দিযেছি। মনে আব ঐ সবের ওপরে কোন বিশ্বাস নেই। তার অর্থ এই যে, ঐসব লোক মাঝ দবিযায

এসে ডুবে যাচ্ছে। এ রকম কেন হয়? ঐ বকম হওযাব কাবণ হল আমরা সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানি না, আয়ত্ত করাব চেষ্টা কবি না। আমাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে হবে, আযত্ত কবতে হবে। মন্ত্রের মধ্যে শক্তি আছে একথা ঠিক। মন্ত্র তরাতে পাবে, কিন্তু সব কিছুই মন্ত্রেব দ্বারা হবে, এমন হয না। তার সঙ্গে অন্য আবও কিছু চাই। সবার আগে আপনি এই কথা চিন্তা করে দেখুন মন্ত্রের সঙ্গে আপনাব মনের সংযোগ হয়েছে কিনা। আপনি তো মন্ত্র জপ করে যাচ্ছেন, কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গে আপনাব মনের যদি সংযোগ না হযে থাকে তবে কোন ফল লাভ হবে না। অর্থাৎ নদী পাব হওয়াব আগে, নৌকোয বসার আগে, আপনাকে দেখতে হবে নৌকোয নাবিক আছে কিনা। নাবিকও নেই আব আপনি নিজেও চালাতে জানেন না, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে বলা যায নৌকো আপনাকে পাব কবতে পারবে না। মাঝ দবিযায় নিযে গিয়ে আপনাকে ডুবিযে দেবে। মন্ত্রে শক্তি আছে এ কথা যথার্থ, কিন্তু আপনার মন যদি তাতে সংযুক্ত না হয, যদি মনেব সঙ্গে তাব কোন সংযোগ না ঘটে, যদি মন তার দিকে চালিত না হয, সে মন্ত্র মনকে চালিত না করে বিভ্রান্ত করবে। আমাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে হবে। প্রথম তত্ত্ব হল, মনকে সংযুক্ত কর। মনোযোগ না করে যে কাজ কবা যায তা সম্পূর্ণ হয় না, অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। যে লোক খাচ্ছে তার মন যদি খাওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না হয তবে তাব খাওযা অসমাপ্ত থেকে যায। যে লোক চলছে তাব মন যদি চলার সঙ্গে সংযুক্ত না হয তবে তাব চলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে অর্ধেক মন নিযে চলে, সম্পূর্ণ মন নিযে নয। আপনি এই বিষযে চিন্তা করে দেখুন। আপনি কি সম্পূর্ণ মন দিযে খান? কখনই নয। কখনও কি এমন হয় যে খাওযাব সময়ে আপনি খান, আব কিছুই করেন না? চিন্তা করেন না, কিছু বলেন না বা ইঙ্গিত করেন না? আপনাব মন কি সম্পূর্ণ রূপে খাওযাতে লেগে থাকে? না, কখনই না।

খেতে খেতে আপনি অসংখ্য কাজ করেন। কোথা থেকে কোথায় চলে যান। কত যাত্রাই কবেন। কত বকম কল্পনা করে ফেলেন। কত রকম পবিকল্পনা করেন। আপনি পুবো মন দিযে খান না, অর্ধেক মন দিয়ে খান। এব তাৎপর্য এই যে, মনেব এক কোণ খাওয়াব কাজে যুক্ত থাকে, আব তার হাজাব কোণায আলাদা আলাদা কাজ হতে থাকে। চলার ব্যাপাবেও সম্পূর্ণ মন চলাব মধ্যে থাকে না। আপনি যখন চলেন তখন আপনাব মনের এক ভাগ চলার-সঙ্গে সহযোগিতা করে, চলাতে সংযুক্ত থাকে। আর তার বাকি হাজাব ভাগ কে জানে কোথায উড়ে বেড়ায। মন্ত্র জপেবও একই ব্যাপাব। সম্পূর্ণ মন দিযে মন্ত্র জপ কই হয? মনেব এক ভাগ মন্ত্র জপের সঙ্গে লেগে থাকে, আব অবশিষ্ট হাজাব ভাগ অন্যান্য নানা রকম কল্পনায-ব্যস্ত থাকে।

এক শ্রাবক ভাই বলেন যে যখন আমি অন্যান্য কাজ কবতে থাকি তখন আমাব মন সাধাবণত সেই সব কাজে সংলগ্ন থাকে। কিন্তু যখন মালা ঘুরিযে জপ করতে থাকি তখন দুনিযার যত কল্পনা-দুর্বার গতিতে মনের মধ্যে আসতে থাকে। ঐসব কল্পনা মনেব মধ্যে-ভিড় করে।

সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করে আমবা কোন কাজ করতে পাবি না। সাধনার ব্যাপারে ঐ তো আমাদেব ঘাটতি। সাধনার অর্থ কি? সাধনা থেকে আপনারা আর কিছু শিখুন বা না শিখুন, এটা অন্তত শিখে বাখবেন, যে কাজই কবতে হবে সেই কাজই সম্পূর্ণ মন দিযে কবা উচিত, সমগ্রতাব সঙ্গে কবা উচিত, অর্থাৎ ঐ কাজে মনকে সমগ্র রূপে নিযোগ করা কর্তব্য। মনকে এমন ভাবে নিযোগ করা প্রযোজন যাতে মনেব সমস্ত অংশ ঐ কাজে পবিপূর্ণ হযে যায। মনেব কোন কোণা যেন শূন্য না থাকে, যাতে তা থেকে অপসরণ কবাব কোনও অবসর না থাকে। তাব সামনে যদি কোন শূন্য স্থান না থাকে তো বেচারা পালাবে কোথায়? এই পবিস্থিতি

যদি প্রাজ্ঞ হওয়া যায় তাহলে সাধনায় সাফল্য লাভ হয়। আপনি একে সাধনার প্রাথমিক রহস্য বা অন্তিম সাফল্য যাই বলুন এই হল সাধনার একমাত্র রহস্য। এর তাৎপর্য এই যে সাধনা দ্বারা মনকে এ রকম প্রশিক্ষিত করতে হবে যে, তাকে যে কাজে আমরা লাগাতে চাইব সে সেই কাজেই লেগে যাবে। আমরা যে কাজে তাকে লাগাতে না চাই সে কাজে সে লিপ্ত হবে না। যদি মনের ওপরে এতটা প্রভুত্ব স্থাপিত হয় তাহলে আর কোন সমস্যা উৎপন্ন হবে না। পরন্তু আমরা নিজেদের মনের মালিক হয়ে যাব। আমরা যা চাই তাই করতে পারব, যেমন করে চাই তেমনি করে করতে পারব। আমাদের মন এমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত যে আমরা তা গুণে শেষ করতে পারি না। এই খণ্ডিত মনই মানব জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'অনেগচিত্তে খলু অয়ং পুরিসে'—মানুষ অনেক মন সম্পন্ন, সে একমনা নয়। তার অনেক মন। ঐ মন অনেক ভাবে খণ্ডিত। এই জন্য মানুষ কোন বিষয় পুরো মন দিয়ে চিন্তা করতে পারে না। যদি সে সম্পূর্ণ মন দিয়ে চিন্তা করতে লেগে যায় তবে নির্ঘাৎ তার নৌকো নদী পার হতে পারবে, তা ভিন্ন এ কাজ করা সম্ভব নয়।

সবার আগে দেখুন মন্ত্রের সাথে মনের সংযোগ হয়েছে কিনা। মনের সমগ্র শক্তি মন্ত্রের সঙ্গে আছে কি নেই। মন্ত্র আর মন দুটি ভিন্ন জিনিস।

তৃতীয় প্রশ্ন, আপনি মন্ত্রের অর্থ জেনেছেন কিনা। মন্ত্রের অর্থ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি আপনি মন্ত্রের অর্থ না জেনে থাকেন তাহলে আপনি যা করতে চান তা করতে পারবেন না। যা হতে চান তা ঘটা সম্ভব হবে না।

পরিবর্তনই চিরন্তন সত্য। কোনও বস্তু শাশ্বত নয়, চিরস্থায়ী নয়। সব পরিণামশীল। পরিবর্তনই সত্য। সব জিনিসই বদলায়। পরমাণু নষ্ট হয় না। যা আকার বা সংস্থান বা রূপ তা স্থায়ী হতে পারে না। সবই পরিবর্তনশীল। সব কিছুই বদলায়। মানুষও বদলে যায়।

কেবল আত্মা শাশ্বত। তার কোন পরিবর্তন নেই। মানুষ বদলায়। সেইজন্য মানুষ যা হতে চায় সে তা হতে পারে। সেই রূপেই সে বদলে যেতে পারে। তার যা সঙ্কল্প হবে সেই রূপে সে বদলে যাবে। মানুষ জীবনের প্রথম ক্ষণ থেকে বদলাতে শুরু করেছে। প্রতি মুহূর্তে সে বদলাচ্ছে। পরিবর্তনের ক্রম বন্ধ হয় না। তার ফলে মানুষের সঙ্কল্পের অনুরূপ পরিবর্তন হয়। আর যদি সঙ্কল্প না থাকে তবে অন্য যে কোন রূপে বদলায়। সঙ্কল্প থাকলে সঙ্কল্প অনুযায়ী পরিণতি ঘটে।

আমাদের শরীরে যেসব কোষ আছে সেগুলি তার সংগঠনকারী মূল উপাদান। তাদের দ্বারা শরীর নির্মিত হয়। তাদের সংখ্যা অনেক। আমাদের শরীরে ষাট হাজার অর্বুদ কোষ আছে। আমাদের মস্তিষ্কে প্রতি বর্গ মিটারে এক কোটি কোষ আছে। শরীরের কোষ প্রতি মুহূর্তে নষ্ট হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে নতুন কোষ উৎপাদিত হচ্ছে। হাজার হাজার কোষ লোপ পাচ্ছে, আবার হাজার হাজার কোষ নতুন জন্মাচ্ছে। পুরনো কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তন-চক্র নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে। বয়স অনুসারে মানুষের শরীরের কোষগুলি যখন অতিশয় ক্ষীণ হয় এবং নতুন কোষ খুব কম জন্মে, তখন শরীর ক্ষীণ হয়, মস্তিষ্ক ক্রমশ দুর্বল হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ হয়, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। জোয়ান মানুষ নিজের শরীর, নিজের মনকে যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কিন্তু বুড়ো মানুষের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ক্ষীণ ও শিথিল হয়ে যায়। তার কারণ ষাট বা সত্তর বছর বয়সে মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা শতকরা দশ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এত কোষের ধ্বংস হয় যে মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে যায়। এই হল মানুষের শরীরের ভেতরকার অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন-চক্র। আমরা একটি চিতা জ্বলতে দেখে ভয় পেয়ে যাই। বলে উঠি, 'ওরে! চিতা জ্বলছে, মৃতদেহ পুড়ছে।' আমরা যদি নিজেদের ভেতরে তাকাই তবে দেখতে পাব, এক নয়, হাজার চিতা নিরন্তর জ্বলছে। হাজার হাজার কোষের মৃত্যু হচ্ছে, হাজার হাজার কোষের জন্ম হচ্ছে।

জন্ম এবং মৃত্যু—দুই-ই এক সাথে চলছে। একটি দিকে শ্মশান, তো অন্য দিকে প্রসূতিগৃহ। এক দিকে চিতা সাজানো হচ্ছে, মৃতদেহ পুড়ছে, অন্য দিকে নতুন নতুন চেহারা জন্মাচ্ছে, সূর্যকিরণের প্রথম স্পর্শ পাচ্ছে। বিচিত্র এই শরীর। আমরা কেবল বাইরে থেকে একে দেখি। বাইরে থেকে আমরা শ্মশানও দেখছি, প্রসূতিগৃহও দেখছি। সদ্যোজাত শিশুকেও দেখছি, মৃত্যুকবলিত বৃদ্ধকেও দেখছি। সব কিছুই বাইরে থেকে দেখছি, কিন্তু ভেতর থেকে কিছুই দেখছি না। ভেতরে এক পরিবর্তনের চক্র চলছে। সমস্ত কিছু অনবরত বদলে যাচ্ছে। তবুও কি আপনার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে। ভেতরে প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ চলছে। জন্ম এবং মৃত্যুর কাজ, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কাজ অবিরাম চলছে। এ সবই স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে। যদি আপনি সঙ্কল্প করেন তবে এই চক্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ আপনি যা হতে চান তাই হতে পারেন। এসব কিছুই ঘটে প্রাণের স্তরে।

দুই বস্তু আছে—আত্মা আর প্রাণ। এক আত্মশক্তি, অপর প্রাণশক্তি। এক হল প্রাণবল, অপর হল আত্মবল। আমাদের লক্ষ্য—আত্মোপলব্ধি। আমরা আত্মার মূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, আত্মাকে পেতে চাই, মূল চেতনা পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। এই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। এর আগে আসে প্রাণ। প্রাণের স্থান এর আগে। আত্মা পর্যন্ত কে পৌঁছতে পারে? যে প্রাণবান, যে শক্তিশালী, সে-ই শুধু আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যার মনোবল তথা সঙ্কল্পবল ক্ষীণ, যার ইচ্ছাশক্তি তথা প্রাণশক্তি ক্ষীণ, যে বীর্যহীন সে কখনও আত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হয় না। আত্মাকে লাভ করার জন্য প্রাণকে শক্তিশালী করা বিশেষ প্রয়োজন। যা জপের স্তর তাই প্রাণের স্তরে চলনশীল লোকের চলার পথ। তা প্রাণকে শক্তিশালী করে। প্রাণ আমাদের বিদ্যুৎশক্তি। সব প্রাণীর মধ্যেই এই শক্তি আছে। এমন কোন

প্রাণী নেই যার মধ্যে এই শক্তি অনুপস্থিত। আমাদের সমস্ত সক্রিয়তা চঞ্চলতা, উন্মেষ ও নিমেষ, কথা ও চিন্তা, গতি ও দীপ্তি, তথা আকর্ষণ— এ সমস্তই প্রাণের আধারে ঘটে, বিদ্যুৎশক্তির আধারে ঘটে। বিদ্যুৎ-শক্তি এ সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে। আমাদের শরীরে এই বিদ্যুৎ মজুত আছে। তাকে আমরা তৈজস শরীর বলতে পারি, প্রাণ বলতে পারি। বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করার অর্থ, মনোবল বৃদ্ধি করা। যার বিদ্যুৎ তীব্র হয় তার মনোবল বৃদ্ধি পায়। যার বিদ্যুৎ ক্ষীণ হয় তার মনোবল হ্রাস পায়।

'মানুষের ব্রহ্মচর্য পালন করা বাঞ্ছনীয়'—এটা কেবল কথার কথা নয়। এর পেছনে মস্ত বড় রহস্য আছে। আমাদের ভেতরে একটি বিদ্যুতের প্রতিষ্ঠান বা পাওয়ার হাউস আছে। তার অবস্থিতি পৃষ্ঠরজ্জুর অন্তিম বিন্দুতে। পৃষ্ঠরজ্জু যেখানে হয় সেখানে একটি কেন্দ্র আছে। পেছনের দিকে কোমরের কাছে এই কেন্দ্র অবস্থিত। সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। সেটি একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ। যে ব্যক্তির বিদ্যুৎশক্তি ঊর্ধ্বগামী হয় অর্থাৎ ওপরের দিকে উঠতে থাকে সে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়। ব্রহ্মচর্যের সাধনা দ্বারা লোকে নিজের ওজঃশক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে যায়। তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। তার প্রাণ শক্তিশালী হয়। তার মনোবল দৃঢ় হয় এবং ব্যক্তির পরাক্রম এতটা স্ফুরিত হয় যে সে যা কল্পনা করে তাই সিদ্ধ হয়। প্রাণ গেলেও কখনও সে তার সঙ্কল্প থেকে চ্যুত হয় না। যার প্রাণধারা কামনা ও বাসনার ফলে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তার মনোবল বসে যায়, চেতনা ক্ষীণ হয়, সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়, মন নিরাশয় ভরে যায়। পদে পদে পদস্খলন ঘটে, কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে না। এই কারণে ব্রহ্মচর্য, বাক্যের সংযম, মনের সংযম এবং একাগ্রতার সাধনা, এ সমস্তই প্রাণশক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করার উপায়। এতে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং ধৈর্য দৃঢ় হয়। এ অধ্যাত্ম নয়, কিন্তু অধ্যাত্মতে পৌঁছবার উপায়। ঠিক নৌকোর মত। এ সবই

নৌকো বিশেষ। এটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। আমাদের গতি কোন্ দিকে? এই সাধনার মাধ্যমে আমরা যেখানে পৌঁছতে চাই সেখানেই পৌঁছতে পারি। সঙ্কল্প করলাম, আর অধ্যাত্মের সাধনা হয়ে গেল—ব্যাপারটা ঠিক এ রকম নয়। যে ব্যক্তি লক্ষ্য স্থির করতে পারে, লক্ষ্য স্থির করতে জানে, সে-ই শুধু সংকল্প করার অধিকারী। শিকারী যে লক্ষ্য সন্ধান করে তাতে তার সঙ্কল্প করতে এবং একাগ্র হতে হয়। শিকারীর কি একাগ্রতার অভাব হয়? লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীর কি একাগ্রতার অভাব হয়? তাদের একাগ্রতার অভাব হয় না। সম্পূর্ণ একাগ্রতা হলে তবে লক্ষ্য-বস্তুতে তীর লাগতে পারে। যোদ্ধাদেরও সঙ্কল্প প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চার্চিল সঙ্কল্পের প্রতীকস্বরূপ 'ভি' চিহ্ন দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক যোদ্ধাকে বলেছিলেন, 'ভি'-কে আপনি সর্বদা মনে রাখবেন। আমরা জিতব।' ঐ 'ভি' জেতার দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন। সৈনিকের যতটা দৃঢ় সঙ্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা হতে পারে অন্য লোকের তা হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই সঙ্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা কি আত্মোপলব্ধি? তা কি অধ্যাত্ম? তা নয়। ওটা উপায় মাত্র। সঙ্কল্প, ইচ্ছাশক্তি, প্রাণশক্তি, মনোবল, একাগ্রতা—এ সবই এক একটি উপায়। এখন এই সাধনকে আমি কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছি, কোন্ দিকে প্রবাহিত করছি সেটা উদ্দেশ্যের ওপরে নির্ভর করে। আত্মার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যও এর ব্যবহার হতে পারে। আত্মার অভিমুখে এর প্রয়োগ হতে পারে। এ সাধন মাত্র, অর্থাৎ উপায় বা উপকরণ মাত্র। আপনি তাকে কোন্ দিকে প্রয়োগ করবেন তা আপনার উদ্দেশ্যের ওপরে নির্ভর করে।

জপও এক সাধন। তা সাধন বা উপায়, সাধনার উদ্দেশ্য বা সাধ্য নয়। জপ প্রাণশক্তির এক প্রকার প্রয়োগ মাত্র। এতে শব্দ এবং মন দুয়ের সংযোগ হয়। শব্দ এবং মনের সমুচিত যোগ হলে এক বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয়। আমরা কথা বলি। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যুতেব তবঙ্গ উৎপন্ন হয। আমবা চিন্তা কবি। আমাদেব চিন্তাব সাথে সাথে বিদ্যুতেব তবঙ্গেব উদ্ভব হয। এই সব বিদ্যুৎ-তবঙ্গেব বিস্ময়কব প্রভাব হয।

বঙ, শব্দ, মন এবং উচ্চাবণ—এই চাব মুখ্য বস্তু। আমাব চিন্তন তথা আমাব জীবনেব সঙ্গে বঙেব গভীব সম্বন্ধ। বঙ দ্বাবা চিকিৎসাব পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। 'কালাব থেবাপি' বা বর্ণ চিকিৎসা এখনও চালু আছে। এক চিকিৎসা পদ্ধতিব নাম 'কসমিক বে থেবাপি' বা বিশ্বকিবণ চিকিৎসা। এবও বঙেব সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। বঙ এবং সূর্যকিবণ উভযেব সাথে এর সম্বন্ধ আছে। সূর্যেব আলোব সঙ্গে এব সম্বন্ধ। বঙ আমাদেব শবীব এবং মনকে নানা ভাবে প্রভাবিত কবে। তাতে বোগ সাবে, তা সে বোগ শাবীবিক বা মানসিক যাই হোক। মানসিক বোগেব চিকিৎসাতেও বঙেব বিশিষ্ট স্থান আছে। উন্মাদ বোগেবও বঙেব মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পাবে। বঙেব সামান্য বিকৃতি হলে মানুষ পাগল হযে যেতে পাবে। বঙের পূর্তি হলে লোক সুস্থ হয। শবীবে বঙেব ঘাটতি হলে অনেক বোগেব উৎপত্তি হয। 'কালাব থেবাপি' বা বর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতিব সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাণু থেকে বোগেব উৎপত্তি হয না। বঙেব ঘাটতি থেকেই বোগেব জন্ম হয। যে বঙেব ঘাটতি হযেছে তাকে পূবণ কবে দাও, বোগী সুস্থ হবে, বোগ নিবাময হবে। বোগ হওযা বা না হওযা, মানুষেব সুস্থ থাকা বা না থাকা, সবই বঙেব আধাবে ঘটে।

আমাদেব চিন্তাব সাথেও বঙেব সম্বন্ধ আছে। যখন মানুষেব মন কুচিন্তা বা অনিষ্টকব চিন্তায পূর্ণ, যখন সে অশুভকব চিন্তা কবে, তখন ঐ সব চিন্তাব পবমাণু কৃষ্ণ বর্ণ হয। তাব লেশ্যা বা কর্মবন্ধনেব কাবণ কৃষ্ণ বর্ণ হয। যদি সে সৎ, হিতকাবী বা শুভ চিন্তা কবে তবে তাব পুদ্গল হলুদ বঙেব হতে পাবে, আবাব লাল বা সাদাও হতে পাবে। তখন তেজোলেশ্যা, পদ্ম লেশ্যা বা শুক্ল লেশ্যা হতে পাবে। অসৎ চিন্তাব পুদ্গলেব বর্ণ কালো, সৎ চিন্তাব পুদ্গলেব বর্ণ হলুদ, লাল

বা সাদা। চিন্তাব সঙ্গে বর্ণেব কত বড সম্বন্ধ। যে বকম চিন্তা তাব সেই বকম বঙ।

শবীবেব সঙ্গে বঙেব গভীব সম্বন্ধ। প্রত্যেক লোকেব শবীবেব আশেপাশে বঙেব এক আভামণ্ডল আছে। তাতে অনেক রঙ হতে পাবে। কাবও আভামণ্ডলেব বঙ কালো, কাবও নীল, আবাব কাবও লাল বা সাদা হয। আবাব কাবও নানা বঙেব আভামণ্ডল হতে পাবে। আপনাব চোখ সে বঙ দেখতে পায না। কিন্তু তা অবশ্যই আছে। এমন কোন লোক নেই যাব চাবপাশে আভামণ্ডল নেই। মানুষেব আভামণ্ডলেব প্রভাব হয তাব নিজেব ওপবে। আবাব অন্যেব ওপবেও প্রভাব হয। আপনি কোন লোকেব কাছে গিযে বসেন। বসাব সঙ্গে সঙ্গে আপনাব মনে এক পবিবর্তন হয। আপনাব মনে হয আপনি এক অপূর্ব শান্তি অনুভব কবছেন। আপনাব মন আনন্দময হয, আব আপনাব অন্তবেব অন্তঃস্থলে এক মধুব সঙ্গীত হতে থাকে। আপনি অন্য এক লোকেব কাছে গিযে বসেন। অকাবণে আপনাব মন উদাস ও উদ্বিগ্ন হযে পডে। মনেব মধ্যে ক্ষোভ ও সন্তাপেব উদ্ভব হয। সেখান থেকে তাডাতাডি উঠে যাবাব ইচ্ছা হয। এসব কেন হয? ভিন্ন ভিন্ন লোকেব পাশে বসলে ভিন্ন ভিন্ন বকম ভাবনা দ্বাবা আমাদেব মন আক্রান্ত হয। এ বকম কেন হয এবং কি কবে হয? এব কাবণ হল, প্রত্যেক লোকেব নিজ নিজ আভামণ্ডল বা আভাবলয আছে। সামনে যিনি বসে আছেন তাঁব আভামণ্ডল বা আভাবলযেব যে বঙ তাব দ্বাবা পাশে যে লোক বসে আছে সে প্রভাবিত হবে। সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, সে সেই বঙ দ্বাবা প্রভাবিত হবে। যে লোকেব আভামণ্ডল সাদা, লাল, নীল বা হলুদ বর্ণেব, তাব পাশে এসে বসলে মন শান্ত হযে যায। শান্তিতে অন্তব পূর্ণ হয। যাব আভামণ্ডল বিকৃত, কৃষ্ণবর্ণ পুদ্গলে নির্মিত, তাব কাছে এলে মন অকাবণ দুশ্চিন্তাব ভাবে ওঠে, উদাস ভাব ও উদ্বেগে পূর্ণ হয, আব মনেব মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ-অসৎ ভাবনা আসতে থাকে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায, বঙ আমাদেব প্রভাবিত

করে থাকে।

এক হল রঙ, আর এক শব্দ। আমাদের জীবনে শব্দের প্রভাব পড়ে। মনের ওপরেও শব্দের প্রভাব হয়। শব্দের স্থূল প্রভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। একবার স্বামী বিবেকানন্দকে এক ব্যক্তি বলেছিল, 'শব্দ নিরর্থক। তার প্রভাব বা অপ্রভাব বলে কিছু নেই। তা নির্জীব পদার্থ।' বিবেকানন্দ শুনলেন, কিছুক্ষণ মৌন থেকে তিনি বললেন—'তুমি নির্বোধ। বসে থাক।' যাকে এ কথা বললেন সে রেগে আগুন হয়ে গেল। তার চেহারা বদলে গেল। তার চোখ লাল হয়ে গেল। সে বলল—'আপনি এত বড় সাধু হয়ে আমাকে গাল দিলেন। কি কথা ব্যবহার করছেন তাও ভেবে দেখলেন না।' বিবেকানন্দ মুচকি হেসে বললেন—'তুমি এখনি বলছিলে, শব্দের আবার কি প্রভাব। এখন নিজে এক 'নির্বোধ' কথাটিতে এই পরিমাণ প্রভাবিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছ!'

শব্দের ভেতরে শক্তি আছে। তা মানুষকে প্রভাবিত করে। আমি এতক্ষণ তার স্থূল প্রভাবের কথা বললাম। শব্দের অনেক সূক্ষ্ম প্রভাব আছে। আজকাল শব্দের দ্বারা চিকিৎসা হয়ে থাকে। শব্দের দ্বারা অপারেশন করা হয়। অপারেশনের জন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। শব্দের সূক্ষ্ম তরঙ্গ আসে, আর তার সাহায্যে চেরা-ফাঁড়ার কাজ হয়। শব্দের দ্বারা, সূক্ষ্ম ধ্বনির দ্বারা, কাপড় ধোলাই হয়। সূক্ষ্মতম ধ্বনির দ্বারা হীরা কাটা হয়। আগেকার দিনে বলা হতো হীরে দিয়ে হীরে কাটা হয়। এই সিদ্ধান্ত সবাই মানত। আজকাল সূক্ষ্ম ধ্বনির সাহায্যে হীরা কাটা হয়। যন্ত্র ঘুরতে থাকে, ধ্বনির সূক্ষ্ম তরঙ্গ নির্গত হতে থাকে এবং ক্ষণকালের মধ্যে হীরা কাটার কাজ সম্পন্ন হয়। এই হল শব্দের চমৎকারিতা। জপ এবং মন্ত্রের চমৎকারিত্ব এর থেকেও বেশি।

শব্দের উচ্চারণ ছয় রকম হতে পারে। যথা—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পরম সূক্ষ্ম। মন্ত্রবিদ আচার্যগণ বলেন, শব্দের হ্রস্ব

উচ্চারণ পাপ নাশ করে। দীর্ঘ উচ্চারণে শ্রীবৃদ্ধি ও স্ত্রী লাভ হয়, আর প্লুত উচ্চারণে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। আরও তিন প্রকার উচ্চারণ আছে—সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পরম সূক্ষ্ম। ওগুলি শুভ সমাপ্তি আনে, ব্যক্তির সঙ্গে ধ্যেয়ের সংযোগ করে। আপনি দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অর্হ' শব্দটি নিন। ঐ কথাটি আপনি উচ্চারণ করবেন। তার এক হ্রস্ব উচ্চারণ, এক দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। আর আছে প্লুত উচ্চারণ। আবার সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পরম সূক্ষ্ম উচ্চারণও হয়। পরম সূক্ষ্মে এসে আপনি অনুভব করবেন আপনি লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন, অর্হৎকে অনুভব করতে শুরু করেছেন। এই ছয় প্রকার উচ্চারণের প্রভাব বিভিন্ন রকম হয়। শব্দের ছয় প্রকার শক্তি আমাদের জানতে হবে। শব্দের অর্থ আর তার উচ্চারণ জানতে হবে।

চতুর্থ বস্তু হল মন। মনের সঙ্গে শব্দের সংযোগ করতে হবে। যে শব্দ আমরা জপ করছি তার সাথে মনের সংযোগ করতে হবে। এ সবের সমুচিত সংযোগ হলে জপের শক্তি উৎপন্ন হয়। কেবল নৌকো দিয়ে কাজ হবে না। কেবল মালা ঘোরালেই কোন কাজ হবে না। নৌকো দিয়ে নদী পার হতে হলে নৌকো ছাড়া আর কি কি জিনিস দরকার তা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। জপের সঙ্গে আর কি কি বস্তু প্রয়োজন তাও আমাদের বুঝতে হবে। 'ণমো অরহন্তানং' অতিশয় শক্তিশালী মন্ত্র—এ কথা খুবই সত্যি, কিন্তু তার উচ্চারণ যদি ঠিক না হয় তবে ঐ মন্ত্র কি করে ফল দেবে? তার উচ্চারণ কি উদ্দেশ্যে কি রকম হওয়া উচিত তা যতক্ষণ আমরা জানতে না পারি সে পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞতা ও দোষের জন্য আমরা মন্ত্র এবং জপ থেকে লাভবান হতে পারি না, অথচ আমরা সমস্ত দোষ মন্ত্র ও জপের ওপরে চাপিয়ে দিই। আমরা বলে বসি—'মন্ত্র থেকে কোন ফল হয় না।' শব্দের উচ্চারণের ধ্যেয়কে বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত জিনিস জপের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক।

জপের স্বরূপ কি? ধ্যেয়ের সাথে এক হয়ে যাওয়া হল জপ।

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তিনিবোধকে ধ্যান বলে স্বীকাব কবেছেন। চিত্তেব বৃত্তিসমূহেব নিবোধ ধ্যান। ধ্যানেব সম্বন্ধ চিত্তেব সঙ্গে। জৈন আচার্য বলেছেন—'ধ্যান 'ত্রিবিধম্', অর্থাৎ ধ্যান তিন প্রকাব—কাযিক ধ্যান, বাচিক ধ্যান এবং মানসিক ধ্যান। এ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন পবম্পবা। শবীবেব শিথিলীকবণ, শবীবেব স্থিবতা, তাব নাম—কাযিক ধ্যান। বচনকে ধ্যেযেব সঙ্গে যোগ কবা, বচন এবং ধ্যেয উভযেব সমন্বয ঘটানো, একত্ব সাধন কবাব নাম বাচিক ধ্যান। বাচিক ধ্যান বচনেব মাধ্যমে হয। বচনেব মাধ্যমে আমবা এমন একাগ্রতা প্রাপ্ত হই, ধ্যেয বস্তুতে এত লীন হযে যাই যে আমবা এবং আমাদেব ধ্যেযেব মধ্যে কোন ভেদ থাকে না।

আপনি 'ণমো অবহন্তাণং' এই মন্ত্র জপ কবেন, কিন্তু যত দিন ঐ মন্ত্র আপনাব মস্তিষ্কে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত না হবে, আব যত দিন আপনাব এ বকম অনুভূতি না হবে যে, 'আমি স্বযং অর্হতে পবিণত হচ্ছি' ততদিন পর্যন্ত 'ণমো অবহন্তাণং' এই মন্ত্র থেকে আপনাব ফলপ্রাপ্তি হবে না। হ্যাঁ, এটুকু লাভ অবশ্যই হবে, উচ্চাবণ দ্বাবা যে তবঙ্গ উৎপন্ন হয তাব দ্বাবা প্রাণশক্তিব কিঞ্চিৎ বিকাশ হবে। কিন্তু জপেব দ্বাবা আপনাবা অর্হৎ রূপে যে পবিণতি আনতে চেযেছিলেন, যে পবিণাম চেযেছিলেন, তা সম্ভব হবে না। এই বড লাভ থেকে বঞ্চিত হযে আপনি সামান্য লাভ প্রাপ্ত হবেন। অনেক বাব এ বকম হয—আমবা মহৎ ধ্যেযকে উদ্দেশ্য কবে চলতে থাকি, মহৎ বস্তু সামনে বেখে চলতে থাকি, কিন্তু এব মধ্যে ছোটখাটো লাভ প্রাপ্ত হলে আমবা মনে কবি আমাদেব উদ্দিষ্ট লাভ মিলেছে। এটা মস্ত আশঙ্কাব কথা। বিকাশেব পথে এই বিপদেব আশঙ্কা। আমবা মহৎ উদ্দেশ্য সামনে নিযে চলতে থাকি। আত্মোপলব্ধি সবচেযে বড উদ্দেশ্য, সেই আদর্শ নিযে আমবা চলি। মাঝখানে সামান্য কিছু পেযে যাই। তাকেই সব কিছু মনে কবে আমবা এগিযে যাওযাব চেষ্টা ছেডে দিই। এই সামান্যতেই আমবা সন্তুষ্ট হযে থাকি। এই সন্তোষ সমূহ আশঙ্কাব কাবণ। আমাদেব সন্তুষ্ট হওযা

উচিত নয়। পথ চলতে চলতে মিলে যাওয়া সাথীর মত এই সব ছোট-খাট পাওয়াগুলি আমাদের সাধনার পথে যাত্রাসহচর মাত্র। এক সাথী মিলল। তার সঙ্গে রাতভোর পান্থশালায় থাকলাম, আলাপ করলাম, মনোরঞ্জন করলাম। যদি আমরা তাকে আমাদের গন্তব্যস্থল মনে করে সেখানেই থেকে যাই তবে আমরা কোনদিনই আমাদের উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারব না। এই হল সাধনার পথে বিষম বিপদ। এ সমস্তই প্রাণবিদ্যার খেলা, এরা মধ্যপথে প্রাপ্ত সহযাত্রী মাত্র। মধ্যপথে এসে আমাদের সাথে এরা মিলিত হয় এবং মনোরঞ্জন করে। কিন্তু ওগুলি আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তি নয়।

আমাদের ধ্যেয় হবে অর্হতে পরিণত হওয়া। অর্হৎ বীতরাগ বা নিরাসক্ত। যার মধ্যে সমস্ত অর্হতা, ক্ষমতা, শক্তি ও যোগ্যতা বিকশিত হয় সে-ই অর্হৎ হতে পারে। তার মধ্যে অবিকশিত কোন কিছু থাকে না। এই আত্মোপলব্ধির নাম—অর্হৎ। আমাদেরও অর্হৎ হতে হবে। এই জন্যই আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র জপ করে থাকি। এই মন্ত্র জপ করার আগে আমাদের মনে এই ভাবনা, এই সঙ্কল্প হওয়া প্রয়োজন যে 'আমি অর্হৎ, আমি অর্হৎ'। আর জপ করার সময় আমাদের মনে এই ধারণা হওয়া প্রয়োজন যে 'আমি অর্হতে পরিণত হচ্ছি, আমি অর্হতে পরিণত হচ্ছি।' এই ধারণা, এই ভাবনা করে নিতে হবে। তার পরে আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র জপ করতে পারব। আমি অর্হৎকে নমস্কার করছি না, আমি নিজেই অর্হতে পরিণত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছি। অর্হতের সম্পূর্ণ মূর্তিচিত্র এমনভাবে আমাদের মস্তিষ্কে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আর তার আশেপাশে আমাদের ধ্বনি চলতে থাকবে এবং সেই শব্দ-তরঙ্গ বাস্তবে অর্হতের রূপে আমাদের পর্যায়ের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করবে। আমি অর্হতের রূপে বদলে যেতে থাকব আর কিছু দিনের মধ্যেই জানতে পারব যে রাগ, দ্বেষ ও বাসনা কমে যাচ্ছে, অর্হতা জেগে উঠছে, শক্তিসমূহ বিকশিত হচ্ছে। তখন বুঝতে হবে জপ সম্যক ভাবে হচ্ছে। সব

কিছু সামগ্রী পাওযা গেছে। নৌকো আছে, নাবিক ও দাঁড়ি পাওযা গেছে। সমস্ত উপকবণ পাওযা গেছে। নৌকো ঠিক খেযা পাব কবছে। যদি উপকবণেব কোন ঘাটতি বা বিফলতা থাকে, এবং আপনি জপেব দোব দিতে থাকেন, তবে জপ আপনাকে পেছনে ফেলে চলে যাবে।

২৫

একাগ্রতা

যাঁরা সাধনা করেন তাঁরা ধ্যেয়কে কল্পনা করে নিয়ে মনকে তার সঙ্গে সংলগ্ন করেন। মনকে এমন দৃঢ়ভাবে তার সঙ্গে সংযুক্ত করবেন, যাতে ঐ সংযোগ কোনক্রমে শিথিল না হয়। যদি কখনও কখনও মন ধ্যেয় থেকে বিচ্যুত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার সামনে কোন বিকল্প এসে যায়, তবে জাগরূক সাধক মনকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাঁর সমগ্র শক্তির দ্বারা ধ্যেয়ের দিকে চালিত করবেন। তখন মন ধ্যেয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই ধারাবাহিক জ্ঞান একই দিকে একই ধ্যেয়ের উদ্দেশ্যে চালিত হবে। সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। মধ্যপথে যদি কোনও ছেদ ঘটে তবে তখনই সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এই হল মনের সমাধি, এর নাম মনের একাগ্রতা। যখন এই একাগ্রতায় আমরা সিদ্ধ হই তখন ঐ অবস্থায় স্থিতিকালে আমরা বিভিন্ন সূক্ষ্ম দৃশ্যের আভাস পাই। অনেক রকম সূক্ষ্ম বস্তু দেখতে পাই। জ্যোতির দর্শন হয়। সূক্ষ্ম লোকে বিচরণকারী আত্মার দর্শন মেলে। স্থূল জগতের অতীত অনেক প্রকার শব্দ শোনা যায়। স্থূল জগতের অতীত রূপ দেখা যায় এবং অনুভূতি লাভ হয়। আমাদের অনুভূতির জগৎ বদলে যায়। এই রকম স্থিতিতে আনন্দের অনুভূতি হয়।

কিন্তু তা কোন উৎকৃষ্ট সফলতা নয়, কিংবা চবম সমাধি নয়। তবে তা আত্মবিকাশেব দিকে আমাদেব এক পদক্ষেপ। সেখানে পৌঁছলে মন আব ফিবে আসতে চাইবে না। মন আব নিচে নেমে আসতে চাইবে না। এটা নিশ্চিত সত্য।

ঐ স্থিতি প্রাপ্ত হলে উৎক্রমণ হতে থাকে। আমাদেব জীবনে পবিবর্তন ঘটতে থাকে। ভক্ত রুইদাস মস্ত বড সাধু ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন চামাব। তিনি পবম আত্মজ্ঞানী সাধক ছিলেন। তিনি কাশীতে বাস কবতেন এবং নিজে নিজেই সাধনা কবতেন। তিনি ছোট এক ঝুপড়িতে থাকতেন। তাঁব স্ত্রী ছিল এবং ছোট একটি পবিবাব ছিল। তিনি জুতো সেলাই কবতেন এবং তা থেকে যা পেতেন তাই দিযে তাঁব সংসাব চলত। ঐ কাজ থেকে যখনই নিবৃত্ত হতেন তখনই সাধনায নিমগ্ন হযে যেতেন। একদিন এক সাধু রুইদাসেব সঙ্গে দেখা কবতে এলেন। তিনি রুইদাসেব তত্ত্বজ্ঞান ও প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন। এসে তিনি দেখে ভাবলেন—'আবে। ইনি এমন দবিদ্র অবস্থায থাকেন। এত বড সাধু, অথচ এত দবিদ্র। এ বকম ফুটোফাটা ঝুপডিতে থাকেন আব জুতো সেলাই কবেন। এঁব কাছে কিছুই নেই।' তিনি রুইদাসেব সঙ্গে দেখা কবলেন। তাঁব পা ছুঁযে প্রণাম কবে বললেন—'মহাবাজ। আমি আপনাকে কিছু ভেট দিতে এসেছি। আপনাব অবস্থা দেখে আমাব প্রাণ কাঁদছে। আমি আপনাকে এই পবশ পাথব দিচ্ছি। আপনি এটি গ্রহণ করুন। আপনি এবকম হীন অবস্থায আব থাকবেন না, সচ্ছল অবস্থায জীবনযাপন করুন।' রুইদাস বললেন—'ভাই। আমাব পবশ পাথবেব কোন প্রযোজন নেই। আমি বেশ ভাল অবস্থায আছি। আমাব কোন অভাব নেই। জীবনধাবণেব জন্য যা প্রযোজন সে সবই আমাব আছে। আমাব মনে পূর্ণ সন্তোষ আছে। যাব মনে অসন্তোষ আছে তাকে ঐ পবশ পাথব দাও। আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমাব পবশ পাথবেব কোন প্রযোজন নেই।'

সাধু পরশ পাথর তাঁকে দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। রুইদাসও 'না, না' করতে লাগলেন। তিনি নেবেন না, আর সাধুও পরশ পাথর তাঁকে না দিয়ে সেখান থেকে যাবেন না। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে জেদাজেদি হতে থাকল। শেষমেষ রুইদাস বললেন—'বেশ, তোমার যখন এতই আগ্রহ তখন ঐ পরশ পাথর এই ঝুপড়ির চালায় কোথাও গুঁজে রেখে যাও।' সাধু চালায় পরশ পাথর গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

রুইদাসের জীবনের ধারা ঠিকই চলতে থাকে। তাঁর লালসাও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। জীবনযাত্রার জন্য যা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। তাঁর কোনও অসন্তোষ ছিল না। তাঁর সামনে এমন কোন সমস্যা ছিল না যার সমাধানের জন্য পরশ পাথর দরকার হবে। সত্যিই কোন সমস্যা ছিল না। তিনি তো সেই জিনিস পেয়ে গিয়েছিলেন যা পেলে পরশ পাথরের আর কোনও মূল্য থাকে না।

কয়েক মাস চলে গেল। সেই সাধু আবার রুইদাসের কুটিরে ঘুরে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন—এখন সন্ত রুইদাসের বাড়িতে কত আড়ম্বর দেখব। কত ঐশ্বর্য, কত সুন্দর প্রাসাদ, কত রাজকীয় আড়ম্বর দেখতে পাব। উনি তো সাধু হয়েছেন, সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু রাজকীয় হালচালের মোহ যায় নি। তিনি এসে দেখলেন সেই ফুটো-ফাটা ঝুপড়িই আছে, আর ভক্ত রুইদাস আগের মত বসে জুতো সেলাই করছেন। 'আরে। এ কি? উনি কি পরশ পাথর ব্যবহারই করেন নি। ব্যবহার করলে আজ এই দশা থাকত না। জুতো সেলাই করার অবস্থা থাকত না আজ। ইনি যেমন অবস্থায় ছিলেন ঠিক তেমন অবস্থায় এখনও আছেন।'

বিতর্কের বিষয়। যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি এমন দারিদ্র্যের জীবন যাপন করতে পারেন? যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি জুতো সেলাইয়ের কাজ করতে পারেন? যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি সামান্য শুকনো রুটি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন?

কখনই তা সম্ভব নয়। লোকে তো পরশ পাথরের নামে লালায়িত হয়। কিন্তু যাঁর কাছে সেই পরশ পাথর আছে যা এক মুহূর্তে লোহাকে সোনা করতে পারে, যাঁর হাতে লোহাকে সোনা করার শক্তি এসেছে, তিনি কি থেকে কি হয়ে যান। তাঁর মাটিতে পা পড়ে না, তিনি চলেন না, আকাশে ওড়েন। কেউ আবার এই রকম হয়।

কোন লোক এমনও হয় যে তার পরশ পাথর মিলেছে, পরশ পাথর তার সামনে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তার মনে চিন্তা আসে নি যে 'আমি লোহাকে সোনা বানিয়ে নেব। পরশ পাথরের সাহায্যে আমি অনেক সম্পদ সংগ্রহ করব, উত্তম বাসগৃহ তৈরি করে নেব, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরব'—এসব কিছুই সে স্বপ্নেও ভাবে নি। রুইদাস কখনও ভাবেন নি, 'পরশ পাথর পড়ে আছে, এখন আর আমার জুতো সেলাই করার দরকার কি আছে? যখন চাইব, এবং যত চাইব সব কিছুই হতে পারবে।' বরং ভেবেছেন, 'জুতো সেলাই থেকে আমি পরম সন্তোষ অনুভব করছি। ভাঙ্গাচোরা ঝুপড়িতে আমি পরম সন্তোষ অনুভব করছি। শুকনো রুটিতে পরম আনন্দ আর আত্মতৃপ্তি অনুভব করছি। ফুটোফাটা ঝুপড়িতেই আমি সন্তুষ্ট আছি।' এসবের মূল কারণ কি। এই পরম সন্তোষ কোথা এসেছে? তার হেতু কি? এই পরিবর্তন কেন আসে? যখন আমরা তার কারণের খোঁজ করি তখন জানতে পারি যে ঐ পরিবর্তন মানসিক সমাধির স্তরে হয়। ভক্ত রুইদাস নিজের মনকে সেই স্তরে, সেই আনন্দের ভূমিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন যেখানে পৌঁছলে সোনার আনন্দ, উত্তম বাসগৃহ, উত্তম ভোজ ইত্যাদি সব কিছুর আনন্দ শেষ হয়ে যায়। সমস্ত আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। তার আর মনে হয় না সেগুলি বড় জিনিস, বিশিষ্ট উপলব্ধি বা মূল্যবান বস্তু। তার কাছে সমস্ত জাগতিক সম্পদের মূল্য শেষ হয়ে যায়। এ কথা নিশ্চিত সত্য, জাগতিক বস্তুর মূল্য নিজের কাছে শেষ হয়ে না গেলে কোন মানুষ ঐ রকম আচরণ করতে পারে না। যতদিন তার মনে পরশ পাথরের লোহাকে সোনা করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে মূল্যজ্ঞান

থাকবে, আর সোনা দিয়ে ভাল ভাল জিনিস সংগ্রহ করে অবস্থাপন্ন লোক হওয়ার মূল্যবোধ থাকবে, ততদিন সে এ রকম আচরণ করতে পারবে না যে, সামনে পরশ পাথর পড়ে থাকলেও সে জুতো সেলাই করবে, একটা শুকনো রুটি খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করবে। ঐ পরিস্থিতিতে এ রকম হওয়া সম্ভব নয়। ঐ রকম তখনই হতে পারে যখন তার চেয়েও বড় কোন আনন্দ লাভ তার হয়। এই রকম এক ঘটনা ঘটেছিল।

এক ব্যক্তি এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বলল—'বাবা! আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দিন।' সন্ন্যাসী বললেন—'তোমাকে দেব এমন আমার কি আছে। আমি তো সব কিছু ত্যাগ করেছি। তোমাকে কি দেব?' লোকটি বলল—'না, না, তা হবে না। বড়ই আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। নিরাশ হয়ে ফিরে যাব না। কিছু না কিছু দিতেই হবে।' সে বড়ই জেদ করতে লাগল। সন্ন্যাসী ভাবলেন—'বড়ই মুশকিল তো। আমার কাছে এক দানাও খাদ্য নেই। এই বেচারিকে কি দেব? ও তো নিজের জেদ ছাড়বে না দেখছি। কি করব?' শেষমেশ সন্ন্যাসী বললেন—'ভাই! আমার কাছে তো কিছু নেই। এই দিকে নদী আছে, তার পাশে চলে যাও। আমি কালই ওখানে একটা পাথর ফেলে দিয়েছি। ওটা পরশ পাথর। ওর ছোয়ায় লোহা সোনা হয়। ঐ পাথর লোহাতে ছোঁয়াও, লোহা সোনা হয়ে যাবে। যাও, ঐ পাথর নিয়ে চলে যাও।'

পরশ পাথরের কথা শুনে লোকটা লালায়িত হল। মন ভবিষ্যতের কল্পনায় ভরে উঠল। সে দৌড়তে দৌড়তে নদীর তীরে গেল। পরশ পাথর দেখতে পেল। রোদে চকচক করছে। সে সেটা তুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল। হঠাৎ অন্য এক চিন্তা মাথায় আসতে তার হাত মাঝপথে থেমে গেল। সে ভাবল, সন্ন্যাসী পরশ পাথর ফেলে দিল কেন? কেন ফেলে দিল? কোন লোক কি কখনও পরশ পাথর হাতে পেয়ে তা ফেলে দিতে পারে? না, কখনও তা পারে না। তবে কি এটা

নকল পরশ পাথর? না, নকলও নয়। কিন্তু যদি আসলই হয় তবে সন্ন্যাসী এটাকে ফেলে দিয়েছেন কেন? নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর কাছে এর চেয়েও বেশি দামী কোন বস্তু আছে, তাই তো তিনি এই কম মূল্যবান পাথর ফেলে দিয়েছেন। তাঁর কাছে যদি এর চেয়ে বেশি ভাল বস্তু থাকে তবে তিনি এই পরশ পাথর কখনও ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন না। সন্ন্যাসী তো আর সে রকম মূর্খ নন। সে ফিরে এসে সন্ন্যাসীকে বলল—'মহারাজ! আমি পরশ পাথর চাই না।' যে জিনিস পেয়ে আপনি পরশ পাথর ফেলে দিয়েছেন আমাকে সেই জিনিস দিন।' লোকটির যুক্তি অতি সুন্দর।

এ কথা অত্যন্ত সত্যি যে পরশ পাথরের চেয়ে বেশি মূল্যবান বস্তু না পেলে, হস্তগত না করলে, কেউ পরশ পাথর ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। তার চেয়ে কোন মূল্যবান বস্তু পেলে তবে পরশ পাথরের মূল্য শেষ হয়ে যায়। আর তখন লোকে তা ফেলে দিতে পারে। রুইদাস পরশ পাথরের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান বস্তু আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁর পরশ পাথরের ওপরে কোন আকর্ষণ ছিল না। কাজেই তাঁর মনের আকর্ষণ তুচ্ছ বস্তুকে সরিয়ে দিয়ে মহৎ বস্তুর ওপরে কেন্দ্রিত হয়েছিল।

তেরাপন্থ ধর্মসঙ্ঘের চতুর্থ আচার্য ছিলেন শ্রীমজ্জয়াচার্য। তিনি মুনির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক বার তিনি পালীতে এসেছিলেন। বাজারের এক দোকানে তিনি অবস্থান করলেন। তাঁর বয়স তখন খুব কম। সেখানে এক নটমণ্ডলী এসে উপস্থিত হল। তারা দোকানটির সামনের ময়দানে তাদের কাজ শুরু করে দিল। বহু দর্শক সমবেত হল। 'নাটক আরম্ভ হল। এক ঘণ্টা ধরে অভিনয় চলল, তার পরে শেষ হয়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে একজন তার সাথীকে বলল—'তেরাপন্থ ধর্মসঙ্ঘের ভিত্তি আরও একশ' বছরের জন্য দারুণ দৃঢ় হয়ে গেল।' ঐ লোকটি জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কি করে সে কথা জানতে পারলে? কেমন করে এ জ্ঞান লাভ হল? কোন গল্প

ফাঁদানোব তাল কবছ নাকি ?' তখন প্রথম লোকটি বলল, 'নাটক এক ঘণ্টা ধবে চলল। নট বড সুন্দব অভিনয কবছিল। কিন্তু আমি নাটক একেবাবেই দেখি নি। আমি তো সামনেব দোকানে সমাসীন নবীন মুনিকে এক ঘণ্টা ধবে দেখেছি। ঐ মুনি চোখ তুলেও এদিকে চেযে দেখেন নি। আমি এক দৃষ্টিতে ঐ মুনিকে দেখেছি। আমিও নাটক দেখি নি, আব ঐ মুনিও দেখেন নি। আমি ঐ মুনিব মানসিক একাগ্রতা দেখছিলাম। যে সঙ্ঘে এ বকম মুনি হয সে সঙ্ঘের ভিত্তি দৃঢ না হয়ে পাবে না।'

মুনিব এই বকম ভাবনা কি কবে হল ? এই পবিবর্তন কি কবে এল ? এ বকম হওযা কি স্বাভাবিক ? না, একেবাবেই না। প্রত্যেক লোকই এ বকম পবিস্থিতিতে বস গ্রহণ কবে। বুড়ো বা জোযান, বালক ব কিশোব, স্ত্রী বা পুরুষ, যাই হোক না কেন, সব মানুষই আমোদ প্রমোদে বস পায। সকলেব চোখই অভিনয দেখাব জন্য উৎসুক হয়। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী এক মুহূর্তেব জন্যও নাটকেব দিকে দৃষ্টিপাত কবেন নি। কেন কবেন নি ? তাব একটাই কাবণ, যে ভূমিতে নাটক দেখা থেকে আনন্দ পাওযা যায তিনি তা থেকে অনেক ওপরে উঠে গিযেছিলেন। বাহ্য আনন্দেব স্রোত তাঁর মনকে আকর্ষণ কবত না। তিনি তো অনেক বড নাটক দেখছিলেন। কাজেই নটেব অভিনীত নাটক তাঁব কাছে অকেজো এবং অনাবশ্যক বস্তুতে পবিণত হযেছিল।

এটা সনাতন সত্য, কোন লোক শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্ত হলে সামান্য বস্তুসমূহেব ওপবে তাব আকর্ষণ কমে যায। কোন লোক রুটি খাচ্ছে। এমন সময তাব সামনে মিষ্টি এসে গেল। সে রুটি ছেড়ে মিষ্টি খেতে শুরু কবে। তাব কাবণ মিষ্টিব সঙ্গে তুলনায রুটিব মূল্য কম। মিষ্টিব চেযে রুটিব মূল্য কম হওযাতে তাব কাছে রুটিব আকর্ষণ কমে যায, মিষ্টিব আকর্ষণ বেডে যায। যে শ্রেষ্ঠ বস্তুব প্রতি আপনাব আকর্ষণ হয তা অপকৃষ্ট বস্তুব প্রতি আকর্ষণ শেষ করে দেয।

আমাদেব সঙ্ঘেব এক সাধু ছিলেন সতীদাসজী। আচার্য ভিক্ষু

যখন তাঁকে স্মরণ করতেন তখন যদি কেউ তাঁর কাছে গিয়ে বলত, 'স্বামীজি আপনাকে স্মরণ করেছেন, আপনাকে ডাকছেন,' তখুনি তাঁর দুই হাত জুড়ে যেত এবং ঐ অবস্থায় হাতে যা কিছু থাকত, তা মাটিতে পড়ে যেত এবং ভেঙ্গে যেত। হাতের জিনিস মাটিতে রেখে তার পরে কৃতাঞ্জলি হবেন এ কথা তাঁর মনে থাকত না। তিনি স্বামীজির আদেশ পাওয়া মাত্র কৃতাঞ্জলি হতেন। এই রকম করা তাঁর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। আচার্যের আজ্ঞার প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ ছিল যে তার সামনে বা তাঁর হাতে জল, আহার্যে পূর্ণ পাত্র বা কোন পুস্তক আছে, সে বোধ তাঁর থাকত না। তাঁর হাতে যা কিছু থাকত তা মাটিতে পড়ে যেত। তাঁর মন সেই ভূমিতে পৌঁছেছিল যেখানে আর সব আকর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে।

সাধনা মানুষের মনকে এমন এক স্তরে নিয়ে যায় যেখানে পৌঁছলে মানুষ এক পরম ভূমিকা প্রাপ্ত হয়, তার মনে এক বিশেষ আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে আর সমস্ত আকর্ষণ মিশে যায়, শেষ হয়ে যায়। ঐ স্তর একাগ্রতার ভূমিকা। তা মানসিক সমাধি, চিত্তের- সমাধি। সে সাধক এই স্তরে পৌঁছেছে, সে অগণিত সমস্যা অতিক্রম করেছে। বস্তুজগতে যত অসন্তোষ, লালসা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা সংঘর্ষ উৎপন্ন হয় সব কিছু থেকে ঐ সাধক ছুটি পেয়ে যায়। সমস্ত সমস্যা লোপ পেয়ে যায়, সাধক তাদের অতিক্রম করেন।

আমাদের ধ্যেয় উচ্চ হবে, আত্মাভিমুখ হবে। ধ্যেয় নিম্ন স্তরের হওয়া উচিত নয়। উচ্চ ধ্যেয় এবং নিচ ধ্যেয় উভয় ক্ষেত্রেই একাগ্রতার কার্যকারিতা আছে। তার কার্যক্ষমতায় কোন বাধা হয় না। একাগ্রতা শক্তিস্বরূপ। এক ধারায় প্রবহমান মনে তার উৎপত্তি। মন এক ধারায় ওপরের দিকেও বয়ে যেতে পারে, আবার নিচের দিকেও প্রবাহিত হতে পারে। ঐ রকম এক ধারায় প্রবাহিত হওয়া থেকেই একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। তা থেকে উর্জা বা ওজঃশক্তি আসে। ঐ শক্তি নিজের কেরামতি দেখাবে। কিন্তু যদি নিচ ধ্যেয়ের ওপরে মনকে একাগ্র করা

যায় তবে নিম্ন স্তরে শক্তির বিস্ফোরণ হবে। তা থেকে কোনই উপকার হবে না। নিম্নগামী শক্তি চেতনার প্রবাহকে নিচের দিকে নিয়ে যাবে। যদি উচ্চ ধ্যেয়ের ওপরে মনকে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করা হয় তবে শক্তির বিস্ফোরণ হবে উচ্চ স্তরে। তা মনকে বিকশিত করবে এবং অনেক উপলব্ধির বাহক হবে।

একটা কথা ভেবে দেখবেন। একাগ্রতা খুব ভাল জিনিস। কিন্তু তারও একটা সময়ের সীমা আছে। এ কথা আপনাদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আজ বীজ বপন করলেন, আর আজই বৃক্ষ তৈরি হবে, এ অসম্ভব কথা। তার জন্য একটা সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। ঠিক এই ভাবে একাগ্রতার ফললাভ করার জন্য একটা সময়ের পরিমাণ ধার্য আছে। আজ একাগ্রতার অভ্যাস আরম্ভ করলেন। পাঁচ, দশ বা বিশ মিনিট অভ্যাস করতে লাগলেন। বেশ ভাল অনুভূতি হতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ ফল লাভ হয় না। এখন বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার অবস্থা। তা থেকে গাছের চারা গজাতে সময় লাগবে। কাল পূর্ণ হলে তবে বীজ থেকে বৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভব হবে। প্রথমেই তা সম্ভব হবে না। সেই রকম, আপনি যদি আপনার মনকে তিন ঘণ্টা ধরে প্রবাহিত করতে পারেন তবে আপনার বোধ হবে একাগ্রতায় আপনার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তখন তাতে ফল ফলতে আরম্ভ করবে। আমাদের সময়ের সীমাও বুঝতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, একাগ্রতা কি করে হবে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। মন চঞ্চল। সে এক ধারায় বইতে চায় না, একদিক লক্ষ্য করে চলতে চায় না। মনের চঞ্চল অবস্থায় একাগ্রতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মনকে এক ধারায় প্রবাহিত করা যেতে পারে কি উপায়ে? এটা অনুভূত সত্য যে, মন যতক্ষণ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ তা এক দিকে প্রবাহিত হবে না। মনকে সূক্ষ্ম না করতে পারলে আমরা তাকে ধ্যেয়ের ওপরে এক ভাবে নিবদ্ধ করে রাখতে পারব না। এখন প্রশ্ন, মনকে কি ভাবে সূক্ষ্ম করা যায়? এর উত্তর: মনকে সূক্ষ্ম করার যে উত্তম উপায়টি

আছে তা হল, শ্বাসের অভ্যাস। শ্বাসের ওপরে ধ্যানকে কেন্দ্রিত করা, মনকে নিয়োগ করা মনকে সূক্ষ্ম করার নির্ভুল উপায়। ঠোঁটের ওপরে এবং নাকের নিচে যেখানে শ্বাসের স্পর্শ অনুভূত হয় এবং ঘর্ষণ হয় সেখানে মনকে কেন্দ্রিত করা, ঐ স্পর্শবিন্দুতে মনকে স্থির ভাবে সংলগ্ন করা, নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসকে অনুভব করা প্রয়োজন। তা থেকে শ্বাস দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হবে। এই প্রয়োগ যত পারেন অভ্যাস করুন। যদি চান দশ-বিশ-ত্রিশ বা ষাট মিনিট কাল অভ্যাস করুন। তাতে কোন আপত্তি নেই।

ঐ রকম অভ্যাস-কালে আপনার অনুভূতি হবে, অতীতের সমস্ত স্মৃতি, বর্তমানের সমুদয় চিন্তা ও ভবিষ্যতের কল্পনার ভার হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে, একে একে ঐ সমস্ত ভার নিচে নেমে যাচ্ছে এবং লঘুতা প্রাপ্ত হচ্ছে। যখন মন এভাবে হাল্কা হয়ে যাবে তখন তাকে যে দিকে চালিত করা যাবে সে দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরবে না। সেই দিকেই চলতে থাকবে। সুতরাং শ্বাসের দ্বারা, শ্বাসের প্রক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা আমরা যেন মনকে হালকা করি। মনকে হালকা করে একদিকে দীর্ঘকালের জন্য চালিত করলে একাগ্রতায় সিদ্ধিলাভ হতে পারে এবং তা থেকে যে যে ফল পাওয়া সম্ভব তা সবই পাওয়া যেতে পারে।

২৬

সাধনার তিন পক্ষ

কিছু লোক অন্যকে অনেক প্রযোগ শেখায এবং নিজেবাও সেগুলি আচবণ কবে। তাবা বিশেষ শক্তিশালী সাধক। কিন্তু সাধাবণ লোকেব পক্ষে এ বকম করা সম্ভব নয। তাব কাবণ, কতকগুলি প্রযোগ সব লোক আচবণ কবতে সমর্থ হবে না। তাবা যদি ঐ সমস্ত প্রযোগ অভ্যাস কবতে যায তবে বিশেষ ক্লেশকব অবস্থায পডবে। ঐ সমস্ত প্রযোগ শক্তি এবং বিশেষ যোগ্যতাব ওপবে নির্ভর কবে। কিন্তু অনেক প্রযোগ আছে যা সর্বসাধাবণ অভ্যাস কবতে পাবে। প্রত্যেক লোকই সেগুলি আচবণ কবতে পাবে। সবাব পক্ষেই ঐ প্রযোগগুলি আচবণ কবা সম্ভব। আমি আগে থেকে এই বকম চিন্তা কবেছি যে আমবা এই শিবিবে একটি প্রযোগ শিক্ষা কবব এবং পববর্তী শিবিব পর্যন্ত সেটি অভ্যাস কবব। তাবপবে আমবা অন্য একটি প্রযোগ নেব এবং সেটি তাব পবেব শিবিব পর্যন্ত আচবণ কবব। প্রত্যেক প্রযোগ অন্তত ছয মাস কাল অভ্যাস কবা উচিত। যদি অনুভূতি হয তবে আবও দীর্ঘকাল আচবণ কবা যেতে পাবে।

সাধনাব তিনটি অঙ্গ—অধ্যাত্ম, প্রাণ এবং ব্যবহাব। আমাদেব কেবল প্রাণবিদ্যাব ওপবে নির্ভব কবলে চলবে না। আমাদেব মুখ্য ধ্যেয অধ্যাত্ম বা আত্মিক বিকাশ। তা চৈতন্য বিকাশেব পথে সবচেযে

উঁচু ভূমি।

সাধনার দ্বিতীয় পক্ষ—প্রাণের প্রযোগ। এরও আবশ্যকতা আছে। আমাদের প্রাণবল, মনোবল এবং শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে অধ্যাত্ম পর্যন্ত পৌঁছনোর সুবিধে হয়।

সাধনার তৃতীয় অঙ্গ—ব্যবহার সম্বন্ধীয়। যদি অধ্যাত্মের সাধনা তথা প্রাণের সাধনা চলতে থাকে অথচ ব্যবহারের কোন পরিবর্তন না হয়, তবে তা মানুষের ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার হযে দাঁড়াবে। সাধনার সাথে সাথে আমাদের ব্যবহারেরও পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধ্যাত্মের বিকাশ হতে থাকলে ব্যবহার আপনা থেকে বদলাতে থাকে, না বদলে পারে না। অধিকন্তু সাধনার বিকাশের সঙ্গে সমান তালে ব্যবহারেরও পরিবর্তন হওয়া প্রযোজন। ব্যবহারের সাধনা অধ্যাত্ম সাধনার পরিপূরক এবং সহযোগী প্রমাণিত হবে। আজ আমি এক প্রয়োগের চর্চা করব।

অধ্যাত্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ছয় মাস কাল অহং বিসর্জন করুন। অহংকার এবং মমকার—এই দুই অধ্যাত্ম সাধনার তথা চৈতন্য-বিকাশের পথে অন্তরায়। আপনি অহং বিসর্জনের প্রযোগ অভ্যাস করুন।

প্রাণসাধনার ব্যাপারে দুটি কথা আছে—এক দীর্ঘশ্বাস, আর এক সমতাল শ্বাস। আপনি এই দুয়েরই অভ্যাস করুন। দীর্ঘ শ্বাস নিন। শ্বাস যত দীর্ঘ হবে, মনের বিকার তত কমে যাবে। ক্রোধ কমে যাবে। আবেগ কমে যাবে। শ্বাস যত ছোট হবে, মনের বিকার ততই বেশি হবে। যখন শ্বাস দীর্ঘ এবং পুরো হয় তখন তা আমাদের ভেতরকার সব উত্তেজনাকর বস্তুকে নিষ্কাশিত করে। এ রকম ঘটার পেছনে এক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। ফুসফুসে রক্তের শোধন হয়, হার্ট বা হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত শরীরের মধ্যে সঞ্চালিত করে।

হার্ট থেকে সঞ্চালিত হবে রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সেই রক্তের সঙ্গে সংস্কার শরীরে প্রবাহিত হয়। রক্ত যত শুদ্ধ হবে, মন তত

শান্ত হবে। আবেগ কমে যাবে। বক্ত যত দূষিত হবে, স্বভাব তত উত্তেজনাপূর্ণ হবে, ক্রোধ তত বেশি হতে থাকবে। যখন আমবা দীর্ঘ শ্বাস নিই তখন ঐ শ্বাসেব সঙ্গে সব কার্বন, সব দূষিত বস্তু আমাদেব শবীব থেকে বাইবে চলে যায়। ছোট শ্বাস নিলে সম্পূর্ণ অক্সিজেনও আমাদেব শবীবেব ভেতবে প্রবেশ কবে না, আব শবীবেব ভেতবে যে সমস্ত ময়লা জমেছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হয না। এই জন্য মানুষেব স্বভাবেব পবিবর্তন হয না। তাই দীর্ঘ শ্বাস অভ্যাস অত্যন্ত প্রযোজন।

দ্বিতীয় ব্যাপাব হল, আমাদেব সমতাল শ্বাস নিতে হবে। সঙ্গীতে যতক্ষণ তালেব সমতা না হয ততক্ষণ সঙ্গীতেব আনন্দ পাওযা যায না। তালেব সমতা চাই। শ্বাসের ক্ষেত্রেও তালেব মূল্য আছে। শ্বাস সমতাল হওযা প্রযোজন। প্রথম শ্বাস নিতে এবং ছাড়তে যতটা সময লেগেছে, দ্বিতীয, তৃতীয এবং তাব পরবর্তী নিশ্বাসসমূহে ততটাই সমব লাগা বাঞ্ছনীয। সমযেব কোন তফাৎ যেন না হয। আমবা যখন চলি তখন যদি প্রথম পদক্ষেপ এক দিকে, দ্বিতীয পদক্ষেপ আব এক দিকে, তৃতীয পদক্ষেপ অন্য আব এক দিকে হয তাহলে আমবা অগ্রসব হতে পাবি না। যখন আমাদেব পদক্ষেপ একই দিকে একই ভাবে হয তখন আমাদেব অগ্রগতি হয। শ্বাস সমতাল হওয়া প্রযোজন। মনে করুন, প্রথম শ্বাস নিতে ও ছাড়তে আপনাব বিশ সেকেণ্ড লেগেছে। দ্বিতীয এবং তৃতীয শ্বাসেও বিশ সেকেণ্ড কবে লাগা উচিত। এই হল সমতাল শ্বাস। এতে এমন এক লযবদ্ধতাব সৃষ্টি হয যে মানুষ সহজে ধ্যানেব স্থিতিতে পৌঁছে যায। শান্তি আসে। আসনে বসে প্রযোগ কবাই শুধু ধ্যান নয। যখন আমাদেব মন শান্ত থাকে, যখন আমাদেব মনে কোন উদ্বেগ থাকে না তখনই আমাদেব ধ্যানেব স্থিতি হয। সমতাল শ্বাস থেকে এই অবস্থা আসে। প্রাণেব দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি দিক আছে—দীর্ঘশ্বাস এব সমতাল শ্বাস।

এব পবে তৃতীয কথা—ব্যবহাব সম্বন্ধে। ব্যবহাবেব দৃষ্টিকোণ থেকে

সাধকেব করুণা অভ্যাস কবা উচিত এবং তা আগামী অধিবেশন পর্যন্ত চলা প্রযোজন। প্রতি মুহূর্তে আমাদেব এ বিষযে জাগৰূকতা অভ্যাস কবা দবকাব। নিজেব ছেলেমেযে, নিজেব পবিবাব, নিজেব দাস-দাসী, সবাব প্রতি করুণা প্রদর্শন কবা আবশ্যক। কাবও সঙ্গে নির্দয ব্যবহাব কববেন না, নির্দয ভাব পোষণ কববেন না। যখনই মনে নিষ্ঠুব ভাব আসে আমবা তখনই যেন তা সামলে নিযে সদয ভাব নিযে আসি। যদি আমাদেব মনে করুণা আসে তবে জীবনেব অনেক বিপত্তি মিটে যাবে। ক্রুবতাব ফলে অনেক অন্যায সংঘটিত হয। লোকে ক্রুবতাব বশবর্তী হযে অন্যায কাজ কবে। যদি করুণা বিকশিত এবং অভ্যস্ত হয তবে অনেক অস্বস্তিকব অবস্থাব সমাপ্তি ঘটে। জৈন-পবম্পবায এ কথা স্বীকৃত যে, মানুষেব মনে করুণা না থাকলে তাব সম্যক দৃষ্টি হওযা সম্ভব নয। সম্যক দৃষ্টিব এক লক্ষণ—অনুকম্পা। যদি লোকেব অনুকম্পা বা করুণা থাকে তবে বুঝবেন, তাব সম্যক দৃষ্টি আছে। যদি করুণা না থাকে তবে সে মিথ্যাদৃষ্টি। কোন লোক সম্যক দৃষ্টি বা মিথ্যা দৃষ্টি কিনা তা জানাব এই হল কষ্টিপাথব। এই হল আমাদেব ব্যবহাবেব সূত্র।

অধ্যাত্ম সাধনায অহং বিসর্জন, প্রাণেব সাধনায দীর্ঘশ্বাস ও সমতাল্প শ্বাসেব অভ্যাস, আব ব্যবহাবেব সাধনায করুণাব অভ্যাস—এই তিন বকম সাধনাব প্রযোগেব ৰূপ। এই তিন প্রযোগ থেকে ফলপ্রাপ্তি হবে, সাফল্য লাভ হবে। প্রথম প্রযোগ থেকে অহং বোধ ত্যাগ হবে, দ্বিতীয থেকে লাভ হবে বাসনা-বিজয, তৃতীয থেকে লাভ হবে করুণাব অভ্যাস।

তবে এব সঙ্গে আব একটি বিষয আছে। সেই বিষযটি হল জপ। তিন তত্ত্বকে সবল কবতে জপ অত্যন্ত প্রযোজন। কাবণ তাতে আমাদেব সমস্ত শক্তিব পবিবর্তন ঘটে। শক্তিব বিকাশ হয। তা প্রাণ-শক্তি এবং আত্মশক্তি উভযকেই প্রভাবিত কবে। এর জন্য আপনি নবকাব মন্ত্র জপ কবেন, মালা ঘোবান। পর্যাযক্রমে এই বকম চলতে

থাকে। এই নিয়মের সামান্য একটু পরিবর্তন আপনাদের বুঝিয়ে দিই। কেউ হয়ত নবকার মন্ত্রের মালা একবার ঘুরিয়ে জপ করে। হয়ত আপনিও তাই করেন। একটা পরিবর্তন করুন। আমি যে নিয়ম বলছি তদনুসারে মালা ঘোরান। আপনি নমস্কার মন্ত্রে এক চরণ নিন 'ণমো অর্হন্তাণং'। আপনাকে এই চরণ জপ করতে হবে। শ্বাস নেওয়ার সময় মন্ত্রের জপ করবেন না, উচ্চারণ করবেন না। শ্বাস ত্যাগ করার সময়েও মন্ত্র জপ করবেন না। পূরকের সময়েও এ মন্ত্র জপ করবেন না, রেচকের সময়েও এ মন্ত্র জপ করবেন না। কুম্ভকের অবস্থাতে এই জপ করবেন। আপনি পূরক করুন, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করুন, নিশ্বাস দেহের মধ্যে আবদ্ধ রাখুন। এই হল কুম্ভকের অবস্থা। এই অবস্থায় স্থিতিকালে জপ করুন। 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র উচ্চারণ করুন। এবার নিশ্বাস ত্যাগ করুন, আবার নিশ্বাস নিন। নিশ্বাস ত্যাগ করার সময়েও মন্ত্র জপ করবেন না। আবার শ্বাসকে দেহমধ্যে আবদ্ধ করে কুম্ভক করুন। তখন 'ণমো সিদ্ধাণং' এই মন্ত্র জপ করুন। যতক্ষণ কুম্ভক করবেন ততক্ষণ জপ করবেন। পুরো মালা ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেই। নমস্কার মহামন্ত্র বিধিসম্মতভাবে যদি দশবারও জপ করা যায় তবে তা প্রভূত ফলদায়ক এবং মূল্যবান হয়। যতটুকু আপনার সুবিধে ততটুকু সময়ই আপনি বিধিসম্মতভাবে জপ করবেন। তবে একটা পরামর্শ দিই। অন্তত একুশবার জপ করবেন। এক মালা সম্পূর্ণ করে তো খুব ভাল কথা। না হলেও অন্তত এই সংখ্যক জপ অবশ্য করবেন। আপনার স্থিরতা বৃদ্ধি পাবে, একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। জপ করার এই এক বিধি। কুম্ভকের স্থিতিকালে জপ করতে হবে, অর্থাৎ পূরক এবং রেচকের মাঝখানে স্থিতিকালে জপ করতে হবে। এই এক জপের বিধি। তার সাথে সাথে রঙের ধ্যান আবশ্যক, স্থানের ধ্যানও অত্যন্ত প্রয়োজন। জপের সঙ্গে চার বস্তু সংযুক্ত হয়েছে—পদ, রঙ, স্থান ও শ্বাসের স্থিতি।

আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' মন্ত্রটি নিয়ে আলোচনা করি। এই মন্ত্রের

বর্ণ শ্বেত, তার স্থান মস্তিষ্কে, সহস্রার চক্রে। এই মন্ত্রের উচ্চারণকালে মন সহস্রার চক্রে স্থিত হয়, তার সম্বন্ধে চিন্তা বা আভাসের বর্ণ শ্বেত হয়। সহস্রার চক্র বা ব্রহ্মরন্ধ্র হল তালুর ওপরের দিক। কুম্ভকের স্থিতিকালে মন্ত্র জপের সময়ে আমাদের মন সহস্রারে নিবদ্ধ হবে। চারটি বিষয়ের আলোচনা করা গেল—

পদ—ণমো অর্হন্তাণং।

রঙ—শ্বেত।

স্থান—সহস্রার চক্র (ব্রহ্মরন্ধ্র, অর্থাৎ তালুর ওপরকার স্থান)।

শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক। অন্তর কুম্ভক।

'ণমো সিদ্ধাণং' এই হল দ্বিতীয় পদ। এর বর্ণ লাল। এর স্থান ললাটের মধ্যভাগে স্থিত আজ্ঞাচক্র। শ্বাসের স্থিতি হল কুম্ভক।

'ণমো আযরিযাণং'—এই হল তৃতীয় পদ। এর বর্ণ পীত। এর স্থান বিশুদ্ধি চক্র বা গলদেশ। ঐ চক্র পবিত্রতার স্থান। তা আমাদের সমস্ত ভাবনা এবং আবেগের নিয়ন্ত্রণ স্থান। শ্বাসের স্থিতি হবে—অন্তর কুম্ভক।

'ণমো উবজ্‌ঝাযাণং'—এটি চতুর্থ পদ। এর বর্ণ নীল। এর স্থান হৃদয়কমল। শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক।

'ণমো লোএ সব্বসাহূণং'—এই হল পঞ্চম পদ। এর বর্ণ কৃষ্ণ। এর স্থান পায়ের বুড়ো আঙুল। শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক।

পাঁচটি পদের বর্ণ ভিন্ন, স্থিতি ভিন্ন, শ্বাসের স্থিতি পাঁচটি পদেরই সমান। প্রত্যেকটির সাথে পদ, বর্ণ, স্থান এবং শ্বাসের স্থিতি—এই চার বস্তু সংযুক্ত হয়েছে। এখন এই সবের সঙ্গে আমাদের মনের পূর্ণ সংযোগ হওয়া প্রয়োজন। এই পাঁচ বস্তুর বিধিব সংযোগ হলে জপ শক্তিশালী হয়। একটিরও ন্যূনতা হলে পরিণামের ন্যূনতা ঘটে।

আপনি অহং বিসর্জন করতে চান, করুণার বিকাশ করতে চান, শ্বাসের স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। এই তিনই আমরা জপের দ্বারা সাধনা করছি। এর দ্বারা মন্ত্র শক্তিশালী হয়। আপনারা ভাবতে

পাবেন এত নবকাব মন্ত্র জপ ববলাম, এত মালা ফেবালাম, বছবেব পব বছব জপ কবে চলেছি, কিন্তু দৃশ্যত কিছুই লাভ হল না। এ বকম অনুভূতি দু-এক জনেব নয, অনেকেবই হতে পাবে। ওপবে যে প্রক্রিযা বর্ণনা কবলাম সেভাবে ছয মাস কাল জপ করুন, তাব পবে আমাকে জানাবেন কিছু পবিবর্তন হযেছে কিনা। অবশ্যই পবিবর্তন হবে। আমি এই এক প্রযোগেব আলোচনা কবলাম। যাঁবা নানা প্রকাব প্রযোগেব মধ্যে যেতে চান না, যাঁদেব অনেক বকম প্রযোগ অভ্যাস কবাব ক্ষমতাও নেই, তাঁবা এই এক প্রযোগ আঁকড়ে ধরুন। একে হৃদযঙ্গম করুন। একেই চাব বিষযেব ফল লাভ হবে।

প্রথম তত্ত্ব হল অহংকে বিসর্জন কবা। তাব অর্থ—বিনম্রতা। এও এক সমাধি। ভগবান মহাবীব চাব বকম সমাধিব কথা বলেছেন : বিনয সমাধি, শ্রুত সমাধি, তপ সমাধি এবং আচাব সমাধি। প্রথম হল বিনয সমাধি, তাব অর্থ অহং বিসর্জন। অহং স্বযং-উদ্দণ্ডতা বা চণ্ডতা বা প্রকৃতিব ঔদ্ধত্যেব দ্বাবা পবিচিত। লোকে নিজেকে অনেক বড মনে কবে। সেই হল অহং। বিনযেব অর্থ কি? বিনযন—অর্থাৎ দূব কবা, হটানো। বিনযেব উদ্দেশ্য দূব কবা বা অপসাবিত কবা। আমাদেব ভেতবে যে কষাযের ভাব আছে, যে অহং ভাব আছে, তাকে দূব কবাব নাম হল বিনয বা বিনম্রতা। বিনম্রতা অন্যেব প্রতি ব্যবহাবেব রূপ নয। এ হল নিজেব ভেতবকাব গুণ। অহঙ্কাব নিজেব ভেতবেব দোষ। বিনযেব অভ্যাস কবা, বিনয সমাধিতে, আত্ম-সমাধিতে অবস্থান কবা বাঞ্ছনীয। ঐ সমাধি অহঙ্কাবেব বিসর্জন থেকে প্রাপ্তব্য ফল। এতে স্বযং-অনুভূতিব সমাপ্তি ঘটে, একাগ্রতাব সিদ্ধি লাভ হয।

দ্বিতীয বিষয—করুণা অভ্যাস কবা।

তৃতীয বিষয—প্রাণেব সাধনা।

চতুর্থ বিষয—বিধিবৎ মন্ত্র জপ কবা।

এই সব বিষয় একত্র হলে প্রযোগ সম্পূর্ণ হয। এই বকম প্রযোগে

সিদ্ধি প্রাপ্তি হয। এতে আমাদেব চতুর্মুখী বিকাশ হয। কোন এক অংশেব নয, সমস্ত অংশেব বিকাশ হয। যদি কেবল আমাদেব প্রাণ-কোষেব বিকাশ হয কিন্তু স্বভাব না বদলায তবে ঐ শক্তি আমাদেব পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকাবক হয়, আমাদেব পক্ষে দুঃখদাযক হয়। আমবা আত্মাব বিকাশ কবতে চাই। কিন্তু যদি প্রাণেব বিকাশ না হয তবে দুর্বল প্রাণ আত্মা পর্যন্ত পৌছতে পাবে না। উপনিষদে একটি সুন্দব উক্তি আছে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বলহীন বা বীর্যহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ কবতে পাবে না, আত্মা পর্যন্ত পৌছতে পাবে না। বলহীন লোক কিছু কবতে পাবে না, কিছু পাওযাব অধিকাবী নয। করুণাব অভ্যাস, অহঙ্কাবেব বিসর্জন নিজেব সঙ্কল্পেব ওপবে নির্ভব কবে, সঙ্কল্পেব সাথে সাথে চলে। করুণাব প্রযোগ ব্যবহাবে, কিন্তু এখনও এই ভূমি প্রযোগ কবাব উপযোগী নয়। আপনি কি এখন কাবও প্রতি ক্রূব আচবণ কবছেন? কাবও প্রতি করুণা প্রদর্শন কবছেন? এ ব্যাপাব আপনাব ওপবে নির্ভব কবে। আপনাকে নিজেকেই ভেবেচিন্তে প্রযোগ কবতে হবে। দীর্ঘশ্বাস, সমতাল শ্বাস আব নমস্কাব মন্ত্র জপ—এব প্রযোগ কবতে পাবেন, শিখতে পাবেন।

২৭

নির্বিচার ধ্যান

চীনের সম্রাট এক ধ্যান-সাধককে আমন্ত্রণ করে বললেন, 'আমি উপদেশ শুনতে চাই, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' সাধক স্থির হয়ে বসলেন, সম্রাটও তাঁর সামনে বসলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, সম্রাট সাধকের মুখের কথা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সমস্ত পরিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। আধ ঘণ্টা কেটে গেল—সম্রাট প্রতীক্ষারত, সাধুও মৌনতায় অটল। শেষে যখন এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, সম্রাট অধীর হয়ে বললেন, 'ভন্তে। উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি। আপনার উপদেশ শোনার জন্য আমি খুব উৎসুক। এবার দয়া করে কিছু বলুন।' সম্রাটের মন্ত্রী ধ্যানের মর্ম বুঝতেন। তিনি বললেন, 'রাজন্। উপদেশ তো সমাপ্ত হয়ে গেল। এবার উনি যাওয়ার জন্য তৈরি।' সাধু সত্যিই উঠে চলে গেলেন।

খুবই ভাল হতো যদি আমি ঐ রকম করতে পারতাম—মৌন থেকে যেতাম, আর মৌনতাই হতো উপদেশ। কথা না বলে, মৌন থেকে যতটা বোঝানো যেত, কথা বলে হয়ত ততটা বোঝাতে পারব না। এ-ও আমার পক্ষে এক সমস্যা। কথা না বলার দ্বারা যে বিষয় বোঝানো সম্ভব,

কথা বলার দ্বারা সে বিষয় বোঝানো সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে কখনও কখনও মৌনীর পক্ষেও কথা বলার দরকার হয়। যে ভাষাতে সংযত, সে যদি সারা দিন ধরে কথা বলে তাহলেও যেন কিছু বলে না। নিযুক্তিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ রহস্য-সূত্র আছে—যে বিকল্পের জালে ফেঁসে যায় নি, সে কথা বললেও তা না বলার সামিল, আর যে বিকল্পের দ্বারা প্রভাবিত, সে কথা না বললেও যেন অনেক কথা বলে।

মনের ক্রিয়া সমাপ্ত করতে পারলে তবেই আমরা নির্বিচারের স্তরে পৌঁছতে পারি। নির্বিচারের স্তরে পৌঁছতে হলে মনের বিচরণ বন্ধ করতে হবে। যতক্ষণ মন সক্রিয় থাকবে, বিচরণশীল থাকবে, চারদিকে ঘুরবে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবে, পরিব্রজন করবে, ততক্ষণ নির্বিচার ধ্যান হবে না। ঐ রকম ধ্যানের জন্য মনের সংক্রমণশীলতা একেবারে বন্ধ করা প্রয়োজন। এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে, এক অর্থ থেকে আর এক অর্থে, এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায়, মন সর্বদা বিচরণ করছে। আমি মনকে একাগ্র করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু শব্দের চক্র চলছে, আর মন তাতে বিচরণ করছে। মনের চঞ্চলতার আর শেষ হয় না। চঞ্চলতা একাগ্রতার মধ্যেও থাকে, কিন্তু সেই চঞ্চলতা এত সীমিত হয়ে যায় যে আমরা সেই অবস্থায় মন স্থির আছে বলেই মনে করি। এর তাৎপর্য এই যে, সেই অবস্থায় মনের চঞ্চলতা একই বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ মন অন্য কোন বিষয়ে সংক্রমণ করে না। সেজন্য তখন মনকে স্থির বলেই মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক তা স্থিরতা নয়—তা পূর্ণ স্থিরতা নয়, আংশিক স্থিরতা মাত্র বা চঞ্চলতার বর্জন। চঞ্চলতার বর্জন আছে বলেই আমরা ঐ মনকে স্থির আর শান্ত বলে মেনে নিই। কিন্তু যেখানে বিচার আছে, মনের ক্রিয়াশীলতা আছে, চিন্তা আছে, সেখানে স্থিরতা কি করে থাকতে পারে? মনের স্থিরতা হলে নির্বিচারতার স্থিতি এসে যায়। কেবলজ্ঞানের তাৎপর্য—শুদ্ধ জ্ঞান, অবিমিশ্র জ্ঞান, একক জ্ঞান—জ্ঞানের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়।

'কেবল' শব্দের তিনটি অর্থ হতে পারে—একক, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ।

'কেবল'-এর এক অর্থ, একক। যখন আমরা জ্ঞানই করি, তার সঙ্গে কোন সংবেদন করি না, তখন আমাদের জ্ঞান একক জ্ঞান—কেবল-জ্ঞান।

'কেবল'-এর দ্বিতীয় অর্থ, শুদ্ধ। যখন আমরা জ্ঞানই করি, সংবেদন করি না, জ্ঞানের সঙ্গে সংবেদন জুড়ে দিই না, তখন আমাদের জ্ঞান শুদ্ধ হয়, উপযোগ শুদ্ধ হয়। এবং সেই অর্থে আমরা কেবল-জ্ঞানী হয়ে যাই।

'কেবল'-এর তৃতীয় অর্থ, পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণতা আপনা আপনি এসে যায়। যখন অবিমিশ্র জ্ঞান হয়, কেবলজ্ঞান হয়, তখন পরিপূর্ণতা আপনা আপনি আসবে। আমরা তাকে আনতে যাব না, আমন্ত্রণ করব না—পরিপূর্ণতা স্বতই আসতে বাধ্য হবে। যখন আমাদের জ্ঞান একক, আমাদের জ্ঞান শুদ্ধ, তখন পরিপূর্ণতা আমাদের কাছ থেকে সরে থাকতে পারবে না—তাকে আসতেই হবে।

যখন আমরা শুদ্ধ উপযোগের স্থিতিতে পৌঁছতে পারব তখন আমরা নির্বিচারতার স্থিতিও লাভ করব। উপযোগের অর্থ—চেতনার প্রবৃত্তি, চৈতন্যের ব্যাপার। যেখানে চৈতন্যের ব্যাপার শুদ্ধ—অবিমিশ্র, নির্ভেজাল—সেখানে উপযোগ শুদ্ধ। সেখানেই নির্বিচারের স্থিতি। সেখানে সমস্ত সংবেদন সমাপ্ত হয়ে যায়।

এক পৌরাণিক কাহিনী আছে। এক প্রসিদ্ধ সাধু ছিলেন। তাঁর কাছে হাজার হাজার লোক আসত। তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোক ছিল, কিছু খারাপ লোকও ছিল। কারও তাঁর কাছে যাওয়া-আসার, বা তাঁর কাজে থাকার, বাধা ছিলনা। একদিন এক দুর্জন লোক সাধুর কাছে এসে বসে গেল। তার মনে সত্যিই কোন জিজ্ঞাসা ছিল না। সে সাধুকে বিরক্ত করার জন্য নানা অবাস্তব প্রশ্ন করতে লাগল। তার মন ছিল দূষিত—কেবল দুরাগ্রহ ও কু-তর্কে ভরা। বোঝার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। সে সাধুকে প্রশ্ন করল। সাধু শান্তভাবে তার উত্তর দিলেন, তাকে বোঝানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা করলেন। কিন্তু

তাঁব সমস্ত প্রয়াসই জলকে মন্থন কবাব মত বিফল হল। দধিকে মন্থন কবলে মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু জলকে মন্থন কবলে কি পাওয়া যাবে? তবুও সে লোক তাব দুবাগ্রহ ছাড়ল না। সাধু হয়বাণ হয়ে গেলেন। ক্রোধকে আসতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু হযবাণিব ফলে সাধুব ক্রোধ প্রকট হয়ে গেল। তিনি সাধক ছিলেন, একেবাবে সিদ্ধ ছিলেন না। তিনি বললেন, 'তুমি বড়ই দুষ্ট, এখান থেকে দূব হও।' তাকে ধাক্কা দিয়ে বেব কবে দিলেন। এবপবে কাহিনীতে বলা হয়েছে, বাত্রে ঐ সাধকেব কাছে ভগবান প্রকট হয়ে বললেন, 'তুমি বড়ই অন্যায় কবেছ, ঐ ব্যক্তিকে ঘব থেকে বেব কবে দিলে?' সাধু বললেন, 'ভগবন্, আব কি কবব? ঐ লোক বড়ই দুষ্ট, ক্রোধী ও কু-তার্কিক ছিল, তাব বোঝাব কোন ইচ্ছাই ছিল না। সুতবাং আমি আব কি কবতে পাবি?' ভগবান বললেন, 'সাধু! তুমি ভুলে যাচ্ছে যখন আমাব সৃষ্টিতে, আমাব জগতে, তাব জন্যও স্থান আছে, তখন তোমাব ওখানেও তাব জন্য স্থান থাকা উচিত ছিল।' সাধু বললেন, 'ভগবন্, আপনি পবম শুদ্ধ। আমি তো শুদ্ধ নই। আমি কি কবে তাকে স্থান দেব?'

শুদ্ধতা লাভ কবলে আব কোন বিকাব থাকে না। যখন চেতনা শুদ্ধ হয তখন সকলেব জন্যই স্থান দেওযা সম্ভব হয; কিন্তু অশুদ্ধ চেতনা নিযে সকলকে স্থান দেওযা যায না। ভগবান পবম শুদ্ধ। শুদ্ধেব জগতে সব কিছুকেই সমান বোধ হয। ভাল হোক, মন্দ হোক, নোংবা হোক, পবিষ্কাব হোক, স্বরূপ হোক, কুৎসিত হোক—সবই সমান। কিন্তু অশুদ্ধতাব ক্ষেত্রে সব সমান হয না। সেখানে সীমাব কথা ওঠে। এই পর্যন্ত দেখ, এই পর্যন্ত অনুভব কব—এসবই সীমাব কথা। শুদ্ধতাতে কোন সীমাবন্ধন থাকে না। সবই নিঃসীম হযে যায। আমাদেব চেতনা যখন শুদ্ধ হয, তখন সেই স্থিতিতে সুজন হোক, দুর্জন হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক—যা কিছু হোক, কেউই আব কোন সঙ্কটেব সৃষ্টি করতে পাবে না।

শুদ্ধ চেতনা বা নির্বিকাব ধ্যানেব কষ্টিপাথব—তাব প্রকৃত তত্ত্ব

এই যে, সেই অবস্থায সুখ-দুঃখ সমান হযে যায। আচার্য- কুন্দকুন্দ বলেছেন, শুধু চেতনায় উপনীত হলে, সাধক সুখ-দুঃখেব প্রতি সমান হযে যান। তাঁব তখন সুখ বা দুঃখেব মধ্যে পার্থক্যবোধ থাকে না, তাঁব তখন দুই-ই সমান বলে মনে হয। কি কবে তা সম্ভব হয ? তিনি কি বকম মানুষ—যাঁব কাছে সুখেব অনুভূতি প্রিয নয, আব দুঃখেব অনুভূতিও অপ্রিয নয ? এই দুযেব প্রতি সমান ভাব পোষণ কবাব অবস্থা কি কবে ঘটতে পাবে ? কবে তা ঘটে, কেনই বা ঘটে ? এই অবস্থা অশুদ্ধ চেতনায কখনই ঘটে না। যখন আমাদেব চেতনা শুদ্ধ হযে অবিমিশ্র জ্ঞানেব স্থিতি প্রাপ্ত হয, তখন কোন সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না। সুখ ও দুঃখ—এই দুই সংজ্ঞাই তখন লুপ্ত হযে যায। সেই সমযে শত্রুও থাকে না, মিত্রও থাকে না। শত্রু ও মিত্র—এই দুই সংজ্ঞাবই তখন অবসান ঘটে। তখন বেঁচে থাকাব জন্য আকাঙ্ক্ষাও থাকে না, মবে যাওযাব সম্ভাবনায ভযও থাকে না। আকাঙ্ক্ষা আব ভয—দুই-ই শেষ হযে যায। 'গীতায' ভগবান কৃষ্ণ এই স্থিতি এ ভাবে বর্ণনা কবেছেন—

'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা, সমত্বং যোগ উচ্যতে।'

সিদ্ধিব অর্থ—উপলব্ধি, সফলতা। অ-সিদ্ধিব অর্থ—অনুপলব্ধি, অসফলতা। যে সাধক সিদ্ধি আব অ-সিদ্ধিতে, উপলব্ধি আব অনুপ-লব্ধিতে, সমান থাকেন, তাঁব সেই সমত্বকে যোগ বলে। সমত্বই নির্বিচাবতাব স্থিতি।

নির্বিচাব ধ্যানকে সামাযিক বলা যায। ভগবান মহাবীব সামাযিকেব ওপব যতটা জোব দিযেছেন, আব কিছুব ওপব ততটা দেন নি, কাবণ, সামাযিক ধ্যান থেকে আলাদা নয। সামাযিকেব নামই ধ্যান। ধ্যান সামাযিক থেকে পৃথক বস্তু নয। গৌতম মহাবীবকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, 'ভন্তে। সামাযিক কাকে বলে ? সামাযিকেব অর্থ (বিষয) কি ?' ভগবান মাত্র দু কথায ছোট একটা উত্তব দিযেছিলেন, কিন্তু সেই উত্তব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'আযা সমাইএ, সামাইযস্স

উঠে'—আত্মা সামায়িক, আর আত্মাই সামায়িকের অর্থ। যখন আমরা মূল চেতনায় থাকি, আত্মায় স্থিতিলাভ করি, তখন সেই স্থিতির নাম সামায়িক। আপন আত্মায় থাকাই সামায়িক। সামায়িকের বেশে থাকা বাস্তবিক সামায়িক নয়, নিজের আত্মাতে থাকাই বাস্তবিক সামায়িক। আত্মাতে অবস্থানই সামায়িকের অর্থ, সামায়িকের বিষয়। আত্মা আর সামায়িক দুটি পৃথক বস্তু নয়, শব্দ দুটি হলেও বস্তু একই।

আত্মা আর ধ্যানও পৃথক পৃথক বস্তু নয়। নির্বিচার ধ্যানের উদ্দেশ্য হল, আত্মাতে থাকা। সামায়িকেরও ঐ একই উদ্দেশ্য। তিনটি শব্দ আছে—ধ্যান, নির্বিচারতা আর সামায়িক। আসলে কিন্তু ঐ তিন একই। সামায়িকে থাকার অর্থই নির্বিচার ধ্যানের অবস্থায় থাকা, আর নির্বিচার ধ্যানের অবস্থায় থাকার অর্থই সামায়িকে থাকা। কথা দুটি একই। যখনই আমরা আত্মায় স্থিত হই—আমাদের কেবল আত্মদর্শন হয়, মনে কোন সংকল্প-বিকল্প হয় না, মনের কোন গতি বা বিচরণ থাকে না, তখনই সেই অবস্থায় আমাদের আত্ম-রমণ হয়, আর সেই অবস্থায় স্থিতিই সমত্বে স্থিতি, সামায়িকের স্থিতি। সব দিক থেকেই আমরা তখন সমান হয়ে যাই, কোন দিকেই আর বিষমতা থাকে না। তখন কেবল সমতা আর সমতা। এই হল, পূর্ণ জাগরূকতার স্থিতি, চৈতন্যের স্থিতি। প্রথম যে নেশা, তা সত্যি মদের নেশা নয়—বিচারের নেশা। আচ্ছা, মদের নেশা কি বিচারের নেশা থেকে কম হতে পারে? মদের নেশায় তো মানুষ পাগল হয়ে যায়, টলমল করে চলে, কখনও বা পড়েও যায়। আবার, কখনও কখনও দু-চার ঘণ্টা মূর্চ্ছার ঘোরেই থাকে। ঠিকই বটে, তবে সে তো জ্ঞান ফিরে পায়, সাবধানও হয়ে যায়। কিন্তু বিচারের নেশা বড়ই শক্তিশালী। বিচারের নেশায় লোকে ঘোরতর লড়াই করে যায়, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। কত সংঘর্ষ, কত উন্মাদনা, কত ঝঞ্ঝাট, কত পাগলামি যে বিচারের নেশায় উৎপন্ন হয়, তা বলে শেষ করা যায় না।

একদিন বাত্রি বেলায় একটি লোক তাব বাড়ি থেকে বেবিয়ে এক প্রসিদ্ধ দার্শনিকেব বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁব বন্ধ দবজায় আঘাত কবল। দার্শনিক নিচে এসে দবজা খুললেন। তিনি দেখলেন—সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে, তাব মাথা কাঁপছে। তিনি ভাবলেন, 'এ তো দেখছি নেশাব ঘোবে আছে। যদি সজ্ঞানে থাকত, জাগরূক বা হুঁশিয়াব থাকত, তবে এমন মাথা ঝাঁকাবে কেন?' দার্শনিক জিজ্ঞাসা কবলেন, 'এত বাতে কেন এসেছ?'

'আমার এক জিজ্ঞাসা ছিল। আপনাকে একটা প্রশ্ন কবতে এসেছি।' 'আবে! এই হল জিজ্ঞাসাব সময়? প্রশ্ন কবাব সময় এই? এত বাত হয়েছে—বাবটা বেজে গিয়েছে, আব এখন তোমাব প্রশ্ন কবতে আসাব সময় হল?'

'এখনই জিজ্ঞাসাটা মনে উঠল, তাই এখনই আপনাব কাছে চলে এলাম। এই শহবে আপনাব চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি তো আব পাব না। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমাব জিজ্ঞাসাব উত্তব দিন। আমাব প্রশ্ন, ঈশ্বব আছেন, কি নেই?'

'বড় অদ্ভুত লোক দেখছি। এই কি প্রশ্ন কবাব উপযুক্ত সময়? ঈশ্বব আছেন কিনা—এই প্রশ্নেব এত জলদি উত্তব দবকাবই বা কেন? এজন্য তোমাব কোন কাজ তো এখন ঠেকে নেই। তোমাব ঘবে তো আব আগুন লাগে নি যে এখনই উত্তব পেতে হবে। এত জলদি কেন? মনে হয়, নেশায় চুব হয়ে আছ, পাগল হয়ে আছ, তাই এখনই প্রশ্নেব উত্তব চাইছ।'

'মহাশয়! নেশাতেই তো এই প্রশ্ন উঠেছে। যখন জাগরূক থাকি, সতর্ক থাকি, তখন ঈশ্বব আছেন কিনা, এই প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্নটা তো নেশাব মধ্যেই উঠেছে, আব এই সময়েই তো এব উত্তব পাওয়া চাই।'

'যখন তোমাব হুঁশ ফিববে তখন এসো।'

'যখন আমাব হুঁশ হবে তখন কে আব আপনাকে প্রশ্ন কবতে আসবে? আমি তো আব প্রশ্ন করব না।'

দেখুন, এখানে হুঁশে থাকার কথা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কে হুঁশে আছে? এটাই সম্ভব যে, যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি হুঁশে নেই, আর যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনিও হুঁশে নেই। বিচারের, তুবাগ্রহের, মান্যতার নেশা এতই ভয়ঙ্কর যে, মন যখন চঞ্চল হয়ে ঐ দিকে দৌড়য় তখন মনের মাদকতা, মনের চঞ্চলতা মানুষকে পাগল করে দেয়। কেবল পাগলামির মাত্রার তারতম্য থাকে। কেউ চার আনা, কেউ আট আনা, কেউ বার আনা, কেউ একেবারে ষোল আনা পাগল হয়—সে তো কেবল মাত্রার পার্থক্য। অর্থাৎ কেউ কম পাগল, কেউ বেশি পাগল। প্রত্যেক লোকই পাগল, কিন্তু যখন কারও পাগলামি সীমা লঙ্ঘন করে তখন কেবল আমরা তাকে 'পাগল' বলে অভিহিত করি। সব লোকই তার থেকে বেশি কম বা অল্প কম পাগল। যে পাগলের দৌরাত্ম্য সীমা ছাড়িয়ে যায় তার পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়া পরানো হয়—আর বলা হয়, লোকটা পাগল। যখন সে অনর্গল বক-বক করে, অহংবদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করে, তখন সবাই বলে—লোকটা পাগল হয়ে গেছে। নতুবা আমরা তাকে পাগল বলি না। কিন্তু বাস্তবে আমরা সবাই পাগল, আমি-আপনি, ইনি-উনি—সবাই পাগল। বাস্তবে মনের চঞ্চলতার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মনের চঞ্চলতাই পাগলামি। পূর্ণ হুঁশের স্থিতিতে কেউ নেই। নির্বিচারতার দশাতেই সেই স্থিতি আসে। যেখানে বিচার শেষ হয়, সেখানে সকল পাগলামির অন্ত হয়। তখন কেউ আর পাগল থাকে না, নিরন্তর পূর্ণ হুঁশেই থাকে। যেখানে বিচার নেই সেখানে হুঁশ আছে, পরিপূর্ণ প্রকাশ আছে। সেখানে কোন অন্ধকার নেই। যেখানে হুঁশ নেই, সেখানে অন্ধকার ও আলো জড়িত হয়ে আছে।

আপনি মনে করছেন, এখন এখানে কোন অন্ধকার নেই। তাই যদি মনে করেন, বাইরে রোদে গিয়ে দেখুন। আপনি বুঝতে পারবেন, রোদে যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে প্রকাশ অর্থাৎ আলো বেশি, আর এখানে কম। কম প্রকাশের অর্থই হল—অন্ধকার। এটাই হল

আপেক্ষিক স্থিতি। অধিক প্রকাশের তুলনায় কম প্রকাশকে অন্ধকার বলা যায়। কামরার ভেতরের দিকে তাকান—আপনার মনে হবে এখানে প্রকাশ বেশি, ওখানে প্রকাশ অপেক্ষাকৃত কম। সামনে যে রৌদ্রে-ঝলমল দেয়াল আছে, সেখানকার চেয়ে এই বারান্দায় প্রকাশ কম, আর এই বারান্দার চেয়ে ভেতরের কামরায় প্রকাশ আরও কম। তুলনামূলক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমরা যেখানে কেবল প্রকাশ বলে মনে করেছি, সেখানে অন্ধকারও আছে। তবে, এমন এক বিন্দু আছে যেখানে পৌঁছলে অন্ধকার শেষ হয়ে যাবে। তা না হলে, জ্ঞানই বলুন, দর্শনই বলুন, অনুভবই বলুন, বিকাশই বলুন—সর্বত্রই অন্ধকার লুকিয়ে আছে। এই অন্ধকারের পূর্ণ বিলোপ ততক্ষণ ঘটবে না, যতক্ষণ না আমাদের চেতনা শুদ্ধ উপযোগের স্তরে উন্নীত হবে। অবিমিশ্র জ্ঞান আর অবিমিশ্র চেতনার উপযোগ না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকার আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। প্রকাশের মাত্রা কম হলেই আমরা তা অন্ধকার বলে মনে করি না। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে তা অন্ধকার বলেই বোধ হবে।

এক ঘটনার স্মৃতি আমার মনে আসছে। আমি তখন মাদ্রাজে। আমি একদিন এক জায়গায় বসে ছিলাম, সেখানে আলো ছিল। কিন্তু যখন লেখার প্রশ্ন এল, তখন মনে হল এখানে তো অন্ধকার, এখানে লেখা যাবে না, কারণ লেখার উপযুক্ত আলো এখানে নেই। আমি উঠে আর এক জায়গায় গিয়ে বসলাম, সেখানে আলো বেশি ছিল। লিখতে আরম্ভ করলাম এবং কিছু লিখলামও। কিছুক্ষণ পরে সূক্ষ্ম লিপিতে লেখা একটা পাতা পড়ার প্রয়োজন হল। অক্ষর খুবই সূক্ষ্ম ছিল, তা পড়ার পক্ষে সেখানকার আলো যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সে জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় যেতে হল। যেখানে আমি আলো মনে করেছিলাম, সেখানেই অন্ধকার হয়ে গেল। লেখার প্রশ্ন আসায় যেখানে আলো ছিল সেখানেই অন্ধকার হল। আমি ঐ আলোয় তো লোককে চিনতে পারছিলাম, কিন্তু লিখতে পারছিলাম না। আবার যখন সূক্ষ্ম

অক্ষর পড়ার প্রয়োজন হল, তখন লেখার উপযুক্ত যে আলো ছিল তাও অন্ধকার গেল। আমাকে আর একটা তৃতীয় জায়গা বেছে নিতে হল।

এই রকম স্থিতিতে কি করে মানা যায় যে, যেখানে আলো থাকে, সেখানে অন্ধকার থাকে না? আলো আর অন্ধকার—দুই-ই এক সঙ্গে চলে। তবে এমন এক বিন্দু আছে যেখানে আলো কেবল প্রকাশই—যেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকে না। সেই বিন্দু হল—নির্বিচারতার স্থিতি। সেই বিন্দুতে পৌঁছলেই সমস্ত অন্ধকার শেষ হয়ে যায়। সেখানে পূর্ণ প্রকাশ বিরাজ করে, অবিমিশ্র প্রকাশই বিদ্যমান থাকে। কেবল উজ্জ্বলতা—অন্ধকার কিছুমাত্র নেই। যে দেখবে, কেবল সত্যই দেখবে। সেখানে বাস্তবিক সত্যের দর্শন মেলে। ঐ আলোয় যথার্থ সত্যকেই দেখা যায়। ঐ আলোয় অসত্যের রেখামাত্র থাকে না। পূর্ণ প্রকাশ প্রকট হয়, নির্বিচারতার স্থিতি লাভ হয়।

আমরা ধ্যান করছি। এটাই আমাদের প্রাথমিক অভ্যাস। প্রথম প্রক্রিয়াই হল, মনকে একাগ্র করা, একই বিচারের ওপর মনকে মগ্ন করা, একই দিকে মনকে প্রবাহিত করা। এ রকম করা খুবই ভাল এবং প্রয়োজনও বটে। বস্তুত এ রকম না করে আমাদের গতি নেই। প্রথম দফায় আমরা আর কি করব, আর কি-ই বা হবে? তবে এ রকম করাকেই যেন অন্তিম লক্ষ্য বলে মনে না করি। এর ফলে কিছু অবশ্য হয়—আমি মানছি, কিছু হয়-ই। ধ্যান কালে হয়ত আমরা কিছু দেখতে পাই। সেই দেখাই বাস্তবিক বলে আমরা মনে করতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তবিক নয়, মনের পরিণতি মাত্র। এমন সব জিনিষ দেখা যায়, এমন সব শব্দ শোনা যায়, যা বাস্তবিক নয়—ধ্যানের সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধই নেই। অথচ এই গুলিকেই বাস্তবিক বলে ধরে নিলাম। এ যেন একটা চক্র। এই চক্রে পড়লে ভ্রান্তি বা বিপর্যয় দূর হয় না, পূর্ণ সত্যের দর্শন হয় না, আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না।

আত্মা নির্বিচার, বিচারের দ্বারা সেখানে পৌঁছনো যায় না। আত্মা অ-শব্দ, শব্দের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছনো যায় না। আত্মা নির্বিকল্প,

বিকল্পেব সাহায্যে সেখানে পৌছনো যায না। আত্মা অচিন্ত্য, চিন্তাব দ্বারা সেখানে পৌছনো যায না। কেবল নির্বিচাব, নিঃশব্দ, নির্বিকল্প, নিশ্চিন্ত আর নির্মনস্ক স্থিতিব দ্বাবাই আত্মাতে পৌছনো যায। ঐ স্থিতিব যে অনুভব হয, সেই অনুভবই আমাদেব সকল শাস্ত্রেব সার নির্যাস।

ধর্মশাস্ত্র বলে, আত্মায প্রকৃত অনন্ত সুখ আছে, বিষযাতীত সুখ আছে, অবাধ সুখ আছে। অনন্ত সুখ তাকেই বলে যাব কখনও অন্ত হয না। অবাধ সুখ তাকেই বলে যাতে কখনও বাধা বা বিঘ্ন হয় না। এমন হয না যে, এখন যদি সুখ হল তো পরক্ষণেই দুঃখ এসে হাজিব হবে। এই সুখ অক্ষয, কখন তা ক্ষীণ হয না। এই সুখ বিষয়াতীত, বিষয থেকে তা প্রাপ্ত হওযা যায় না। এখন আমরা বিষযাতীত সুখ কি বস্তু তা কল্পনা পর্যন্ত কবতে পাবি না। সামনে বিষয নেই, বিষযের উপভোগ নেই, তবে সুখ কি কবে হয়? শব্দ নেই যে শুনতে পাব, তবে সুখ কি কবে হবে? রূপ নেই যে দেখতে পাব, তবে সুখ কি করে হবে, চোখেব তৃপ্তি কি কবে হবে? সুগন্ধ নেই যে গ্রহণ করতে পাবব, তবে ঘ্রাণেব সুখ কি কবে হবে? উৎকৃষ্ট বস নেই যে আস্বাদন কবতে পাবব, তবে জিহ্বাব সুখ কি কবে হবে, রসনার তৃপ্তি কি করে হবে? সুকোমল স্পর্শেব অভাবে সুখেব কল্পনা কি কবে কবা যেতে পাবে? আমাদের কল্পনা এইসব ইন্দ্রিযজনিত বিষযসুখ ছেড়ে অন্যত্র যেতেও চায না। আমবা স্বীকাব কবতে চাই না যে বিষযাতীত সুখও আছে। কিন্তু এটা সত্য যে, বিষযাতীত সুখ আছে। ইন্দ্রিযের বিষযেব সঙ্গে সেই সুখেব কোন সম্বন্ধ নেই। ঐ সুখ বিষয থেকে উৎপন্ন হয না, বিষয তাকে উৎপন্ন কবে না। আমবা ঐ সুখের বিষযে চিন্তা পর্যন্ত কবতে পাবি না। আমবা মনে কবি, যারা বিষযাতীত সুখেব কথা বলে, তারা অতিবঞ্জন কবে, অতিশযোক্তিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ কবে, অযথা বলে। এই হল আমাদেব অসুবিধে। আমাদের এই রকম চিন্তায যে দোষ আছে তাও বলতে পাবি না, কাবণ আমবা

ইন্দ্রিয়ের স্তরেই জীবন যাপন করি। ঐ স্তর থেকেই চিন্তা করি। আমরা মনের স্তর থেকে চিন্তা করি, আর মনের স্তর থেকে চিন্তা করলে এর বেশি কিছু ভাবা সম্ভব হয় না। আমাদের দোষ নেই—ভাবার বা চিন্তা করার যে স্তরে আমরা আছি, সেই স্তর থেকে যা ভাবা সম্ভব তাই আমরা ভেবেছি, আর সেই ভাবনাকেই বাস্তবিক বলে বোধ করেছি। কিন্তু যখন আমাদের চেতনা সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষণে এসে পৌঁছয়, নির্বিচারতার শুদ্ধ অনুভূতিতে প্রবেশ করে, তখন সেই ক্ষণে যে সহজ আনন্দ স্ফূর্ত হয়, যে সুখের অনুভব হয়, তাই হল সহজ সুখ—অবাধ সুখ। সেই সুখের ক্ষণিক দর্শন মিললেই অনুভব হয়, বিষয়জনিত সুখ আর সহজস্ফূর্ত বিশুদ্ধ সুখের মধ্যে কতই না পার্থক্য। সেই সহজ বিশুদ্ধ সুখ কত মহান। এই হল নির্বিচারতার স্থিতি, আত্মার স্থিতি—আত্মানুভবের স্থিতি, আত্ম-রমণের স্থিতি। বাইরে থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গুটিয়ে আনার স্থিতি। যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাকে অল্পের মধ্যে জড়ো করে রাখার স্থিতি।

আমাদের মস্তিষ্কে অগণিত প্রকোষ্ঠ আছে। একটা লোকের মস্তিষ্কে যত প্রকোষ্ঠ থাকে তা যদি মাটির ওপর পর পর বিছিয়ে দেওয়া যায় তো কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভূভাগ ঢেকে যাবে, উপরন্তু কিছু প্রকোষ্ঠ অবশিষ্ট থাকবে। আমাদের মস্তিষ্কে যখন থাকে তখন ঐ প্রকোষ্ঠগুলি অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু তাদের বাইরে ফেললে এতটা ভূভাগ ঢেকে যাবে। আমাদের মস্তিষ্কে প্রকোষ্ঠ এত অসংখ্য।

যখন আমাদের চেতনার ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করে, চেতনাকে গুটিয়ে এনে, নিজের সমস্ত অনুভূতিকে একত্র করে এক কেন্দ্রে সংহত করা যায় তখন তার কত তীব্র যে অনুভব হবে তা কল্পনাও করা যায় না। তার শক্তি হবে অত্যন্ত প্রবল।

যখন আপনারা ঘর ছেড়ে কোথাও যান—দেশের আর এক স্থানে, কি বিদেশে যান—তখন মনে হবে যাত্রা করছেন। যাত্রার অনুভব

ভিন্ন বকমেব। আবাব যখন যাত্রা থেকে ঘবে ফেবেন তখন মনে হবে আপনাদেব মূল স্থানে এসে গেছেন। মনেব যে ছডিযে পডা, বৃত্তিব যে ছডিযে পড়া, বিচাবেব যে ছডিযে পডা—তাও এই বকম। যখন তাদেব ছডিযে পডা বন্ধ কবে তাদেব গুটিযে এক কেন্দ্রে আনা যায়, তখন তাবা যেন আপন ঘবে ফিবে আসে। এই অনুভূতি অলৌকিক বোধ হয।

আত্মা মনেব মাধ্যমে, ইন্দ্রিযেব মাধ্যমে, বিচাবেব মাধ্যমে, স্মৃতিব মাধ্যমে, কল্পনাব মাধ্যমে চাব দিকে দৌডচ্ছে। তাব শক্তি ছডিযে পডছে, কেন্দ্রিত হচ্ছে না। যখন আমবা ইন্দ্রিযেব দবজা বন্ধ কবে, বিচাব বন্ধ কবে, স্মৃতি আব কল্পনা বন্ধ কবে—সব কিছু সংযত কবে, নিজেব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চেতনাকে সংহত কবে তাব মূল স্থানে তাকে স্থাপিত কবি, তখন তাব ছডিযে পড়া শক্তি কেন্দ্রিত হযে যাবে। সেই শক্তি হবে প্রবল। সেই সমযে বিলক্ষণ এক অনুভব হয। এমন নয যে, সেই অনুভব এখন আব আমাদেব হতে পাবে না। আমি আগেই বলেছি, আজও কেবলজ্ঞান অনুভব কবা যায, অতীন্দ্রিয জ্ঞান অনুভব কবা যায, আত্মাব সহজ আনন্দ অনুভব কবা যায। আমাদেব কেবল এটুকু কবতে হবে যে, বিচাবেব ভূমি ছেডে নির্বিচাবেব ভূমিতে পৌঁছতে হবে , স্মৃতি, কল্পনা ইত্যাদি পবিহাব কবে অবিমিশ্র জ্ঞানেব, শুদ্ধ চেতনাব আব শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিতে পৌঁছতে হবে, আব সেই স্থিতিব অনুভব কবতে হবে।

জাগৰূকতাব সঙ্গে দেখতে হবে, মনেব কোন ব্যাপাব যেন না ঘটে, আব মন যেন শুদ্ধ চেতনাব স্থিতিতে কোন বাধাব সৃষ্টি না কবে। আমবা যদি এতটা জাগৰূকতাব সঙ্গে দেখতে পাবি, আব অবিমিশ্র জ্ঞানেব স্থিতি অনুভব কবতে পাবি, তবে আজও আমাদেব পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না। অনেক কিছু অসম্ভব বলে ধাবণা কবে বসে আছি, আব সেই ধাবণা এই ভাষায প্রকাশ কবছি—এখন কলিকাল, ঘোব কলিযুগ, ঐ সব এখন পাওয়া যায় না, মোক্ষ মেলে না, কেবলজ্ঞান

হয় না, ইত্যাদি। এই বকম ধাবণাব ফলে মন নিবাশা ও কুণ্ঠায ভবে যায, আগে এগোবাব জন্য যে পা তুলেছি তা পিছিযে পড়ে। আমাদেব এগিযে যাওযাব আকুলতা নষ্ট হযে যায, কাবণ যদি আমবা মেনে নিই অমুক স্থিতি এখন প্রাপ্য নয, তবে তার জন্য প্রচেষ্টা কে কববে, আব কেনই বা কববে? আমরা কোন বিশেষ স্থিতি এখন প্রাপ্ত হতে পাবি না—এই ধাবণা আমাদেব দূব কবতে হবে। কি পাওয়া সম্ভব, কি পাওযা সম্ভব নয, সে চিন্তা আমাব অধিকাব-ক্ষেত্রেব মধ্যে নয। আমাদেব অধিকাব কেবল চলাব, কেবল চলতে থাকাব, কেবল পা আগে বাড়িযে দেওযাব। চবৈবেতি, চবৈবেতি—এই আমাদেব কর্তব্য। আমাদেব গতিশীল হওযাব অধিকাব আছে, কোন এক নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাওয়াব অধিকাব আছে।

আমরা নির্বিচাব চেতনাব স্থিতিব দিকে এগিযে যাওযাব জন্য পা বাড়াব। যা ঘটাব, তা অবশ্যই ঘটবে। যে উপলব্ধি প্রাপ্তব্য হয, তা আমরা পেযে যাব। যা ঘটাব নয, তা ঘটবে না। যা প্রাপ্তব্য নয, তা পাওয়া যাবে না। প্রথমেই কেন চিন্তাব বোঝা মাথায তুলে নেব? কেন চিন্তাব ভারে নুযে পড়ব?

যে ব্যক্তি শুদ্ধ চেতনাব স্থিতিব—শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিব—যথেষ্ট দৃঢ় অভ্যাস কবেছে, সে নিশ্চিত সেই স্থিতিতে পৌঁছে যাবে, যে স্থিতিতে পৌঁছলে মোক্ষ আছে কি নেই, পবমাত্মা আছেন কি নেই, পবমাত্মাব স্থিতিতে সুখ আছে কি নেই—এ সব প্রশ্নই শেষ হয়ে যাবে, মীমাংসিত হযে যাবে।

২৮

চেতনার দিক পরিবর্তন

অনেক দিন আগেকাব কথা। এক পথিক পথ চলছিল। পথেব মাঝখানে এক জঙ্গল পড়ল। সে জঙ্গলে প্রবেশ কবল। জঙ্গলেব পথ খানিকটা পাব হল। তাব পবণে সাদা কাপড় ছিল। হঠাৎ তাব সামনে চাবটি মানুব এসে দাঁড়াল। তাবা ডাকাত। পথিক একলা, তাবা চাবজন। তাবা হেঁকে বলল—'থাম'। পথিক থেমে গেল। তাবা তাকে চেপে ধবতে চেষ্টা কবল। পথিকেবও গাযে বেশ জোব ছিল। হাতাহাতি শুরু হল। পথিক কিছুক্ষণ লড়াই কবল। কিন্তু সে একা, লুটেবাবা চাবজন। কতক্ষণ আব তাদেব ঠেকিযে বাখতে পাববে? ডাকাতবা তাকে জাপটে ফেলল। তাব শবীব তল্লাসী কবল। কিন্তু তাবা শুধুই হযবাণ হল। তাব কাছে একটি পযসা ছাড়া আব কিছুই পাওযা গেল না। ডাকাতবা আশ্চর্য হযে তাকে জিজ্ঞাসা কবল—'ওহে! এক পযসাব জন্য এত লড়াই কবলে? প্রথমেই যদি এ কথা বলতে, তাহলে আমবা তোমাব ওপবে হামলা কবতাম না।' পথিক বলল—'প্রশ্ন তো এক পযসাব নয, প্রশ্ন আকর্ষণেব। এক পযসাই হোক আব হাজাব টাকাই হোক, আমাব ধনেব ওপবে আকর্ষণ। হাজার টাকা থাকলে আমাব যতটা আকর্ষণ থাকত ঐ এক পযসাব

ওপরও আমার সেই আকর্ষণ। প্রশ্ন সংখ্যার নয়, প্রশ্ন আকর্ষণের।'

মূল কথা হল আমাদের আকর্ষণ কোন্ দিকে যাচ্ছে। আমাদের আকর্ষণ এক বিশেষ দিক-অভিমুখী হলে আমাদের প্রবৃত্তি, চিন্তা এবং ক্রিয়া এক রকম হবে, আর যদি আমাদের আকর্ষণ অন্য আর এক দিক-অভিমুখী হয় তো আমাদের প্রবৃত্তি, চিন্তা ও ক্রিয়া অন্য রকম হবে। আকর্ষণই প্রধান কথা। তা সব কিছুর মধ্যেই পরিবর্তন এনে দেয়।

প্রশ্ন হচ্ছে—অ-ব্রত কি? ব্রত কি? এক দিক অভিমুখী আকর্ষণ অ-ব্রত, আর অন্য আর এক দিক অভিমুখী আকর্ষণ ব্রত। দুটি দু রকম জিনিস নয়। দুটি একই জিনিস। কেবল দিকের পরিবর্তন। ব্রত ও অ-ব্রত দুই বিপরীত দিক-অভিমুখী পথিক।

যে আকর্ষণ আত্মা থেকে নির্গত হয়ে বাইরের দিকে যায় সেই আকর্ষণের নাম অ-ব্রত। আর যে আকর্ষণ বাইরে থেকে ফিরে আত্মার অভিমুখে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় ব্রত। ব্রত কোন নতুন জিনিস নয়। আকর্ষণের দিক পরিবর্তনের নাম ব্রত। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের আকর্ষণ বহির্মুখী। এক আছে আমাদের মূল চেতনা। এই চেতনাকে ঘিরে এক কষায়-বলয় দিকে আছে। কষায়-বলয়ের পরে আছে প্রবৃত্তির বলয়। কষায়-আত্মা ও যোগ আত্মা এই দুটি দ্রব্য আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মূল-চেতনা, কষায়-বলয়, যোগ-বলয় আর প্রবৃত্তি-বলয়। আমাদের জ্ঞান থেকে নিঃসৃত রশ্মি কষায়ের সঙ্গে মিশ্রিত হলে স্বকীয় জ্ঞানরূপ হারিয়ে ফেলে এবং সংবেদনের রূপ নেয়। জ্ঞান সংবেদনে পরিণত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানধারার সঙ্গে কষায়ের মিশ্রণ না হয় ততক্ষণ জ্ঞান জ্ঞানই থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞান রূপে থাকে। যখন কষায় জ্ঞানধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখন জ্ঞান সংবেদনে পরিণত হয়। তার আর বিশুদ্ধ জ্ঞান রূপ থাকে না। সংবেদন থেকে আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। রাগের আকর্ষণের উদ্ভব হয়, দ্বেষের আকর্ষণর জন্ম হয়। সমস্ত আকর্ষণের উদ্ভব হয় সংবেদন থেকে। বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ হয়, তার তার মূল কারণ সংবেদন। খাদ্য সুস্বাদু মনে হয়, কারণ জিহ্বার নিজস্ব

সংবেদন আছে। সুগন্ধ বস্তু শুঁকতে ভাল লাগে, তাব কাবণ নাকেব নিজস্ব একটা সংবেদন আছে। মন ঐ সবেব দিকে আকৃষ্ট হয়। কাউকে গালাগালি কবলে গালাগালিব প্রতি আকর্ষণ হয়, তাব কাবণ তখন আমবা জ্ঞানেব জগতে বাস কবি না, সংবেদনেব জগতে বাস কবি। সংবেদনেব জীবন প্রতিক্রিযাব জীবন। জ্ঞানেব প্রভাবে মানুষ ক্রিয়া কবে। সংবেদনে প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি হয। জ্ঞান স্বতন্ত্র, সংবেদন পবতন্ত্র। জ্ঞানেব প্রভাবে মানুব নিজস্ব ভঙ্গিতে ক্রিয়া সম্পাদন কবে। সংবেদনে নিজস্ব কোনও ক্রিযা হয না, প্রতিক্রিয়া হয। সামনেব লোক যে বকম ক্রিযা কবে, সেই বকম ক্রিযা কবায। কেউ পাথব ছুঁড়ছে দেখলে সে-ও পাথব ছোঁড়ে। কেউ প্রশংসা কবলে সে-ও প্রশংসা কবে। অর্থাৎ ক্রিযাব প্রতিক্রিযা হয। প্রতিবিম্ব হয। স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়া হয না। সে লোকেব নিজস্ব কোন ক্রিযা সম্পাদন কবাব ক্ষমতা থাকে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিন্তন, মনন এবং ক্রিযাব স্বাতন্ত্র্য—এ সবই জ্ঞানেব অবস্থায় সম্ভবপব, সংবেদনেব অবস্থাতে নয। থালাতে কবে খাবাব এসেছে। যদি রুচিকব এবং মনোবম খাদ্য হয তবে প্রশংসা কবা হয, অপ্রিয় এবং অরুচিকব হলে অখাদ্য বলে গালি দেওযা হয়। এ সবই প্রতিক্রিযাব জীবন। 'যে যেমন তাব সঙ্গে তেমন ব্যবহাব', 'শঠেব সঙ্গে শাঠ্য আচবণ কব'—এ সবই সংবেদনেব ক্ষেত্রে প্রচলিত সিদ্ধান্ত, প্রতিক্রিয়াব ক্ষেত্রে প্রচলিত মতবাদ। 'শঠে শাঠ্যেব' অর্থ—প্রতিক্রিযা, ক্রিযা নয।

সংবেদনেব জগতে যে জীবন যাপন কবে সে ক্রিয়াব জগতে বাস কবতে পাবে না। সে নিজস্ব ক্রিযা সম্পাদন কবতে অসমর্থ। সে যা কিছু কবে সবই প্রতিক্রিযা। আপনি নিজেব কার্যকলাপ লক্ষ্য করে দেখুন। একশটা কাজেব মধ্যে একশটাই প্রতিক্রিযা-প্রেবিত মনে হবে। ঐ লোক আমাব উপকাব কবেছে, আমিও তাব উপকাব কবব। ঐ লোকটি আমাব নিন্দা কবে অনিষ্ট কবেছে, আমিও তাব অনিষ্টকব নিন্দা কবব। ঐ লোকটি আমাকে অপমানিত কবেছে, আমিও তাকে

অপমান করব। ঐ সবই প্রতিক্রিয়া। আমাদের মনে অনেক বিজার্ভেশন বা ভাবগুপ্তি, অনেক অবরোধের প্রক্রিয়া হয়। তা মানুষকে প্রতিক্রিয়ার জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। কারণ তার ভেতরে জ্ঞান নেই, সংবেদন আছে। সংবেদন মানুষকে অ-ব্রতের দিকে নিয়ে যায়। হিংসা, অসত্য, চুরি, অ-ব্রহ্মচর্য এবং মমত্ব—এ সবই সংবেদনের প্রতিফলন, প্রতিক্রিয়ার পরিণাম।

লোকে অনেক কিছু সংগ্রহ করে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন? ঐ রকম সংগ্রহ করার কি কোন প্রয়োজন আছে? তা কি এতই উপযোগী? প্রয়োজন নেই, উপকারও নেই, তবুও লোকে সংগ্রহ করে। এর মূল কারণ প্রতিক্রিয়া। সে ভাবে—'অমুক লোক ধন অর্জন করেছে, বিত্ত সংগ্রহ করেছে এবং আজ সে সমাজে সমাদৃত। লোকে তাকে সম্মান দেয়, পূজা করে। তাকে সামনের পংক্তিতে বসানো হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে আমিও কেন ধনোপার্জন করব না? ধন সংগ্রহ করাতে কি আপত্তি থাকতে পারে?' এই প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ধন সংগ্রহ করে। তার পক্ষে অত ধনের কোন প্রয়োজন নেই, তবু সে ধন সংগ্রহ করে। সে এই রকম চিন্তা করে: 'এই রকম করলে যদি এই রকম ফল হয় তবে আমারও ঐ রকম করা উচিত।' এ সবই হল সংবেদনের জীবন, সংবেদনের চিন্তাধারা। যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানের ধারার সঙ্গে কষায়ের ধারার সংমিশ্রণ হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা এই রকম জীবন থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারব না।

অজ্ঞানে হিংসা হয় না। কোন অজ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য জীব, বা জড় পদার্থ কখনও হিংসা করতে পারে না। প্রাণী বা জীবই শুধু হিংসা করে। যে জীবের জ্ঞান আছে সে-ই শুধু হিংসা করতে পারে। হিংসা সজ্ঞানে সম্পাদিত হয়। অসত্যাচরণ সজ্ঞানে সাধিত হয়। চোর চুরি করে সজ্ঞানে। বাসনা এবং কামনা জ্ঞানের সীমার মধ্যে ঘটে। মমত্বের সংগ্রহও জ্ঞানের সীমার মধ্যে হয়ে থাকে। অচেতন পদার্থ দ্বারা হিংসা বা কোন কিছু হতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে—এ রকম কেন

হয়? চেতনা কি এই রকম জিনিস চায়? তা কি আত্মার ধর্ম? তা কি আত্মস্বভাব? ঐ সমস্ত ক্রিয়া আত্মার স্বভাব নয়। কষায় বিহ্বল জ্ঞানের দিক থেকে এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যখন জ্ঞান কষায়ের দ্বারা প্লাবিত হয়, বিহ্বল হয়, তখন এই সব কাজ হয়। যখন কষায়ের রসায়ন জ্ঞানের ধারার সঙ্গে মিশে যায় তখন অসদাচরণকে সদাচরণ বলে, প্রিয় বলে মনে হতে থাকে। এই সব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।

এক জনকে গালি দিয়েছে। যতক্ষণ গালির প্রতিশোধ গালি দ্বারা না হয় ততক্ষণ সে ভাবে—'ওহো। এ আমি কি করলাম? গালির উত্তরে গালি দিলাম না। লোকে কি ভাববে? তারা বলবে—'ও তো মাটি দিয়ে তৈরি। ওর মধ্যে কোন কর্তৃত্ব নেই। এত বড় অপমান। তাও ও সয়ে গেল। ও তো কেবল মাটির পুতুল।' মনের ওপরে প্রতিক্রিয়া হয়। যখন সে ঐ রকম পালটা আচরণ করতে পারে, গালির বদলে গালি দিতে পারে, তিরস্কারের জবাব তিরস্কারে দিতে পারে, তখন তার সন্তোষ হয়। এ হল আকর্ষণের ব্যাপার, সন্তোষের ব্যাপার। ও সবই কষায়—রসায়নের প্রতিক্রিয়া। তার মিশ্রণ হলে মানুষের চিন্তার ধারা বদলে যায়। সে ভাবে—'এর চেয়ে বড় কোন সন্তোষ নেই, কোন আনন্দ নেই। কোন তৃপ্তি নেই।' সাপে কামড়েছে, নিম খাওয়ানো হচ্ছে। নিম তেতো, কিন্তু মিষ্টি লাগছে। নিম তো মিষ্টি নয়, তেতো। কিন্তু তা মিষ্টি মনে হচ্ছে। কেন? তার কারণ রক্তে এমন একটা রসায়ন অর্থাৎ সাপের বিষ প্রবেশ করেছে যে নিমের কারবাইড তাতে লীন হয়ে যায়, নিম মিষ্টি লাগে। সেই রকম মনে যতটা কষায়ের পরিণাম বা রস প্রবেশ করবে আমাদের অনুভূতি, চিন্তা অথবা তৃপ্তিকে ততটা বদলে দেবে, সন্তোষ এবং অসন্তোষকে নতুন রূপ দেবে।

একটি পৌরাণিক কাহিনী বলি। একবার ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী দুজনে মনুষ্যলোকে এলেন। তাঁরা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক গ্রামে এসে

পৌঁছলেন। সেখানকার সব লোকই খুব গরীব। তারা সকলেই দুঃস্থ। ইন্দ্রাণীর মন করুণায় ভরে উঠল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন—'দেব। আপনি যখন এ গ্রামে এসেছেন তখন একে সম্পদশালী করে দিন। ঐ লোকগুলি কেন গরীব থাকবে? ওদের মনে সন্তোষ নেই। আপনি কৃপা করে এদের সমৃদ্ধ করে দিন যাতে এরা সন্তোষের সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে।' ইন্দ্র বললেন—'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এদের সমৃদ্ধ করে দেব, কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করব এ দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তুমি কি সে দায়িত্ব নিতে পারবে?' ইন্দ্রাণী বললেন—'আপনি এদের সমৃদ্ধ করে দিন। এদের দারিদ্র্য দূর হোক। দারিদ্র্য দূর হলে অসন্তোষ আপনা থেকেই মিটে যাবে, তারা নিজে নিজেই তুষ্ট হবে। আমার কোনও দায়িত্ব নিতে হবে না।' ইন্দ্র বললেন—'দেবি। তুমি জান না, এ রকম কখনও হয় না। আমি জানি, ও রকম হবে না। সম্পদ লাভ হলেই যে সন্তোষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।' ইন্দ্রাণী জেদ করলেন। ইন্দ্র গাঁয়ের বাইরে একটা সোনার খনি করে দিলেন। গাঁয়ের লোক তার খোঁজ পেল। তারা জানতে পারল যে গাঁয়ের বাইরে ভাল ভাল সোনা পড়ে আছে। যে যত চায়, নিয়ে আসতে পারে। তাদের সোনার মূল্য জানা ছিল। তারা জানত, সোনা কত মূল্যবান। গাঁয়ের সব লোক এসে সেই সোনা নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ল। সকলের আকর্ষণ একই দিকে চালিত হল। সবাই এল। যে যত পারল সোনা নিয়ে গেল। গ্রামে এমন একজনও অবশিষ্ট রইল না যে সোনা নেয় নি। সারা গাঁ এক দিনে ধনবান হয়ে গেল। সবাই সম্পদশালী হল। এক দিন আগে সবাই দরিদ্র ছিল। আজ সবাই ধনবান হয়ে গেল। খুব চমৎকার ব্যাপার হল।

রাত কাটল, সকাল হল। ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী সেখানে ছিলেন। গ্রামে আলোচনা হতে থাকে। কেউ বলল, 'এ কি ব্যাপার? কেমন করে হল? কোন দেবতা এই অদ্ভুত কাজ করেছেন। আবার এ-ও মনে হচ্ছে, যে এ রকম করেছে সে নিতান্ত মূর্খ।' সবাই বলে উঠল,

'সে কি ? মূর্খ হল কি করে ?' যে আমাদের এত ধন দিয়েছে তাকে মূর্খ বলছ কেন ?' সে বলল, 'সে যদি বুদ্ধিমান লোক হতো তবে কখনই সবাইকে সে সোনা দিত না। কয়েক জনকে সোনা দিলে তার একটা অর্থ হতো। সবাকে সোনা দেওয়াতে সোনার আর কোন অর্থ বা মূল্য রইল না। এখন সবাই ধনবান হয়ে গেল। কেউ আর সেবক রইল না। এখন আর ভৃত্য বা সেবক থাকবে না। এখন কাজ চলবে কি করে ? আমাদের কাছে ধন আছে, অথচ আমাদের ভৃত্য-পরিজন নেই, তবে ধন লাভের অর্থ কি ? ছোট-বড় সব সমান হয়ে গেল।' ইন্দ্র শুনলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে বললেন—'শুনলে তো ? এদের সন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে, না অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে ? ধন দেওয়া আমার হাতের মধ্যে ছিল, কিন্তু সন্তোষ দেওয়া আমার হাতের মধ্যে ছিল না।'

এটা কাহিনী মাত্র। কিন্তু আমরা এর ভিত্তিতে একটু চিন্তা করলে দেখি অসন্তোষ কোন বস্তুর আধারে ঘটে না। কষায়জড়িত চেতনার আধারে অসন্তোষ উৎপন্ন হয়। কষায়গ্রস্ত চেতনার ধারার একটি লক্ষণ যে, মানুষ অন্যের চেয়ে বড় হতে চায়। যত তার লোভের প্রবণ হয় তত তার আত্মাভিমান বাড়ে, তত সে সবার চেয়ে বড় হতে চায়। যখন আশেপাশে সবাই ছোট এবং শ্রমজীবী হয় তখন সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। একবার চোখ তুলে ভ্রূকুটি করলে দশ-বিশ জন লোক সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে, তবে তো বড় হওয়ার মজা, শ্রেষ্ঠত্বের আনন্দ পাওয়া যাবে। ধনবান হওয়ার, ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার আনন্দ তখনই পাওয়া যাবে। তা না হলে সবই ব্যর্থ। ধনবান হওয়ার ব্যাপার যেমন, অন্য অন্য জিনিসের ক্ষেত্রেও ব্যাপার তেমনি। এতে কি লাভ ? লোকের সন্তোষ হয় না। যখন লোকে অগ্রণী হয় তখন তার সন্তোষ হয়। তার পেছনে এক লম্বা সেবকের সারি চলতে হবে। কষায়-চেতনার ফলে এ সব প্রতিক্রিয়া হয়। যখন চেতনার কষায়-আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চেতনার বিশুদ্ধ ধারা

প্রবাহিত থাকে তখন সমস্ত আকর্ষণের সমাপ্তি ঘটে এবং মানুষের মধ্যে অহিংসা প্রভৃতি সদাচার বিকশিত হয়।

ভগবান মহাবীর একদা কায়োৎসর্গ মুদ্রায় এক শূন্য গৃহে ধ্যানস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। কতকগুলি লোক সেখানে এল। তারা তাঁকে গালি দিল, তার পরে তাঁকে প্রহার করল। কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না। শুরুতে যে ধ্যানের প্রবাহ চলছিল তা গালি দেওয়ার সময়েও চলতে থাকে, প্রহারকালেও চলতে থাকে। কোন পরিবর্তন ঘটল না। ধ্যানের ধারা খণ্ডিত হল না। তা অখণ্ডিত ভাবে লক্ষ্যে নিবদ্ধ রইল। আমরা ভাবি—এ রকম ক্ষেত্রে মানুষের তো পরিবর্তন আসা উচিত। ভগবান মহাবীর কি শূন্যবৎ হয়ে গিয়েছিলেন, কিংবা তাঁর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু লক্ষিত হয় নি? এর কারণ কি? এর মূল কারণ—দিক পরিবর্তন। তাঁর চেতনার পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর চেতনা নিজের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। গালাগালি তাকে ভেদ করতে পারে নি। কারণ তাঁর চেতনা অ-শব্দ বা শব্দের অতীত দশায় উপনীত হয়েছিল। সেখানে সমস্ত শব্দের সমাপ্তি ঘটেছিল। তা শব্দার্থের অতীত অবস্থা।

একদা ভগবান ধ্যানে স্থিত ছিলেন। কতকগুলি রূপসী যুবতী এসে তাঁকে প্রার্থনার সুরে বলল—'প্রভু, এ আপনি করেছেন? আপনি অসময়ে যোগ আচরণ করছেন কেন? আপনি আমাদের কেন ত্যাগ করছেন? আপনি একবার ঘরে চলুন, আমাদের সঙ্গে বাস করুন। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন। আমাদের কৃতার্থ করুন।' মহাবীরের ধ্যানের ধারা অবিচলিত রইল। কোন পরিবর্তন ঘটল না। তাঁর মধ্যে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর কারণ, ভগবান মহাবীরের আকর্ষণের দিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। যিনি ক্ষণমাত্র আগে রাজচক্রবর্তীর মত বৈভবশালী ছিলেন, পর মুহূর্তে সব কিছু ছেড়ে অকিঞ্চন হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন—এ কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? আকর্ষণের দিক পরিবর্তন হওয়াতেই তা সম্ভব হয়েছিল।

দিক পরিবর্তনের নামঃ ব্রত, প্রব্রজ্যা, সন্ন্যাস।

অহিংসা ক্রিয়া, হিংসা প্রতিক্রিয়া। সত্য ক্রিয়া, অসত্য প্রতি-ক্রিয়া। অকিঞ্চনতা ক্রিয়া, সংগ্রহ প্রতিক্রিয়া। যার মধ্যে আকর্ষণের দিক পরিবর্তন ঘটেছে তার পক্ষে অহিংসা, সত্য, অসংগ্রহ প্রভৃতি সহজ হয়ে যায়, স্বভাবে পরিণত হয়। তার পরে তার পক্ষে হিংসা করা সম্ভব হয় না, অসত্য ভাষণ বা চুরি করা সম্ভব হয় না, সংগ্রহ করা বা আসক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। এসব হল আকর্ষণের দিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। তখন তার গতি আত্মাভিমুখী হয়। চেতনা আত্মার দিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। তা ব্রত, সুমহৎ সমাধি।

গৌতম ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ভন্তে। কোন লোক ঘুমায়, কেউ কেউ জেগে থাকে, কেউ কেউ নিদ্রিত অবস্থায় জেগে থাকে। এ কথা কি ঠিক?'

মহাবীর বললেন—'গৌতম। ও কথা ঠিক। যার আকর্ষণ বিষয়ের প্রতি, যার আকর্ষণ বাইরের দিকে ধাবিত হয়, সে লোক ঘুমিয়ে থাকে। যার চেতনা নিরন্তর আত্মার দিকে প্রবাহিত হয়, যার আকর্ষণ শেষ হয়েছে, সে জেগে আছে, সে সর্বদা জাগ্রত থাকে। যার চেতনা কখনও বাইরের দিকে ধাবিত হয়, আবার কখনও কখনও থেমে গিয়ে ভেতরের দিকে প্রবাহিত হয় সে ঘুমিয়ে জাগে। ঘুমিয়েও থাকে, আবার জেগেও থাকে।

ব্রত জাগরণ। চেতনার জাগ্রত অবস্থাকে ব্রত বলে। তারই নাম সমাধি। এই অবস্থায় পৌঁছলে মানুষের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বলে এই অবস্থাকে সমাধি বলে।

কষায়কে ঘিরে চার দুয়ার আছে—অনন্তানুবন্ধী, অপ্রত্যাখ্যানী, প্রত্যাখ্যানী এবং সংজ্বলন। প্রথম দুয়ার অনন্তানুবন্ধী। যে এর ওপরে আঘাত করে, প্রহার করে তার দৃষ্টিকোণ সম্যক হয়ে যায়। তার দৃষ্টি সমীচীন হয়। সে সত্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যে লোক দ্বিতীয় দরজায়, অপ্রত্যাখ্যানী কষায়ের ওপরে আঘাত করে, ঐ দুয়ার ভেঙ্গে

ফেলে, সে ব্রতী হতে পাবে, সে ব্রতেব ভূমিতে প্রবেশ কবতে সমর্থ হয়। যে তৃতীয় দুযাব প্রত্যাখ্যানী কষাযেব ওপবে আঘাত কবে, সে মহাব্রতী হয়, দীক্ষিত হয়, প্রব্রজ্যা লাভ করে। যে চতুর্থ দুয়াব সংজ্বলন কষাযে আঘাত করে সে বীতবাগ, বাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সব কিছুব অতীত হয়ে যায়।

কষায় চেতনাব ওপবে আঘাত কবলে তবে ব্রত এবং মহাব্রত প্রাপ্তি হয। যতদিন পর্যন্ত কষাযের বলযে আঘাত কবে তাকে ভেঙ্গে ফেলা না যায় ততদিন পর্যন্ত মানুষ ব্রতীতে পবিণত হতে পাবে না। ব্রত অতি উচ্চ স্তবেব সমাধি বা সমাধান। তাতে চেতনাব পবিবর্তনেব ক্ষমতা এসে যায। তাব সমাধান হযে যায, তাব সমাধি মিলে যায। তাকে আব কেউ সন্তাপ দিতে পাবে না। ক্রোধ, অভিমান, মাযা বা লোভ—কিছুই তাকে সন্তপ্ত বা বিচলিত কবতে পাবে না। বাগ বা দ্বেষ তাকে ক্লেশ দিতে পাবে না। তাব সব কিছু সমাহিত হযে যায। সব সমস্যাব সমাধান হযে যায। আব কোন বন্ধন হয না।

লোকে ব্রতী হতে চায। কিন্তু আবদ্ধ হওয়াব ফলে ব্রতীতে পবিণত হতে পাবে না। বন্ধন কি? এক বন্ধন, মানুষেব কষাযেব চেতনাব প্রবলতা। সে এখন পর্যন্ত কষায চেতনাব ওপবে আঘাত কবতে পাবে নি। সে এখনও অব্যবস্থিত, সংশয়ে দোদুল্যমান। সাধনাব পথ তাব ভাল লাগে, কিন্তু সে পথে সে পৌঁছতে পাবে না। সে চিন্তা কবে—'আমি একলাই চলব। দুনিযা তো আমাব সাথে চলবে না।' সঙ্কল্প দুর্বল হযে যায, বিশ্বাস তৈবি হয না, পথ মেলে না। কষাযেব ওপবে আঘাত না কবলে সে কাজ পুবো হবে না। কষায চেতনাব ওপবে আঘাত পড়লে বিবতি উৎপন্ন হয। 'বতি' শব্দেব অর্থ বমণ কবা। তাব অর্থ, আনন্দ কবা। আনন্দ গ্রহণে বত হওযা। 'বিবতি' কথাটিব অর্থ সাংসাবিক আনন্দ থেকে দিক পবিবর্তন কবে বিপবীত দিকে মনকে নিযে যাওযা। বিরতি বতিব সম্পূর্ণ বিপবীত মার্গ।

দুই ভাই ছিল। তাবা বস্ত্রেব ব্যবসা কবত। বড ভাই তাব স্ত্রী

এবং পুত্রকে ত্যাগ করে সংসার ছেড়ে চলে গেল। ছেলে বড় হল। একদিন তার মা তাকে বলল—'বাছা। তোর বাবা আমার কাছে এক পুঁটলি রেখে গিয়েছেন। তাতে রত্ন আছে। কাকার কাছে নিয়ে গিয়ে ওগুলি বাজারে বেচে আয়। এখন দর উঁচু। অনেক টাকা পাওয়া যাবে।' সে কাকার কাছে এল। কাকা পুঁটলি খুলল না, সেটা আবার বেঁধে দিয়ে বলল—'এটি তোমার মাকে দিয়ে দিও। বাজার এখন মন্দা চলছে। এগুলি চড়া দরে বিক্রি হবে না। দর কমতি হবে।' ছেলে মার কাছে এসে সব কথা বলল।

কয়েক মাস গেল। বছর গেল। ছেলেটি কাকার কাছে রত্ন পরীক্ষা শিখতে লাগল। অনুভব বাড়তে লাগল। একদিন কাকা বলল—'বাছা। বাজার এখন তেজী চলছে। যাও, সেই পুঁটলিটি নিয়ে এস, রত্নগুলি বেচে দেব।' ছেলেটি দৌড়তে দৌড়তে মার কাছে গেল। পুঁটলিটি দোকানে নিয়ে এল। কাকা গদিতে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে দু-এক জন লোকও ছিল। ছেলেটি পুঁটলিটি খুলল। তার চোখ ঝলসে গেল। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলে উঠল—'আরে। এ কি। রত্ন কোথায়? হীরা কোথায়? এ সব তো কাচের টুকরো। সবগুলিই কাচ। এ কেমন করে হল? হীরা কি পালটে কাচ হয়ে গেল, না আসলেই এগুলো কাচের টুকরো?' সে পুঁটলিটি গলিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কাকা বলল—'ওহে। এ তুমি কি করলে? আমি কি বলব?' ছেলেটি বলল—কাকা। আমি বুঝতে পেরেছি, এ সবই কাচের টুকরো ছিল। হীরা ছিল না, রত্ন ছিল না।'

ধারণার পরিবর্তন হয়েছিল। আসলের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক পরিস্থিতি সামনে এসে গিয়েছিল।

পরিবর্তন কেন আসে?

যাঁরা ত্যাগীতে বা মহাব্রতীতে পরিণত হন তাঁদের নতুন জন্ম হয় না। তাঁদের মধ্যে কেবল চেতনার প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়, আকর্ষণের পরিবর্তন হয়। যে জিনিস আগে ভাল লাগত, যে জিনিস

কষায চেতনাব প্রভাবে মনোজ্ঞ মনে হতো, আজ দিক পবিবর্তন হওযাব ফলে তা একেবাবে বিপবীত লাগে, অর্থাৎ মোটেই চিন্তাকর্ষক মনে হয না।

সম্রাট অশোকেব মনে এক ভাবনা জেগেছিল, ‘আমি সংসাবেব সবাব ওপবে আমাব শাসন প্রতিষ্ঠা কবব।’ ঐ ভাবনা একদিন তীব্র ছিল। ভাবনাব পবিবর্তন হল, তাঁব আকর্ষণেব গতি বদলে গেল—‘আবে! যুদ্ধ কবা তো পাগলামো। নবহত্যা নিচ কাজ।’ তাঁব আকর্ষণ বদলে গেল। তিনি শিলালিপি উৎকীর্ণ কবালেন—‘কাবোব সঙ্গে লডাই কোবো না। কলহ কোবো না। যুদ্ধ কোবো না।’ কলিঙ্গ-যুদ্ধে যে সম্রাট লক্ষ মানুষ হত্যা কবেছিলেন, তিনি সকলকে ভালবাসাব কথা বললেন। এটা কেমন কবে সম্ভব হল? চেতনাব দিক পবিবর্তনেব ফলে এটা সম্ভব হযেছিল। যে লোক নিজেব চেতনাব সঙ্গে কষায-চেতনাব সংযোগ হতে দেয না, সে নিজেব চেতনা-প্রবাহেব মোড ফেবাতে সমর্থ হয, তাব পবিবর্তন আনতে সমর্থ হয। তাব আকর্ষণ মিটে যায। পুবনো মূল্যবোধেব দৃষ্টি বদলে যায। নতুন মূল্যবোধেব প্রতিষ্ঠা হয। যে সমস্ত জিনিস অর্থপূর্ণ বলে মনে হতো সেগুলি এখন অর্থহীন, অসাব মনে হতে আবম্ভ কবে। এই মনোভূমিব, এই চেতনাব দিকেব নাম ব্রত। ব্রত এক। উপযোগেব দৃষ্টিতে তা পাঁচ, বাব, বা অসংখ্য হতে পাবে। ব্রতই বলুন, বা বিবতিই বলুন, তা চেতনাব দিক পবিবর্তন—সবই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম।


